মন-দ্বারকায়

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫-২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৬৩

প্রচ্ছদ : শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোকচিত্র : লেখক

মুদ্রাকর :
শ্রীনিশীথকুমার ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

আমার ভাই

শম্ভু

বিশু

ও

শিবু-কে

মন-দ্বারকায়

লেখকের কয়েকখানি সাম্প্রতিক গ্রন্থ :

মধু-বৃন্দাবনে (ব্রজপর্ব, বনপর্ব ও মহাবন পর্ব)
চতুরঙ্গীর অঙ্গনে
রাজভূমি-রাজস্থান
পুণ্যতীর্থ-প্রভাস
লীলাভূমি-লাহুল
গঙ্গা-যমুনার দেশে
গঙ্গাসাগর
কেঁদুলীর মেলায়
তমসার তীরে তীরে
মানালীর মালঞ্চে
ও
অপরূপা আসাম

‘সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥’

উত্তম-অধম যে-কোন কাজেই নিযুক্ত থাকো না কেন, পরাভক্তির সঙ্গে পরমভাবকে হৃদয়ে রেখে আমার আশ্রয়ে এলে, আমার কৃপায় শাশ্বত এবং পরম-পদ লাভ করবে।

শঙ্করী হারিয়ে গেল।

হারিয়ে গেল অহীন, পূর্ণিমা এবং শ্রী সাত বছরের সেই সরল শিশুটি জানতেই পারল না যে, তার মামু তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে পালিয়ে গেল রাজভূমি-রাজস্থান থেকে।

ওরা পড়ে রইল আবু-রোডে, আমরা এগিয়ে চললাম মন-দ্বাবকার পথে—দেবদুর্লভ দ্বারকা।

চলেছি কুশস্থলীতে কিন্তু তাকিয়ে রয়েছি আবু-রোডের দিকে। অথচ শঙ্কবীর মতো সে-ও গিয়েছে হারিয়ে, তার সঙ্গেও আমার দূরত্ব ক্রমেই চলেছে বেড়ে। জানি বিচ্ছেদকে মেনে নেবার মধ্যে বেদনা যতই থাক্, অবাস্তবতা নেই। তবু মন বাস্তব অবস্থাটি মেনে নিতে চাইছে না। কাবণ মন মানুষের, কিন্তু মন যে বড় একটা মানুষের কথা শোনে না।

"আর ভেবে কি হবে বল? যা হবার তো হয়েই গেছে।"

দাদার কথায় মুখ ঘোরাই, ভেতবে তাকাই। দাদা তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। তাঁর চোখে-মুখে সান্ত্বনার পরশ। একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিই।

আমাকে চুপ কবে থাকতে দেখেই বোধহয় দাদা আবার বলেন, "ভবিতব্যকে মেনে নিয়ে মনটাকে শান্ত কবে তোল।"

দাদা ঠিকই বলেছেন। তিনি তো শুধু বয়সে প্রবীণ নন, বুদ্ধিতেও বিচক্ষণ। নাম শ্রীভূপেশচন্দ্র দত্ত। বরিশালের মানুষ, বর্তমানে বাঘাযতীন কলোনীর বাসিন্দা। বালিগঞ্জের একটি পেট্রোল পাম্পের মালিক। কিন্তু বৌদ্ধির মৃত্যুর পর থেকে ব্যবসায়ে মন নেই। তীর্থদর্শনের নেশায় পেয়ে বসেছে তাঁকে। খুব হাসি-খুশি মানুষ। হাওড়ায় ট্রেন ছাড়ার পরেই তিনি আলাপ করেছেন আমার সঙ্গে। আর সেই থেকেই তিনি আমার দাদা।

দাদার কথাটা ঠিক হলেও আমি তা মেনে নিতে পারি না। কেমন করে পারব? সেদিন পুষ্করে পূর্ণিমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি যদি শ্রীকে ঐ রোদের মধ্যে সাবিত্রী পাহাড়ে না নিয়ে যেতাম, তাহলে হয়তো সে এমন অসুস্থ হয়ে পড়ত না। আর সে অসুস্থ হয়ে পড়ল বলেই তো তার মা পূর্ণিমার সঙ্গে মাসি শঙ্করীকেও পড়ে থাকতে হল আবু-রোডে। ওরা যেতে পারল না দেবভূমি-দ্বারকায়, দর্শন করতে পারল না রণছোড়জীকে।

অথচ ওরা কত আশা করেই না সেদিন হাওড়ায় কুণ্ডু স্পেশালের গাড়িতে চড়ে বসেছিল। আমারই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য আজ একটি অবুঝ ও অসুস্থ শিশুকে নিয়ে দুজন যুবতীকে অজানা জায়গায় অপরিচিতদের মাঝে অনির্দিষ্ট কালের জন্য পড়ে থাকতে হল। এতবড় মানসিক গ্লানিকে আমি কেমন করে মন থেকে মুছে ফেলব?

সরকারদা ও বৌদি পাশের খোপ থেকে উঠে এলেন আমাদের খোপে। আমরা একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর টু-টায়ার কোচে ভ্রমণ করছি। মিটারগেজ রেল, গাড়িগুলো চওড়ায় কম। একটি খোপে দুটি লোয়ার ও দুটি আপার বার্থ। কুণ্ডু কোম্পানীর ভাষায় বেঞ্চ ও বাঙ্ক্। লোয়ার বার্থ দুটির মাঝে তাঁরা নিজেদের স্টিল-বেঞ্চ্ বিছিয়ে দিয়েছেন। ফলে নিচে তিনটি এবং ওপরে দুটি বার্থ নিয়ে একটি খোপ হয়েছে। প্রতি সীটে ডানলোপিলো বিছানা। বেশ আরাম-দায়ক শয্যা।

আমাদের খোপটি এক প্রান্তের দ্বিতীয়। এ প্রান্তের শেষ খোপটিতেই শঙ্করীরা ছিল। ওরা তিনজন নেমে যাবার পরে এখন সেটিতে ওদের পরিবারের মাত্র তিনজন রয়েছেন—মাসিমা, সেজদি ও বিউটি। মাসিমা মানে শঙ্করীর মা। সেজদি মানে মিসেস সাহা এবং শঙ্করীর সেজদি। আর বিউটি নিঃসন্তান মিস্টার সাহার ষোড়শী ভাইঝি—বি. এ. পড়ে।

শঙ্করীরা নেমে যাবার পরেও মিঃ সাহা মানে গোরাচাঁদবাবু আমাদের খোপেই রয়ে গিয়েছেন। তবে সুরমাদি ও উমাদি চলে গিয়েছেন শঙ্করীদের জায়গায়। আমাদের পরের খোপে রয়েছেন সত্যেনদা, তাঁর মা, অমিয়বাবু ও সরকারদারা।

এই রকম আটটি খোপ ও তিনটি বাথরুম নিয়ে আমাদের গাড়ি। চারটি খোপের পরে দরজা ও বাথরুম তারপরে আবার চারটি খোপ। শেষের খোপটি রান্না ও স্টাফের জন্য নির্দিষ্ট। বাকি সাতটি খোপে আমরা পঁয়ত্রিশজন ও শ্রী রওনা হয়েছিলাম আগ্রাফোর্ট থেকে। ভৌমিকবাবু নামে জনৈক যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় সস্ত্রীক তাঁকে নিয়ে সহকারী ম্যানেজার তপন জয়পুর থেকে কলকাতায় ফিরে গিয়েছে। শ্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় পূর্ণিমা ও শঙ্করী রয়ে গেল আবু-রোডে। অর্থাৎ এখন আমরা একত্রিশ জন যাত্রী রয়েছি গাড়িতে।

অন্যান্য সহযাত্রীর কথা পরে বলা যাবে, আগে সরকারদা ও বৌদির কথা বলে নিই। সরকারদা মানে মোহিতকুমার সরকার ব্যবহারিক জীবনে একটি প্রেসের মালিক। বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড় হলেও পাঁচের ঘরে পৌঁছতে এখনও বছর কয়েক বাকি। সরকারদা স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ ও বন্ধুবৎসল, অমায়িক ও ভক্ত-বৈষ্ণব। তিনি কাঠিয়াবাবার শিষ্য। নিয়মিত সন্ধ্যা-আহ্নিক ও তিলকসেবা করেন। স্ত্রী শ্যামলী বৌদিও সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী এবং ধর্মপরায়ণা।

বৌদি আমাকে বলেন, "ঘোষদা, আপনি পর্যটক। আপনিই তো সেদিন বলেছেন—পর্যটকের যাত্রাপথ বড়ই নিষ্ঠুর। এপথে কেউ কারও জন্য থেমে থাকতে পারে না।"

একটু হেসে জবাব দিই, "আমরা তো থেমে নেই বৌদি। পথের সাথীকে পথের পাশে ফেলে রেখে এগিয়ে চলেছি।"

"তাহলে এমন মনমরা হয়ে চুপচাপ বসে আছেন কেন?"

"বৌদি ঠিকই বলেছেন ঘোষদা!" সাহাবাবুও তাঁকে সমর্থন

'করেন। "আপনি এমন চুপ করে থাকলে, আমরাও যে মনমরা হয়ে পড়ি।"

সত্যই তো! সাহাবাবু যদি নিজেকে সকল দুর্ভাবনামুক্ত করে এমন সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেন, তাহলে আমি কেন পারছি না? আমি তো ওদের কেউ নই, গাড়িতে পরিচয় হয়েছে। আব সাহাবাবু ওদের জামাইবাবু। তিনিই সস্ত্রীক, দুই শালী, শাশুড়ী, ভাইঝি ও শ্রীকে নিয়ে তীর্থদর্শনে বেরিয়েছিলেন। আজ তাদের তিনজনকে আবু-বোডে রেখে এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন।*

বাধ্য হয়ে বলতে হয় আমাকে, "না, মনমরা হবার কি আছে? পূর্ণিমা ও শঙ্কবী দুজনেই শিক্ষিতা এবং বুদ্ধিমতী। সঙ্গে কুণ্ডু স্পেশালের অভিজ্ঞ কর্মচাবী অহীন রয়েছে। রয়েছেন আবু-রোড স্টেশনের দুজন বাঙালী কর্মী বিমলবাবু ও সরোজবাবু। সদ্যপরিচিত হলেও তাঁরা ওদেব সব দায়িত্ব নিজেরা নিয়ে আমাদের নিশ্চিন্তে তীর্থ-ভ্রমণ করার পরামর্শ দিয়েছেন।" অনেকটা আপন মনেই বলে যাই কথাগুলি, হয়তো বা নিজের মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলি।

"তাহলে আপনি এমন গোমড়ামুখো হয়ে রয়েছেন কেন?" আমি থামতেই উমাদি অভিযোগ করেন। সরকারদাকে দেখেই বোধহয় উমাদি ও সুরমাদি আমাদের খোপে এসেছেন।

উমাদি মানে শ্রীমতী উমা মিত্র। বয়সে আমার চেয়ে হয়তো একটু বড়ই হবেন, কিন্তু বুঝবার উপায় নেই। বেশ ছিমছাম স্মার্ট চেহারা। বহু তীর্থভ্রমণ করেছেন। মনে হয় সংসারে তাঁর খুব আপনজন কেউ নেই এবং তিনি বিয়ে করেন নি। তাই বলে তাঁর দিন কাটাতে অসুবিধে হয় না কোন, তাঁর যে গোপাল রয়েছেন। সারাদিন তিনি তাঁকে মাতৃস্নেহে সেবা করেন—সকালে গোপালকে ঘুম থেকে তোলা, তাঁর মুখ ধোয়ানো, খাওয়ানো, স্নান করানো, ঘুম

* লেখকের 'রাজভূমি-রাজস্থান' দ্রষ্টব্য

পাড়ানো, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া—অনেক কাজ উমাদির। একটি পেতলের বাক্সে সেই গোপালমূর্তি সর্বদাই তাঁর সঙ্গে থাকে। তাই অনেকে উমাদিকে 'গোপালদি' বলে ডাকেন।-, তিনিও সে-ডাকে সানন্দে সাড়া দেন।

শ্রীমান গোপালের প্রতি উমাদির এই পক্ষপাত আমাদের ঈর্ষার উদ্রেক করে নি। কারণ আমরা দু-বেলা গোপালের প্রসাদ পাচ্ছি এবং গোপালসেবার পরে উমাদি যে সামান্য সময়টুকু পাচ্ছেন, সেটুকু তিনি আমাদের সুখ-সুবিধার জন্য ব্যয় কবছেন। তিনি অভিজ্ঞ তীর্থযাত্রী। এর আগে বেশ কয়েকবার কুণ্ডু স্পেশালের সঙ্গে তীর্থ-দর্শন করেছেন।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখেই বোধহয় উমাদি আবার বলেন, "সবকারদা বরং এক কাজ করুন।"

"কি ?" জিজ্ঞেস করেন সরকারদা।

"আমরা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় চলেছি। আপনি শ্রীকৃষ্ণের মহা-জীবনের কিছু কথা বলুন —দ্বারকার কৃষ্ণের কথা।

"উত্তম প্রস্তাব।" দাদা সমর্থন কবেন উমাদিকে। বিউটি, সেজদি, কল্পনাদি ও সত্যেনদাকে ডাক দেন তিনি। বলেন, "এখানে-কৃষ্ণ-কথা হচ্ছে, তাড়াতাড়ি চলে এসো।"

বিউটি এসে আমার পাশে বসতে চায়। দাদা বলেন, "না। মামুর কাছে নয়, আমার পাশে এসে বসো।"

নাতনীর প্রতি সত্তর বছরের দাদুর এই রসিকতায় আমরা সবাই হেসে উঠি।

আপত্তি করে কোন লাভ নেই বুঝতে পেরে সাহাবাবুর পাশে বসে সরকারদা শুরু করেন, "আপনারা জানেন মহাভারত, হরিবংশ এবং পুরাণে কৃষ্ণ-কথা রয়েছে। তবে আঠারোখানি পুরাণের প্রত্যেকটিতে কৃষ্ণ-কথা নেই, আছে নয়খানিতে।"

"যেমন ?" কল্পনাদি প্রশ্ন করেন।

সরকারদা উত্তর দেন, "ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ু-পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ ও কূর্মপুরাণ। কিন্তু আমরা আজ পুরাণের কৃষ্ণ-কথা আলোচনা করব না।"

"কেন ?"

"আমরা দ্বারকায় চলেছি। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলা ও কুরুক্ষেত্র-লীলা একই সময়ে। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ-কথা প্রসঙ্গে মহাভারত থাকতে আমরা কেন পুরাণের আশ্রয় নেব ? মহাভারত পুরাণের চেয়ে শুধু প্রাচীনতর নয়, অনেক বেশি মৌলিক। ইতিহাস হিসেবে মহাভারতের স্থান পুরাণের ওপরে। সুতরাং আসুন, মহাভারতের কৃষ্ণ-কথাই আলোচনা করা যাক্।"

"বেশ। শুরু করুন।"

"কিন্তু আমি বৈষ্ণব, সুতরাং শুরুতে আমাকে শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটি কথা বলে নিতে হবে।"

"বলুন।"

"শ্রীকৃষ্ণের মহাজীবন তিনটি লীলায় বিভক্ত—ব্রজলীলা, মথুরা-লীলা ও দ্বারকালীলা। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে এই লীলাসমূহের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। দশম স্কন্ধে মোট নব্বুইটি অধ্যায়। প্রথম চার অধ্যায়ে ব্রহ্মার প্রার্থনায় পৃথিবীর পাপ-মোচনের জন্য মথুরার কারাকক্ষে কৃষ্ণের জন্ম। পঞ্চম থেকে ঊনচল্লিশ অধ্যায় পর্যন্ত পঁয়ত্রিশটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা। চল্লিশ অধ্যায়ে যমুনার জলে অক্রূরের স্তুতি। একচল্লিশ থেকে একান্ন অধ্যায় পর্যন্ত মথুরা-লীলা। আর বাহান্ন থেকে নব্বুই অর্থাৎ শেষ ঊনচল্লিশ অধ্যায়ে দ্বারকালীলা।

"গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা বলেন—বৃন্দাবনে কেবলা রতি আর মথুরা ও দ্বারকায় ঐশ্বর্যমিশ্রা রতি।"

"রতি কাকে বলে দাদা ?" সাহাবাবু প্রশ্ন করেন।

"সংক্ষেপে শ্রীভগবানের প্রতি অনুরাগ।" সাহাবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সরকারদা একবার থামেন। তারপর আবার বলতে থাকেন, "বৃন্দাবনেও ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু সেখানে মাধুর্যই প্রধান। মথুরায় ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য সমান সমান। আর দ্বারকায় ঐশ্বর্য প্রধান। ঐশ্বর্য মাধুর্যকে ঢেকে রাখে বলে ভক্ত-বৈষ্ণবদের কাছে বৃন্দাবনের স্থান দ্বারকার ওপরে। তাহলেও আমরা যেহেতু দ্বারকায় চলেছি, আমাদের কাছে দ্বারকা এখন মন-দ্বারকা।

"আপনারা জানেন, কংসকে বধ করার পরে তাঁর শ্বশুর মগধরাজ জরাসন্ধ বার বার মথুরা আক্রমণ করেন। কৃষ্ণ-বলরামের হাতে সতেরো বার পরাজিত হবার পরেও তাঁর প্রতিহিংসা শান্ত হয় না। কৃষ্ণ ও বলরাম যখন জরাসন্ধের অষ্টাদশ আক্রমণের প্রতীক্ষা করছেন, তখন অতর্কিতে কালযবন নামে এক দুর্দান্ত মহাবীর নারদের পরামর্শে মথুরা আক্রমণ করলেন।"

"শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে, এখন যদি জরাসন্ধ কালযবনের সঙ্গে যোগ দেয়, তাহলে যাদবদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই তিনি সমুদ্রের মধ্যে এক সুরক্ষিত পুরী নির্মাণ করে আত্মীয়-স্বজনদের সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। সেই পুরীই দ্বারকাপুরী, আমরা এখন সেখানেই চলেছি।"

"যাদবদের দ্বারকায় পাঠিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে কালযবনকে বধ করেন। কিন্তু তারপরেই জরাসন্ধ অষ্টাদশবার মথুরা আক্রমণ করলেন। স্বজনহীন কৃষ্ণ তখন জরাসন্ধের সঙ্গে রণে প্রবৃত্ত না হয়ে বলরামকে নিয়ে দ্বারকায় পালিয়ে এলেন। রণ ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন বলে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রণছোড়জীরূপে পূজিত।"

"ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের দুটি রূপ—নন্দনন্দন ও বাসুদেব, গোপ এবং যাদব। বৃন্দাবনে যিনি বেণুকর নটবর, মথুরা ও দ্বারকায় তিনিই যাদব। তবে দ্বারকালীলায় দন্তবক্র-বধের পরে কৃষ্ণ কিছুকালের জন্য ব্রজে এসেছিলেন। তখন তিনি আবার গোপেন্দ্রনন্দন।"

• "আপনারা জানেন ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ বৈশ্য, জাতিতে গোয়ালা। গো গোপ গোপী গোষ্ঠ গোকুল ও গোবর্ধন তাঁর নিত্যসঙ্গী। কিন্তু ব্রজের বাইরে তিনি ক্ষত্রিয়। সেখানে তাঁর ক্ষত্রিয় বেশ এবং আবেশ। রাজা-রাজ্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয়, আদেশ-নির্দেশ, কর্তব্য-দায়িত্ব, রক্ষণ এবং পালনই তাঁর নিত্যকার্য। সেই পাণ্ডবপ্রিয়, মহিষীপ্রিয় এবং যাদবপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় চলেছি আমরা। ব্রজনাথ নয়, যদুনাথের দ্বারকায়।"

"ভাগবতের মতে কিন্তু কৃষ্ণের দ্বারকালীলাও কম বৈচিত্র্যময় নয়। কারণ রাসলীলার মতো সেখানেও নাকি তাঁর ষোড়শসহস্র গৃহাশ্রম। রাস-রজনীতে যেমন যত গোপী তত গোবিন্দ, তেমনি দ্বারকারও ষোল হাজার গৃহে যত প্রেয়সী তত দয়িত। ব্রজের মতো দ্বারকায়ও যিনিই তাঁকে আত্মদান কবেছেন, তাঁকেই তিনি নিজজন করে নিয়ে কৃতার্থ করেছেন। এখানেও সেই বহুবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ।"

একবার থামেন সরকারদা। মেহসানা প্যাসেঞ্জার ছুটে চলেছে গন্তব্যস্থলের দিকে। সেখান থেকে আমরা দ্বারকার ট্রেন পাবো। আমরা এখন সেই মন-দ্বাবকার কৃষ্ণকথা শুনছি।

সরকারদা আবার আবম্ভ করেন, "আমি গৌড়ীয় বৈষ্ণব, সুতরাং আমার কাছে শ্রীমদ্ভাগবত পবিত্রতম পুঁথি। কিন্তু একটু আগেই আমি বলেছি যে, ইতিহাস হিসেবে মহাভারতের স্থান ভাগবতের ওপরে। আর যেহেতু আমরা এখন দ্বারকায় চলেছি, সেইহেতু আমি এখন মহাভারতের কৃষ্ণ-কথা বলব।"

আমরা মাথা নাড়ি।

সরকারদা বলে চলেন, "মহাভারতে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে উল্লেখ-যোগ্যভাবে প্রথম দেখতে পাই আদিপর্বের একশো ছিয়াশী অধ্যায়ে, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায়। দুর্যোধন দুঃশাসন কর্ণ শকুনি অশ্বত্থামা জয়দ্রথ চিত্রাঙ্গদ শিশুপাল ও জরাসন্ধ প্রভৃতি তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতিরা লক্ষ্যভেদ করবার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়ে-

ছিলেন। অক্রুর উদ্ধব শম্ভু ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতিকে নিয়ে বলরামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণও দ্বারকা থেকে সেখানে গিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি লক্ষ্যভেদ করবার জন্য যান নি, গিয়েছিলেন দর্শক হিসেবে, যেমন সেদিন সেই দ্রুপদ রাজসভায় সমবেত হয়েছিলেন অসংখ্য দৈত্য দেবর্ষি ঋষি গন্ধর্ব ও অপ্সরীগণ। কিন্তু আমার ধারণা, শ্রীকৃষ্ণের সেখানে যাবার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল।"

"কি ?" সরকারদা থামতেই উমাদি জিজ্ঞেস করেন।

সরকারদা জবাব দেন, "জতুগৃহদাহের পর থেকে তিনি পাণ্ডবদের খবর পাচ্ছিলেন না। অথচ কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন তাঁরা পুড়ে মরেন নি। তিনি জানতেন, পাণ্ডবরা যেখানে যেভাবেই থাকুন, তাঁরা স্বয়ংবর-সভায় নিশ্চয়ই আসবেন। তাই কৃষ্ণার অনুপম রূপলাবণ্য দেখে অভ্যাগতরা যখন কন্দর্পবাণে নিপীড়িত, কৃষ্ণ তখন চারিদিকে চেয়ে চেয়ে উপস্থিত জনমণ্ডলীর মাঝে পঞ্চপাণ্ডবকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বলা বাহুল্য ব্রাহ্মণবেশী ভস্মাবৃত পাণ্ডবদের চিনতে তাঁর কোন অসুবিধে হল না। তবে তিনি সেকথা শুধু বলরামকে জানালেন।"

"তারপরেই আমরা কৃষ্ণকে দেখতে পাই মধ্যস্থ রূপে। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের পরে তাঁরই মধ্যস্থতায় উপস্থিত নৃপতিমণ্ডলীর সঙ্গে পাণ্ডবদের যুদ্ধবিরতি ঘটল। তিনি পাণ্ডবদের দেখিয়ে বললেন—ভূপালবৃন্দ! এঁরাই ধর্মত রাজকুমারীকে লাভ করেছেন। তোমরা ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই।

"রাজারা শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ উপেক্ষা করলেন না। তাঁরা সংগ্রামে বিরত হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।"

থামলেন সরকারদা। আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকাই। কিন্তু কেউ কিছু বলে ওঠার আগেই তিনি আবার শুরু করলেন, "যুদ্ধ থেমে যাবার পরে পাণ্ডবরা বিজয় গৌরবে ভার্গব-কর্মশালায় মায়ের কাছে ফিরে এলেন। মা তখন ঘরের ভেতরে ছিলেন। ভীমার্জুন বাইরে থেকে বললেন—মা আজ এক রমণীয় জিনিস ভিক্ষা পেয়েছি।"

"মা দ্রৌপদীকে না দেখেই ভেতর থেকেই উত্তর দিলেন—যা পেয়েছ, সকলে সমবেত হয়ে ভোগ কর। তারপরেই তিনি বাইরে বেরিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তাড়াতাড়ি যুধিষ্ঠিরকে বললেন—এখন একটা উপায় কর, যাতে আমার কথাও মিথ্যে না হয়, আবার দ্রুপদকুমারীও কষ্ট না পায়।

"যুধিষ্ঠির তখন অর্জুনকে বললেন—যাজ্ঞসেনী তোমার জয়লব্ধ বস্তু। তুমি তাকে বিয়ে কর।

"অর্জুন আপত্তি করলেন—আপনি ও মেজদা অবিবাহিত থাকতে আমি কেমন করে বিয়ে করব?

"তখন যুধিষ্ঠির বললেন—তাহলে তো মায়ের আদেশই রক্ষা করতে হয়, পাঞ্চালীকে আমাদের সকলেরই সহধর্মিণী হতে হয়।

"এই সিদ্ধান্ত নেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলরাম ও কৃষ্ণ ছদ্মবেশে সেখানে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে আত্মপরিচয় দিলেন। রাম-কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে পাণ্ডবরা পুলকিত হলেন। জিজ্ঞেস কবলেন—আমরা যে এখানে গোপনে বাস করছি, তা তোমরা জানতে পাবলে কেমন করে?

"বাসুদেব সহাস্যে উত্তর দিলেন—আগুন ছাইচাপা থাকলেও তার উত্তাপ পাওয়া যায়। অর্জুন ছাড়া যে আর কেউ লক্ষ্যভেদ করতে পারে না এবং পাণ্ডবরা ছাড়া যে আর কেউ সমবেত নৃপ-মণ্ডলীর সঙ্গে ওভাবে যুদ্ধ করতে পারে না, তা বুঝবার জন্য খুব বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। যাক্‌গে, আপনারা যে সেই ভয়ঙ্কর আগুনের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছন এবং দুর্যোধনের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হয় নি, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য।

"তারপরে রাম-কৃষ্ণ পিসীমা কুন্তীদেবীকে প্রণাম করে দ্বারকার পথে রওনা হলেন। অর্থাৎ দ্রৌপদীর বিয়ের সময় কৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর এই অনুপস্থিতি অকারণে নয়। কৃষ্ণ চান নি যে, পাণ্ডবরা ভিখারীর বেশে রাজকন্যা দ্রৌপদীকে বিয়ে করেন।

তাই তিনি তাড়াতাড়ি দ্বারকায় ফিরে গিয়ে পাণ্ডবদের প্রচুর উপহার পাঠিয়ে দিলেন।"

"কি কি পাঠালেন?" সরকারদা থামতেই বিউটি জিজ্ঞাসা করে।

"সে অনেক কিছু।"

"যেমন?"

"বিচিত্র বৈদূর্যমণি, স্বর্ণালঙ্কার, নানাদেশীয় মূল্যবান পোশাক এবং শয্যাদ্রব্য, বিবিধ গৃহসামগ্রী, হাতি ঘোড়া রথ এবং প্রচুর টাকা-পয়সা।"

"তারপরে আমরা মহাভারতে আবার কোথায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাই?" এবারে সত্যেনদা প্রশ্ন করেন।

সরকারদা উত্তর দিলেন, "প্রভাসে।"

"কখন?"

"অর্জুন তাঁর একক বনবাসের সময় যখন প্রভাসে এসেছিলেন।"

"একটু খুলে বলুন না!" এবারে সুরমাদি সরকারদাকে অনুরোধ করেন।

সরকারদা মৃদু হেসে বলতে থাকেন, "আপনারা জানেন যে, দ্রৌপদীকে বিয়ে করার পরে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে একটা ব্যবস্থা হয়েছিল যে, তাঁদের একজন যখন কৃষ্ণার কাছে থাকবেন, তখন অন্য কেউ সেখানে যেতে পারবেন না। কেউ এ নিয়ম ভঙ্গ করলে, তাঁকে বারো বছরের জন্য বনবাসী হতে হবে।

"কিছুকাল পরে একদিন যুধিষ্ঠির যখন আয়ুধাগারে দ্রৌপদীর সঙ্গে সহবাসে ছিলেন, তখন জনৈক ব্রাহ্মণ এসে অর্জুনকে জানালেন যে, চোর তাঁর গোধন চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। নিরুপায় অর্জুনকে অস্ত্রাগারে প্রবেশ করতেই হল। গোধন উদ্ধার করে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে বনবাসী হলেন। এই বনবাসের সময় অর্জুন নাগকন্যা উলুপী ও মণিপুরের রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ

করেন। তিনি তিনবছর মণিপুরে বাস করেন। তখনই বভ্রুবাহনের জন্ম হয়।

"মণিপুর থেকে বিভিন্ন তীর্থদর্শন করে অর্জুন এলেন প্রভাসতীর্থে। খবর পেয়ে কৃষ্ণ ছুটে গেলেন সেখানে। তারপরে দুজনে প্রভাস-ভ্রমণ সেরে রৈবতক পর্বতে উপস্থিত হলেন। বাসুদেব সেখানে আগের থেকেই সব ব্যবস্থা করিয়ে রেখেছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পরে নাচ-গানের আসর বসল।

"পরদিন সকালে কৃষ্ণের সঙ্গে পার্থ এলেন দ্বারকায়। শত শত দ্বারকাবাসী পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন। মেয়েরা গবাক্ষদ্বার থেকে অর্জুনকে অভিনন্দিত করলেন।

"কয়েকদিন দ্বারকায় কাটিয়ে অর্জুন আবার যাদবদের সঙ্গে রৈবতকে এলেন। সেখানে তখন মহোৎসব চলছে। সেই মহোৎসবেই ধনঞ্জয় প্রথম সুন্দরী সুভদ্রাকে দেখলেন। তাঁর চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠল।

"সর্বজ্ঞ কৃষ্ণ সহাস্যে সুভদ্রার পরিচয় দিয়ে বললেন—পছন্দ হলে বল, বাবার কাছে প্রস্তাব করি।

"লজ্জিত অর্জুন বললেন—একে তোমার বোন, তার ওপরে এমন রূপসম্পন্না, পছন্দ হবে না কেন? তোমার আপত্তি না থাকলে বল, কিভাবে আমি সুভদ্রাকে পেতে পারি?

"বাসুদেব উত্তর দিলেন—স্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়দের বিধেয়, কিন্তু মেয়েদের মনের কথা কিছুই বলা যায় না। ধর্মশাস্ত্রকারগণ বলেন, বিবাহের উদ্দেশে বলপূর্বক নারীহরণ ক্ষত্রিয়দের প্রশংসনীয় কর্ম। অতএব তুমি আমার বোনকে হরণ করে নিয়ে যাও।

"অর্জুন সে পরামর্শ গ্রহণ করলেন। সুভদ্রা যখন দেবার্চনা শেষ করে রৈবতক থেকে দ্বারকায় ফিরে আসছিলেন, তখন তিনি জোর করে সুভদ্রাকে রথে তুলে নিলেন।

"সুভদ্রার দেহরক্ষীরা দ্বারকায় এসে সুভদ্রা-হরণের সংবাদ

দিলেন। অকৃতজ্ঞ অর্জুনকে শাস্তি দেবার জন্য সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। সবচেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ হলেন বলরাম। তিনি ছুটে এলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। তাকে বললেন—তোমার প্রাণ-প্রিয় সখা অর্জুনের কীর্তি শুনেছ? সে যে-পাত্রে ভোজন করেছে, সেই পাত্রই চূর্ণ করেছে। কুলপাংশুলটা আমাদের চরম অপমান করেছে। তুমি এখনও চুপ করে রয়েছ!"

"এক মিনিট সরকারদা!" সাহাবাবু বলে ওঠেন, "শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম বৈমাত্রেয় ভাই। কাজেই অর্জুন তো তাঁদের দুজনেরই পিসতুত ভাই?"

"হ্যাঁ।" সরকারদা উত্তর দেন, "তাহলেও বলরাম এতই রেগে গিয়েছিলেন যে, তিনি ভাই শব্দটা ব্যবহার করলেন না।'

"কিন্তু অর্জুন নিজের মামাতো বোনকে হরণ করলেন?"

"না।" সরকারদা মৃদু হেসে সাহাবাবুর প্রশ্নের উত্তর দেন। বলেন, "সুভদ্রা বসুদেবের পালিতা কন্যা।"

একটু থেমে তিনি আবার শুরু করেন, "যেন কিছুই হয় নি, এমনি ভাব মুখে ফুটিয়ে শান্তস্বরে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন—কেন, কি করেছে অর্জুন?

"—কি করে নি সে? ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলরাম বললেন, সে সমস্ত যদুবংশকে অপমান করেছে। আমাদের প্রাণপ্রিয়া সুভদ্রাকে হরণ করে নিয়ে গেছে।

"—তাই বল! শ্রীকৃষ্ণ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। বললেন —কিন্তু অর্জুন তো আমাদের বংশকে অপমান করে নি।

"—তাহলে?

"—সে আমাদের বংশের সম্মান রক্ষা করেছে।

"—কারণ?

"—কারণ সে আমাদের অর্থলোভী মনে করে সুভদ্রার জন্যে কনে-পণ দিতে চায় নি। স্বয়ংবরে কন্যালাভ দুরূহ বলে স্বয়ংবরে

সম্মত হয় নি। পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে কন্যাগ্রহণ অক্ষত্রিয় কাজ বলে বাবার সঙ্গেও দেখা করে নি।...

"বলরাম কৃষ্ণকে শেষ করতে দেন না, প্রশ্ন করেন—তা সে যা করেছে, তা কি ঠিক কাজ হয়েছে?

"—নিশ্চয়ই। কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, কুল শীল বিদ্যা ও বুদ্ধিসম্পন্ন ধনঞ্জয় সুভদ্রাকে হরণ করে আমাদের কুলোচিত কাজ করেছে। এর ফলে সুভদ্রাও যশস্বিনী হবে।

"একবার থেমে কৃষ্ণ অপেক্ষাকৃত উষ্ণকণ্ঠে বললেন—তাছাড়া কুন্তীভোজের ভবতকুলশ্রেষ্ঠ সব্যসাচীকে তোমরা কি-ই বা করতে পার? স্বয়ং মহাদেব ছাড়া ত্রিভুবনে আর কে তাকে পরাজিত করতে পারে? কাজেই তার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত না হয়ে তার কাছে গিয়ে প্রফুল্লমনে তাকে আমাদের অভিনন্দিত করা কর্তব্য।

"বলরাম ও যাদবগণ কৃষ্ণের পরামর্শ মেনে নিলেন। তাঁরা অর্জুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, সসম্মানে সব্যসাচী ও সুভদ্রাকে দ্বারকায় ফিরিয়ে আনলেন। মহাসমারোহে তাঁদের শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হল। নবদম্পতি একবছর দ্বারকায় কাটিয়ে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে রমণীয় তীর্থরাজ-পুষ্করে চলে গেলেন। অর্জুন ও সুভদ্রা দ্বাদশবর্ষ বনবাসের বাকি সময়টা সেখানেই অতিবাহিত করলেন। তারপরে তাঁরা খাণ্ডবপ্রস্থে ফিরে গেলেন। সেখানে চারভাই, কুন্তীদেবী এবং দ্রৌপদী পরমসমাদরে তাঁদের বরণ করলেন। সুভদ্রা দ্রৌপদীকে বললেন—আমি আজ থেকে আপনার অনুচরী হলাম। কৃষ্ণা সস্নেহে সখা কৃষ্ণের ভগিনীকে বুকে টেনে নিলেন।

"অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্তন করেছেন শুনে বলরাম এবং অন্যান্য যাদবদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রচুর উপহারসহ খাণ্ডবপ্রস্থে উপস্থিত হলেন। পাণ্ডবগণ পরম পুলকে তাঁদের বরণ করলেন। কিছুদিন সেখানে অতিবাহিত করে বলরাম যাদবদের নিয়ে দ্বারকায় ফিরে এলেন। কৃষ্ণ কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থেই রয়ে গেলেন।"

॥ দুই ॥

ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। ফুলকো লুচি, বেগুনভাজা ও হালুয়া। গাড়িতে বসে এমন বাড়ির খাবার কখনও খাই নি। কুণ্ডু স্পেশালের চেযে ভাল ট্যাব-কণ্ডাক্টর ভাবতে আছে কিনা জানি না। কিন্তু তাঁদেব চেয়ে যে ভাল ট্যুর-ক্যাটারার নেই, একথা সোচ্চার স্বরে বলতে পাবি। তীর্থযাত্রায় এঁরা নিরামিষ খাবার দিয়ে থাকেন। কিন্তু এমন পবিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুস্বাদু খাবার পেলে যে-কোন আমিষাশী আনন্দিত হবে। শুধু তাই নয়, সময়ানুবর্তিতাও মনে বাখবাব মতো। নানা প্রতিকুল অবস্থার ভেতরেও এঁরা ঠিক সময়ে খাবার পরিবেশন করে চলেছেন। অথচ এখন তাঁদের দুজন লোক কম। ভৌমিকবাবু অসুস্থ হয়ে পড়ায় সহকারী ম্যানেজার তপন জয়পুব থেকে কলকাতায় চলে গিয়েছে। আর অহীনকেও আবু-রোডে রেখে আসতে হল। কিন্তু না, অহীনের কথা থাক্। ওর কথা বলতে গেলেই আবার শঙ্করীদের কথা এসে পড়বে। ওদের কথা আমি আর ভাবতে চাইছি না।

বাণেশ্বরের হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে খাবারে মনোনিবেশ করি। বেশ ক্ষিদে পেয়েছে। গতকাল মাউণ্ট আবু থেকে ফিরে এসেই দুঃসংবাদটা শুনেছিলাম। ডাঃ ভাদুড়ী শ্রীকে নিয়ে কয়েকদিন ট্রেন-জার্নি করতে নিষেধ কবে দিয়েছেন। তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে বলেছেন। ফলে কাল রাতে আমি একেবারেই খেতে পারি নি।

কিন্তু আর আবু-রোডের কথা নয়, মেহসানা এসে গেছে। ট্রেন থেমেছে স্টেশনে। ম্যানেজার পাঁচুবাবু যথারীতি জুতো পরে নেমে গেল গাড়ি থেকে। তাকে এখন যেতে হবে এ. এস. এম. অফিসে।

'গাড়ি কাটাবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং পরবর্তী দ্বারকাগামী ট্রেনের সঙ্গে আমাদের গাড়িটি জুড়ে দেবার জন্য তদ্বির করতে হবে।

কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এলো ম্যানেজার। এসেই দুঃসংবাদটা জানালো, "আজ এখানেই থাকতে হবে।"

"কেন ?" আমরা আঁতকে উঠি।

"ট্রেন নেই। সেই একই ইতিহাস, কয়লার অভাবে ট্রেন বাতিল।"

"পরের ট্রেন কখন ?"

"আগামীকাল সকালে। তার মানে আজ সারাদিন ও সারারাত এখানে পড়ে থাকতে হবে।"

একেই বলে অদৃষ্ট। দ্বারকার আকর্ষণে শঙ্করীদের আবু-রোড স্টেশনে ফেলে এলাম, অথচ পাঁচঘণ্টা পরেই দিনের যাত্রার যতি টানতে হল। রেলপথে আবু রোড থেকে মেহসানা মাত্র ১১৭ কিলোমিটার, সকাল ছ'টায় ট্রেন ছেড়েছিল, আর এখন বেলা এগারোটা। এর চেয়ে আজকের দিনটা আবু-রোডে থেকে যাওয়াই ভাল ছিল। অসুস্থ মেয়েটার কাছে আর একটা দিন থাকা যেত।

তাহলে অবশ্য কালকের দিনটাও এমনি নষ্ট হত। কারণ এখান থেকে এখন আমাদের দ্বারকায় নিয়ে যাবার মতো ঐ একখানি ট্রেন ! অপর ট্রেনটি কয়লার অভাবে বাতিল হয়ে গেছে।

আবু-রোড থেকে দ্বারকার পথ খুব দীর্ঘ নয়, মাত্র ৫৮২ কিলোমিটার। অথচ এই পথটুকু অতিক্রম করার জন্যই আমাদের সাতাশ ঘণ্টা রেলভ্রমণ নির্দিষ্ট করা ছিল। আর এখন কাল সকাল পর্যন্ত এখানে ঠায় বসে থাকতে হবে। অতএব সব মিলিয়ে আবু-রোড থেকে দ্বারকা যেতে আমাদের পঞ্চাশ ঘণ্টার ওপরে সময় লাগবে।

তবে কয়লার অভাবই এর একমাত্র কারণ নয়। বাতিল করা ট্রেনটি ছাড়াও আজ এখান থেকে দ্বারকার পথে আরও দু'খানি ট্রেন

আছে। কিন্তু তার একখানি মেল ও অপরখানি এক্সপ্রেস। তাদের সঙ্গে ট্যুরিস্ট-কোচ্ যুক্ত করার আইন নেই। সুতরাং ধৈর্য সহকারে আগামীকাল সকালের সেই ধীরগতি প্যাসেঞ্জার ট্রেনটির জন্য অপেক্ষা করাই এখন আমাদের একমাত্র কাজ।

মাসিমার ডাকে চিন্তায় ছেদ পড়ে। মাসিমা মানে শঙ্করী পূর্ণিমা ও সের্জাদর মা। সুশ্রী ও শান্তস্বভাবা প্রৌঢ়া। অতিশয় স্নেহশীলা। দুটি যুবতী মেয়ে ও একটি সাত বছরের নাতনীকে আবু-রোডে ফেলে তাঁকে দ্বারকা-দর্শনে যেতে হচ্ছে। তাই সকাল থেকে এতক্ষণ তিনি শুয়ে ছিলেন পাশের খোপে। সহসা তিনি উঠে এসেছেন।

মাসিমা আমাকে বলেন, "বাবা জ্যোতি, আমরা তো আবু-রোড থেকে খুব বেশিদূর আসি নি?"

"না", উত্তর দিই, "মাত্র ১১৭ কিলোমিটার।"

"তাহলে বোধহয় রেল-অফিসে গেলে ফোনে ওদের একটা খবর নেওয়া যেতে পারে। মেয়েটা ভাল আছে জানলে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।"

সত্যিই তো। এটা তো কারও খেয়াল হয় নি! মেহসানা সম্ভবত আবু-রোডের রেলওয়ে ডিভিশন্যাল হেড-কোয়ার্টার। ফোনে সরাসরি যোগাযোগ করা যেতে পারে। শঙ্করীর বাবা নাকি বেড়াতে বড়ই ভালোবাসতেন। মাসিমা তাঁর সঙ্গে বহু জায়গায় বেড়িয়েছেন। কাজেই রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর বেশ ভাল ধারণা রয়েছে।

ম্যানেজার পাঁচুবাবুকে কথাটা বলতেই সে রাজী হয়ে যায়। বলে, "চলুন, তাহলে একবার এরিয়া-কন্ট্রোল অফিস থেকে ঘুরে আসা যাক্।"

জামা-জুতো পরে নেমে পড়ি গাড়ি থেকে। পাঁচুর চেনা জায়গা। আমরা স্টেশন ছাড়িয়ে রাস্তায় নেমে আসি। মেহসানা জেলা-সদর।

১৯৩১ সালের আদমশুমার অনুযায়ী জনসংখ্যা ৫১,৭১৩ জন। কাজেই পথ বেশ জনবহুল। পথের দুপাশে দোকানপাট।

খানিকটা হেঁটে পথের বাঁ-পাশে একটু উঁচুতে এরিয়া-কণ্ট্রোল অফিস। জনৈক অফিসারের কাছে যেতেই তিনি আমাদের বসতে অনুরোধ করলেন। সব কথা শুনে বললেন, "এ আর একটা কঠিন কাজ কি? তাঁদেব নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে যান, ঘণ্টা দুই পরে এসে খবর নিয়ে যাবেন।"

ফিরে এলাম স্টেশনে। প্লাটফর্মেই দেখা হয়ে গেল ঠাকুরমাদের সঙ্গে। তাঁরা ওয়েটিং-রুমে স্নান করতে চলেছেন, সঙ্গে বাসি কাপড়ের বালতি। রাজস্থান মরুভূমির দেশ, সেখানে জলাভাব হওয়া বিচিত্র নয়। তাই আগ্রা থেকে গাড়ি ছাড়ার পবেই ম্যানেজার আমাদের বলে দিয়েছিল—গাড়ির জলে কারও স্নান বা কাপড় কাচা চলবে না। ও-কাজ দুটো স্টেশনে স্টেশনেই সেরে নিতে হবে।

কিন্তু গুজরাট তো ঠিক রাজস্থানের মতো নয়। অন্তত আজ সকালে গাড়িতে আসতে আসতে তাই মনে হয়েছে। গুজরাটের প্রকৃতি রাজস্থানের মতো রুক্ষ নয়, অনেক স্নিগ্ধ ও সুন্দরতর। আজ মাঝে মাঝেই বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র দেখেছি।

তাহলে এখানে আমরা গাড়ির জলে স্নান করতে পারব না কেন?

ম্যানেজার জানাল—"এখানে জলাভাব নেই বটে, কিন্তু রেল-কর্তৃপক্ষ দৈনিক একবারের বেশি জল দেবেন না। সে জল স্নান কিংবা কাপড় কেচে খরচ করে ফেললে পরে হাত-মুখ ধোবার জল পাওয়া যাবে না।"

কথাটা মিথ্যে নয়। তার ওপরে ঠাকুরমারা দৈনিক দুবার করে কাপড় ছাড়েন এবং তাঁরা পূর্ববঙ্গের মানুষ। তাঁদের স্নানে একটু বেশি জল লাগে। ম্যানেজারের সাধ্য কি গাড়িতে এত জলের যোগান দেয়!

এজন্য ঠাকুরমাদের অবশ্য কোন অভিযোগ নেই। তাঁরা কুণ্ঠ

স্পেশালের সঙ্গে বেশ কয়েকবার তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছেন। তাঁদের এসব জানা আছে। তাঁরা বাসি কাপড় বালতিতে জমিয়ে রাখেন। জংশন স্টেশন এলেই ম্যানেজারের অনুমতি নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। সদলবলে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং-রুমে ছোটেন। চৌকিদারকে বকশিশ দিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়েন। প্রাণভরে স্নান ও কাচা শেষ করে বেরিয়ে আসেন। প্লাটফর্মে কাপড়জামা শুকোতে দেন। এমন চটপটে ভ্রমণপটু বৃদ্ধা-পর্যটক আমি খুব কমই দেখেছি। তাঁরা সবার আগে গাড়ি থেকে নামেন, সকলের চেয়ে বেশি দর্শন করে সবার আগে গাড়িতে ফিরে আসেন।

ঠাকুরমারা তিনজন, কিন্তু তারা দলে পাঁচজন। সঙ্গে দুজন দিদি রয়েছেন। তাঁদেব একজনের নাম জানি না। অপর জন কল্পনাদি—মিসেস কল্পনা রায়। ঠাকুবমারা কেউই কারও আত্মীয়া নন। এমনি তীর্থদর্শনে বেরিয়েই তাঁদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল। সেই থেকে তাঁরা একত্রে তীর্থদর্শন করে চলেছেন। অনামী দিদি বড়-ঠাকুরমার অবিবাহিতা ছোটবোন। বলা বাহুল্য, তাঁর বিয়ের বয়স বহু বছর আগেই অতিবাহিত হয়েছে।

কল্পনাদি মধ্যবয়সী, সুশ্রী এবং শিক্ষিতা। তিনিও জনৈকা ঠাকুরমার আত্মীয়া। ধর্মপরায়ণা এবং শান্তস্বভাবা। প্রতিদিন শেষরাতে উঠে গরদ পরে গীতাপাঠ করেন। আমি শুয়ে শুয়ে শুনি। বেশ ভাল লাগে আমার।

ম্যানেজাবের সঙ্গে প্লাটফর্ম থেকে নেমে আসি। রেল-লাইন ধরে এগিয়ে চলি সাইডিংয়ের দিকে। বড় বড় শহর ছাড়া বড় একটা ট্যুরিস্ট প্লাটফর্ম থাকে না। সেখানে সুবিধামত কোন জায়গায় ট্যুরিস্ট-কোচ্ রাঁখা হয় এবং প্রয়োজনে তার স্থান পরিবর্তন করা হয়। এই স্থান পরিবর্তনের নাম শান্টিং।

এবারে কুণ্ডু স্পেশালের সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে আমার সবচেয়ে বড় লাভ—এই শান্টিং বস্তুটিকে চিনতে পারলাম। কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়-

প্রয়োজনেই ট্যুরিস্ট-কোচ্ শান্টিং করেন। কিন্তু তার ফলে ট্যুরিস্টদের মাঝে মাঝেই খুব অশান্তির মধ্যে সময় কাটাতে হয়। যেমন ধরুন রাতে আপনারা কোন স্টেশনে রয়েছেন। খাওয়া-দাওয়ার পরে আলো নিবিয়ে সবে শুয়ে পড়েছেন। ক্লান্ত দেহ, চোখের পাতা বুজে আসতে সময় লাগল না। কিন্তু ঠিক তখুনি কোন এক অজানা কারণে আপনার গাড়ির শান্টিং শুরু হয়ে গেল। আর দফায় দফায় সে শান্টিং চলল। আপনাকে প্রায় সারারাতই জেগে থাকতে হল। কারণ যখনই আপনি ঘুমোবার চেষ্টা করেছেন, তখুনি শান্টিং এঞ্জিন এসে আপনাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সকালে উঠে সবিস্ময়ে দেখেছেন—আপনি গতকাল সন্ধ্যায় যেখানে ছিলেন, পরদিন সকালেও ঠিক সেখানেই রয়েছেন। স্বভাবতই রাতের শান্টিংকে আপনার ভৌতিক কাণ্ড বলে মনে হতে পারে।

আবার যেমন ধরুন, আপনি স্নান করতে যাবার সময় গাড়িটা প্লাটফর্মে ছিল। স্নান করে ফিরে এসে দেখেন গাড়ি সেখানে নেই। অথচ আপনার তখন পরনে গামছা, কাঁধে ভিজে কাপড়। সেই অবস্থাতেই ছুটতে হবে ওয়ার্ড-মাস্টারের অফিসে। তাঁর কাছ থেকে খবর নিয়ে সাইডিং থেকে গাড়ি খুঁজে বার করতে হবে।

ম্যানেজার সঙ্গে থাকায় এখন গাড়ি খুঁজতে কোন অসুবিধা হল না। আমরা গাড়িতে উঠে এলাম। মাসিমা সেজদি সাহাবাবু বিউটি উমাদি ও সত্যেনদা যেন আমাদেরই প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁরা সবাই ছুটে আসেন দোরগোড়ায়, সমস্বরে প্রশ্ন করেন—"কোন খবর পেলে, ওরা কেমন আছে?"

"খবর পাওয়া যায় নি, তবে ঘণ্টা দুয়েকের ভেতরই পাওয়া যাবে।"

ওঁরা নিঃশব্দে জায়গায় ফিরে যান। সত্যেনদা বলেন, "চলো, স্নান করে আসা যাক্।"

সত্যেনদা মানে সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বয়সে প্রৌঢ়। সহজ সরল সাদাসিধে মানুষ। বরানগরে বাড়ি ও ব্যবসা। যৌথ পরিবার,

সত্যেন্দ্রনাথ সবার বড়। তাঁর বড় মেয়েটি কলেজে পড়ে। বড় ছেলেটি এবারে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিত। চমৎকার স্বাস্থ্য ছিল তার। খুব ভাল সাঁতার জানত। অথচ নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! সেই সাঁতার কাটতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটল। নিষ্ঠুর ভগবান অকারণে অসময়ে তাজা ছেলেটাকে কাছে টেনে নিলেন। কিন্তু ভক্ত সত্যেনদা ভগবানের এই অবিচারকে শান্তচিত্তে গ্রহণ করেছেন। তিনি তীর্থদর্শনে বেরিয়েছেন। ভাইয়েরা তাঁকে একা ছাড়েন নি, মা-কে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন।

সত্যেনদাব সঙ্গে নেমে আসি গাড়ি থেকে। শুধু স্নান নয়, কিছু জামাকাপড়ও কেচে দেওয়া দরকার।

জামাকাপড় কেচে ও স্নান সেরে ফিরে আসি গাড়িতে। সত্যেনদা সাহায্য করেছেন বলেই এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পেরেছি।

পাঁচু জিজ্ঞেস করে, "ঘোষদা, চা খাবেন নাকি?"

"এখন চা!' আমি বিস্মিত।

দাদা বলেন, "বুঝতে পারলে না? রান্না হতে দেরি আছে, তাই চা ঘুষ দেওয়া হচ্ছে। কুণ্ডু কোম্পানীর ম্যানেজার, বুঝলে হে!"

দাদা এব আগেও বার দুয়েক কুণ্ডু স্পেশালের সঙ্গে ভ্রমণ করেছেন। পাঁচু হাসতে হাসতে কিচেনে চলে যায়।

বৌদি আমাদের খোপে আসেন। বলেন, "ঘোষদা, আপনার কাছে নিশ্চয়ই গল্পের বই আছে? দিন না দুয়েকখানা, সময় যে আর কাটতে চাইছে না।"

বালিশের পাশে রাখা স্বামী দিব্যাত্মনন্দের 'পুণ্যতীর্থ ভারত' বইখানি এগিয়ে ধরি তাঁর দিকে।

বৌদি মাথা নেড়ে জানান, "না-না, ও-বই নয়, আমি অন্য বইয়ের কথা বলছি।"

আমেদাবাদে আমার এক দাদা মাসি ও দুজন বন্ধু থাকে।

তাঁদের জন্য আমার চারখানি বই নিয়ে এসেছি। সিটের তলা থেকে ট্রাঙ্কটা টেনে বের করি। বইগুলো বের করে বৌদির হাতে দিতেই দাদা পাঁচু ও কল্পনাদি তার হাত থেকে তিনখানি বই নিয়ে নেন।

দাদা বলেন, "আরে! এ যে দেখছি সবই শঙ্কু মহারাজের লেখা!"

চমকে উঠি। বৃহত্তর প্রয়োজনে সহযাত্রীদের কাছে সযত্নে আমার লেখক-পরিচয় গোপন করতে হয়েছে। এবং যাত্রার বাকি দিন ক'টিতে পরিচয়টা গোপন থাকা একান্তই প্রয়োজন। তাই কোনমতে সামলে নিই নিজেকে। দাদাকে বলি, "হ্যাঁ। উনি আমাকে বইগুলো দিয়ে দিয়েছেন, আমেদাবাদে ওঁর এক আত্মীয়কে দেবার জন্য।"

"আরে! তুমি শঙ্কু মহারাজকে চেন নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" সবিনয়ে উত্তর দিই।

দাদা আর কোন প্রশ্ন না করে 'গারো পাহাড়ের পাঁচালি' বইখানি নিয়ে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়েন।

বৌদি পাঁচু এবং কল্পনাদিও 'ভাঙা দেউলের দেবতা', 'গঙ্গাসাগর' এবং 'উত্তরস্যাং দিশি' বই তিনখানি নিয়ে নিজেদের জায়গায় চলে যান। আমি বাক্সটা রেখে দিয়ে আবার ওপরে উঠে বসি।

সহসা দাদা চীৎকার করে উঠলেন, "এটা কি হল?"

কি হল আবার! আমি ভয়ে ভয়ে তাঁর দিকে তাকাই। দাদাও তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। তাঁর চোখে-মুখে কেমন একটা সন্দেহ। কিন্তু আমি কোন কথা বলি না। শঙ্কিত বক্ষে পরবর্তী প্রশ্নের প্রতীক্ষা করতে থাকি।

দাদা প্রশ্ন করেন, "সেদিন আমার বাড়ির ঠিকানা বলার পরে তুমি আমাকে বলেছিলে না, বাঘা যতীন কলোনীর হৃষীকেশ ঘোষ দস্তিদার তোমার কাকা?"

এইবারে তাঁর অমন চেঁচিয়ে ওঠবার কারণ বুঝতে পারছি—'গারো পাহাড়ের পাঁচালি' বইখানি আমি নাম লিখে কাকাকে উৎসর্গ করেছি। আর দাদার প্রতিবেশী হৃষীকেশ ঘোষ দস্তিদার যে

আমার কাকা, তা-ও সেদিন কথায় কথায় বলে ফেলেছিলাম দাদাকে। তখন তো জানা ছিল না যে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এখন সামলাই কি করে? প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেলে যে আমার সহযাত্রীবা আমার সম্পর্কে বড় বেশি সচেতন হয়ে পড়বেন এবং আমিও আর সহজভাবে মেলামেশা করতে পারব না তাঁদের সঙ্গে।

বাধ্য হয়ে অভিনয় শুরু কবতে হয়। সহসা হো হো করে হেসে উঠি আমি। পাঁচু অমিয়বাবু ও সাহাবাবু অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকান।

একটু বাদে হাসি থামিয়ে দাদাকে বলি, "আপনি বুঝি ভেবেছেন যে হৃষীকেশবাবু যখন আমার কাকা এবং শঙ্কু মহারাজের কাকা, তখন আমিই শঙ্কু মহাবাজ?"

"তাহলে?" দাদা পাল্টা প্রশ্ন করেন।

গম্ভীর স্বরে বলি, 'শঙ্কু মহারাজ আমার গ্রাম সম্পর্কে জ্যাঠতুত দাদা। সুতরাং হৃষীকেশবাবু আমাদের দুজনেরই কাকা।'

"শঙ্কু মহারাজ তোমার ভাই?"

"না, দাদা। আমার থেকে অনেক বড়।"

"কলকাতায় ফিরে একবার আলাপ করিয়ে দেবে তাঁর সঙ্গে। ওঁর লেখা আমার খুব ভাল লাগে।"

আমি মাথা নাড়ি।

দাদা সন্তুষ্ট হয়ে আবার শুয়ে পড়েন বিছানায়। তিনি বই পড়া শুরু করেন। আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। কল্পনাদি 'উত্তরস্যাং দিশি' পড়তে নিয়েছেন। ঐ বইতে আবার আমার একটা ছবি আছে।

দাদার মতো কল্পনাদির কাছে এত সহজে রেহাই পাব বলে মনে হচ্ছে না, আর একবার কারও সন্দেহ হলে, সহযাত্রীরা সবাই আমাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে দেবেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে অনেকেই শুয়ে পড়লেন। পাখা চললেও গাড়ির ভেতরে বেশ গরম। তবু তাঁরা দিবানিদ্রার আয়োজনে লেগে গেলেন।

দিনে আমি ঘুমোতে পারি না। তাহলেও এই রোদে গাড়ি থেকে নেমে আসার কোন কারণ ছিল না। গাড়িতে বসে বৃন্দাবনে চিঠি লিখতে পারতাম। উদয়পুরের পরে আর মানসীকে চিঠি দেওয়া হয় নি। অথচ সেদিন আগ্রাফোর্ট স্টেশনে আমি ওকে কথা দিয়েছি, প্রত্যেক জায়গা থেকেই একখানি করে চিঠি দেব।

চিঠি না লিখলে ডায়েরী নিয়ে বসতে পারতাম। কিন্তু এ-সব কিছুই না করে আমি নেমে এলাম গাড়ি থেকে।

ম্যানেজার খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছে। সহকারী তপন চলে যাবার পর থেকে এতগুলো যাত্রীর সব ঝামেলা তাকে একা পোহাতে হচ্ছে। সে বোধহয় ভেবেছে এই দুপুর রোদে এরিয়া-কণ্ট্রোল অফিসে যাবার দরকার কি? বিকেলে গিয়ে খবর নিয়ে এলেই হবে।

কিন্তু আমার যে মন মানছে না। তাই কাউকে কিছু না বলে নেমে পড়েছি গাড়ি থেকে। চলেছি এরিয়া-কণ্ট্রোল অফিসে।

শ্রীর খবর পাওয়া গেল— ভাল খবর। সে ভাল আছে। বিমলবাবু কথা বলেছেন এঁদের সঙ্গে। জানিয়েছেন—মেয়ে তিন-চার দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। আমরা যেন কোন দুশ্চিন্তা না করি।

অফিসার ভদ্রলোককে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসি রেলওয়ে এরিয়া-কণ্ট্রোল অফিস থেকে। রাস্তায় নেমেই সামনে একটা সিনেমা হল। 'জুগনু' ছবি চলছে। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যাটিনী-শো শুরু হবে। ভীষণ ভিড়। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই বেশী। মেয়েরা প্রায় সবাই ছেলেদের পোশাক পরে ছেলেদের সঙ্গে টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেমন লম্বা

লাইন, তেমনি প্রচণ্ড রোদ। কিন্তু সবারই মুখে হাসি। ওরা, সিনেমা দেখতে এসেছে যে!

আবার স্টেশনে আসি। বেশ, বড় স্টেশন। হবেই তো, বিরাম-গাঁম-সুরেন্দ্রনগর-রাজকোট-জামনগব-ওখা রেলপথের একটি বড় জংশন মেহসানা।

কিন্তু আমাদের গাড়ি কোথায় গেল? এখানেই তো ছিল। আবার শান্টিং! নিশ্চয় তাই। কিন্তু গাড়িটা নিয়ে গেল কোথায়?

না, খুব দূবে নয়। কিছুক্ষণ ছুটোছুটির পবেই গাড়ি খুঁজে পেলাম। তবে তাতে লাভ হল না কিছু। দরজা বন্ধ, ভেতরে সবাই বোধহয় ঘুমে অচেতন। ডাকাডাকি করা উচিত হবে না। তার চেয়ে গাড়িটাকে একবার ঘুরে দেখা যাক্। কেউ যদি জেগে থাকেন, দেখতে পাবেন আমাকে।

গাড়ি-পরিক্রমা বৃথা হল না। স্বরং সরকারদা দেখতে পেলেন আমাকে। বৌদি এসে দরজা খুলে দিলেন।

সরকারদাব খোপের সামনে এসে বুঝতে পারি ব্যাপারটা। সেখানে রীতিমত সভা বসে গিয়েছে। সাহাবাবু, সত্যেনদা, মা ও অমিয়বাবু তো রয়েছেনই, উমাদি, কল্পনাদি, সুবর্ণাদি এবং বিউটিও এসে হাজির হয়েছে।

বৌদি জিজ্ঞেস করেন, "এই রোদে কোথায় গিয়েছিলেন ঘোষদা?"

"রেলের অফিসে, শ্রীর খবর আনতে।"

"কোন খবর পাওয়া গেল বাবা?" মাসিমা প্রায় ছুটে এলেন। বুঝতে পারছি, তিনি জেগেই ছিলেন এবং ওদের কথাই ভাবছিলেন বসে বসে।

"হ্যাঁ মাসিমা!" আমি উত্তর দিই, "খবর পেয়েছি, ভাল খবর। শ্রী ভাল আছে আজ। বিমলবাবু বলেছেন তিন-চার দিনের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।"

"বেঁচে থাকো বাবা! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।" আর

• কিছু বলতে পারেন না তিনি। চোখ মুছে তাড়াতাড়ি চলে যান নিজের জায়গায়।

সুরমাদি বলেন, "ভাই, বোস এখানে, সরকারদা কৃষ্ণ-কথা বলছেন।" তিনি একটু সবে বসেন।

এতক্ষণে সভার আলোচ্য বিষয়সূচী জানা গেল। দিদির কথা-মত বসে পড়ি তাঁর পাশে।

হ্যাঁ, সুবমাদি মানে সুরমা কুণ্ডুকে আমি 'দিদি' বলেই ডাকি। নিঃসন্তান বালবিধবা। জামাইবাবুব অকালমৃত্যুর পর থেকে ভাইদের সংসারে আছেন। বছর দশেক বয়সের একটি ভাইপো তাঁর বর্তমান জীবনের প্রধান অবলম্বন। তীর্থদর্শন ছাড়া তিনি তাঁকে ফেলে কোথাও যান না। তীর্থ করতে এসেও এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারছেন না তাকে। তাই প্রতি তীর্থে দর্শনের আগেই তার জন্য কেনা-কাটা সেরে নেন। এমন আশ্চর্য সুন্দর সরলার সংস্পর্শে খুব কমই এসেছি।

কল্পনাদি তাগিদ দেন, "এবারে শুরু করুন সরকারদা!"

"হ্যাঁ।" সরকারদা আরম্ভ করেন, "শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে ইন্দ্র-প্রস্থে বাস করতে থাকলেন। দ্রৌপদী সুভদ্রা ও শ্রীকৃষ্ণের সাহচর্যে পঞ্চপাণ্ডবের জীবনের দিনগুলি মন্দাক্রান্তা তালে বয়ে চলল। সুভদ্রার ছেলে অভিমন্যুর জন্ম হল। পাঁচ ভাইয়ের ঔরসে পাঞ্চালীর পাঁচ ছেলে জন্মালো—প্রতিবিন্ধ, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানিক ও শ্রুতসেন।

✕ "এই সময় একদিন কৃষ্ণ ও অর্জুন যখন যমুনায় জলবিহার শেষ করে বিশ্রাম করছিলেন, তখন জটাধারী একজন দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ তাঁদের সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁর দাড়ির রঙ হলুদ, গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মতো। পরনে চীরবাস, মাথায় জটা।

"কৃষ্ণার্জুন পরম-সমাদরে তাঁকে অতিথিরূপে বরণ করে তাঁর আগমনের কারণ জানতে চাইলেন।

"ব্রাহ্মণ বললেন—আমি অগ্নি। সর্বদা অপরিমিত ভোজন করি।

আমার বহুদিনের ইচ্ছা খাণ্ডববন দগ্ধ করি। কিন্তু ইন্দ্রের সখা পন্নগরাজ তক্ষক সেখানে সপরিবারে বাস করে বলে আমি জ্বলে উঠলেই ইন্দ্র সেখানে জলবর্ষণ করেন। ফলে আমি খাণ্ডবদাহ সম্পন্ন করতে পারছি না।"

একবার থামলেন সরকারদা। তারপরে বললেন, "আপনারা জানেন যে, রাজা শ্বেতকির যজ্ঞে একটানা বারো বছর ঘি খেয়ে অগ্নি-দেবের অগ্নিমান্দ্য হয়েছিল। প্রতিকারের জন্য ব্রহ্মার কাছে গেলে ব্রহ্মা তাঁকে পবামর্শ দিলেন—তুমি খাণ্ডববন দগ্ধ করে সেখানকার প্রাণীদেব মেদ ভক্ষণ কর।

"কিন্তু অগ্নিদেব সাতবার চেষ্টা কবেও খাণ্ডবদাহ করতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে তিনি আবার ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা তাঁকে বললেন—নর-নারায়ণঋষি অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ কবেছেন। তাঁরা এখন খাণ্ডববনেই রয়েছেন। তুমি তাঁদের সাহায্য প্রার্থী হও। তাঁরা সহায় হলে তুমি খাণ্ডবদাহ কবতে সমর্থ হবে। তাই অগ্নি ছুটে এসেছিলেন কৃষ্ণার্জুনের কাছে।

"যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম। অগ্নিব বক্তব্য শেষ হবার পরে কৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—তা আপনি এ ব্যাপারে আমাদের কি করতে বলেন?

"অগ্নি উত্তর দিলেন—আপনারা আমার সহায় হোন। অস্ত্র নিয়ে খাণ্ডববনের বাইরে পাহারায় থাকুন, যাতে কেউ বন থেকে পালিয়ে যেতে না পারে।

"একটু ভেবে অর্জুন বললেন—ইন্দ্রকে ভয় করি না। কারণ আমার এমন সব দিব্যাস্ত্র রয়েছে, যা দিয়ে ইন্দ্রের মতো শত শত্রু বজ্রধরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি। কিন্তু সেই সব অস্ত্র ব্যবহার করার মতো ধনু নেই আমার। নেই কোন বায়ুবৎ বেগশালী ঘোড়া এবং রথ। কৃষ্ণেরও এমন কোন অস্ত্র নেই, যা দিয়ে সে খাণ্ডববনের নাগ ও পিশাচদের সংহার করতে পারে।

"ভগবান হুতাশন তখন জলেশ্বর বরুণদেবকে ডেকে পাঠালেন সেখানে। বরুণ আসার পর অগ্নি তাঁকে বললেন—সোমরাজ তোমাকে যে ধনু, কপিধ্বজ রথ এবং দুটি অক্ষয় তুণীর দিয়েছিলেন, সেগুলো অর্জুনকে দাও। ওগুলো দিয়ে তিনি একটি মহৎকর্ম সম্পাদন করবেন।

"বরুণ তখন অর্জুনকে সর্বায়ুধ-সারভূত দিব্য শরাসন তথা গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণীরদ্বয় এবং দুটি বায়ুবেগগামী রমণীয় রথ দান করলেন। তারপরে বরুণদেব কৃষ্ণকে দৈত্যান্তকারিণী কৌমোদকী গদা প্রদান করলেন। এই গদার শব্দ বজ্রের মতো ভয়ংকর।

"আর অগ্নি শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শন-চক্র উপহার দিয়ে বললেন—হে মধুসূদন, তুমি এই চক্র দিয়ে দেবদানবদের অনায়াসে পরাজিত করতে পারবে। যতবার তুমি শত্রুর প্রতি এই চক্র নিক্ষেপ করবে, ততবারই শত্রুকে নিহত করে চক্র আবার ফিরে আসবে তোমার কাছে।

"সন্তুষ্ট কৃষ্ণার্জুন তখন অগ্নিদেবকে নিঃশঙ্কচিত্তে খাণ্ডববন দগ্ধ করতে বললেন। তাঁরা সেই বায়ুবেগগামী রথ দুটিতে করে বনের চারিপাশে পাহারা দিতে থাকলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হলেন। বনের জীবজন্তু প্রাণভয়ে বাইরে বেরুতে চাইল, কিন্তু পারল না। পার্থ সুতীক্ষ্ণ শর দিয়ে তাদের খণ্ড খণ্ড করে আবার আগুনে নিক্ষেপ করলেন। জীবজন্তুর আর্ত চীৎকারকে সমুদ্রের গম্ভীর গর্জন বলে মনে হতে থাকল। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা ধীরে ধীরে আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলল। দেবতারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তাঁরা ছুটে গেলেন দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে।

"সব শুনে ইন্দ্র তাড়াতাড়ি খাণ্ডববন রক্ষা করতে এলেন। তিনি বারিবর্ষণ শুরু করে দিলেন। কিন্তু অর্জুন শরবর্ষণ করে বারিপাতন বন্ধ করে দিলেন।

"ইন্দ্রের সখা তক্ষক তখন খাণ্ডববনে ছিলেন না, কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও পুত্র অশ্বসেন সেখানেই ছিলেন। বাতবর্ষণ

করে অর্জুনকে অজ্ঞান করে ফেলে ইন্দ্র অর্ধদগ্ধ অশ্বসেনকে রক্ষা করতে পারলেন, কিন্তু তক্ষকের স্ত্রী মারা গেলেন।

"ক্রুদ্ধ ইন্দ্র তখন কৃষ্ণার্জুনকে আক্রমণ করলেন। দেবতারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন। যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, গন্ধর্ব এবং অসুরগণও কৃষ্ণার্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁরা বাসুদেব ও সব্যসাচীকে পরাজিত করতে পারলেন না।

"এই সময় সহসা এক দৈববাণী হল—দেবরাজ, তোমার সখা ভুজঙ্গেশ্বর বেঁচে আছেন। বৃথা যুদ্ধে শক্তিক্ষয় ক'র না। কারণ কৃষ্ণার্জুনকে তুমি কখনই পরাজিত করতে পারবে না। ওঁরা যে নর-নারায়ণ।

"অগত্যা দেবরাজ স্বর্গে ফিরে গেলেন। অগ্নিদেব পনেরো দিন ধরে নির্বিঘ্নে খাণ্ডববন দগ্ধ করতে থাকলেন।

"কেবল অস্ত্রলাভ নয়, খাণ্ডবদাহনে অগ্নিকে সাহায্য করার পেছনে পার্থসারথির আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। দানব-স্থপতি ময় মহেন্দ্রের ভয়ে তাঁরই বন্ধু নাগরাজ তক্ষকের অরণ্যাবাসে আত্মগোপন করে ছিলেন। কারণ তিনি জানতেন ইন্দ্র কখনই তাঁর বন্ধুর বাড়িতে শত্রুকে খুঁজবেন না। পাণ্ডবদের জন্য ময়দানবকে শ্রীকৃষ্ণের একান্তই প্রয়োজন ছিল।

"ময় যখন বুঝতে পারলেন, খাণ্ডববন সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হবে, তখন তিনি বাধ্য হয়ে বন থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি অর্জুনের সামনে এসে প্রাণভিক্ষা চাইলেন। বললেন—আমি দানব-স্থপতি, দানবদের বিশ্বকর্মা ময়। আমি তোমার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইছি। প্রতিজ্ঞা করছি, বেঁচে থাকলে তোমার এ ঋণ আমি নিশ্চয়ই শোধ করব।

"অর্জুন ময়দানবের প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। এদিকে তখন অগ্নি-দেবের খাণ্ডবদাহন প্রায় শেষ। অশ্বসেন, চারটি শার্ঙ্গক পাখী ও ময়দানব ছাড়া আর কোন প্রাণী সেখানে জীবিত নেই দেখে শ্রান্ত কৃষ্ণার্জুন অস্ত্রত্যাগ করলেন। তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন।

"কিছুদিন বাদে ময় এসে হাজির হলেন কৃষ্ণার্জুনের সামনে। তিনি করজোড়ে অর্জুনকে বললেন—আপনি হুতাশনের হাত থেকে আমাকে পরিত্রাণ করেছেন। অতএব আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি প্রত্যুপকার করতে পারি?

"অর্জুন বললেন—হে কৃতজ্ঞ! তুমি মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ বলেই আমার উপকার করতে চাইছ। কাজেই তোমাকে দিয়ে আমি কোন কাজ করাতে চাই না। তুমি বরং কৃষ্ণের কোন কাজ করে দাও।

"ময় তখন কৃষ্ণের আদেশ জানতে চাইলেন। কৃষ্ণ বললেন—হে শিল্পকর্মবিশারদ! তুমি যদি একান্তই আমার কোন প্রিয়কার্য করতে চাও, তাহলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য এমন একটি সভাগৃহ নির্মাণ করে দাও যে, কেউ যেন বার বার দেখেও তেমনটি আর তৈরি করতে না পারে। এমন সভাগৃহ নির্মাণ কর, যেখানে দেবতা মানুষ এবং অসুরদের সকল অভিপ্রায় স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়।

"কৃষ্ণের আদেশে সন্তুষ্ট হয়ে কৃতজ্ঞ ময় তাঁর কাজ শুরু করে দিলেন। এদিকে কৃষ্ণ তাঁর কাজ শেষ হয়েছে বলে দ্বারকায় ফিরে যেতে মনস্থ করলেন। পিসীমা কুন্তী ও দাদা যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে সুভদ্রা ও দ্রৌপদীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তিনি স্নান করে অলঙ্কার পরে মালা ও গন্ধদ্রব্য দিয়ে দেবদ্বিজগণের পূজা শেষ করলেন। ব্রাহ্মণগণ দৈ ফল ও ফুল প্রভৃতি মাঙ্গল্যবস্তু হাতে নিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়েছিলেন। ধনদান করে বাসুদেব তাঁদের প্রদক্ষিণ করলেন। তারপরে তিনি বায়ুবেগগামী কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করলেন।

"চার ভাইকে নিয়ে যুধিষ্ঠির সেখানেই ছিলেন। সহসা তিনি ছুটে এসে কৃষ্ণের রথে উঠলেন। সারথি দারুককে তাঁর জায়গা থেকে সরে যেতে বলে নিজে লাগাম হাতে নিলেন। অর্জুনও তাড়াতাড়ি রথে উঠে কৃষ্ণের পাশে বসে পড়লেন। যুধিষ্ঠির লাগামে টান দিলেন।

রথ এগিয়ে চলল। ভীম নকুল সহদেব এবং উপস্থিত ঋত্বিক ও পুরোহিতগণ কৃষ্ণের অনুগমন করতে থাকলেন।

"এইভাবে প্রায় অর্ধযোজন পথ অতিক্রম করবার পরে শত্রুনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—আর নয়, এবারে আপনি ফিরে যান। তিনি যুধিষ্ঠিরের পা জড়িয়ে ধরলেন।

"পতিতপাবন কমললোচন কৃষ্ণকে যুধিষ্ঠির বুকে টেনে নিলেন। তিনি কৃষ্ণের মাথার ঘ্রাণ গ্রহণ করে তাঁকে দ্বারকা রওনা হবার অনুমতি দান করলেন। ভীম ও অর্জুন তখন কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে বিদায় জানালেন। নকুল সহদেব এবং ছোটরা সবাই প্রণাম করলেন তাঁকে। তাঁরা রইলেন দাঁড়িয়ে, আর বাসুদেবের রথ চলল এগিয়ে। পাণ্ডবরা পলকহীন নয়নে তাকিয়ে রইলেন সেই রথের দিকে, ঠিক বৃন্দাবন থেকে বিদায় নেবার সময় বিরহ-ব্যাকুলা গোপিনীরা যেমন অপলকনয়নে রাসবিহারীর রথের দিকে তাকিয়েছিলেন।"

থামলেন সরকারদা। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন কল্পনাদি, "এ কি! থামলেন কেন?"

মৃদু হেসে সরকারদা বলেন, "দানব-স্থপতি ময় আগে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভা নির্মাণ করে দিন!'

"হয়ে গেছে।" উমাদি বলে ওঠেন।

সরকারদা সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেন, "কি?"

"ইন্দ্রপ্রস্থ। ময়দানব বহুকাল আগেই সে সভাগৃহ নির্মাণ করে ফেলেছেন। তাছাড়া আমরা তো ইন্দ্রপ্রস্থের কথা জানতে চাইছি না, আমরা কৃষ্ণ-কথা শুনতে চাইছি।"

অতএব সরকারদাকে শুরু করতে হয়, "ঝড়ের বেগে বাসুদেবের রথ দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, কৃষ্ণ-বিরহে বিচলিত পাণ্ডবরা কৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে করতে ঘরে ফিরে চললেন। তাঁরাও বিরহিনী গোপিনীদের মতই এই আশায় বুক বাঁধলেন যে, বাসুদেব তো আবার ফিরে আসবেন।

"মহাবীর সাত্বত এবং সারথি দারুককে সঙ্গে করে দ্বারকানাথ দ্বারকায় ফিরে এলেন। তিনি মাতামহ উগ্রসেন, পিতা বাসুদেব এবং মাতা দেবকীকে প্রণাম করলেন। আহুক ও বলরামকে অভিবাদন জানালেন। প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, গদ, অনিরুদ্ধ ও ভানু প্রভৃতিকে সস্নেহ আলিঙ্গন দান করলেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করলেন প্রিয়তমা রুক্মিণীর অন্দর-মহলে।"

তিন

বৈকালী চা এসে গিয়েছে। অতএব সভা ভঙ্গ হয়। আমরা চায়ের কাপ হাতে নিই। কিন্তু উমাদি উঠে দাঁড়ান। মতি জিজ্ঞেস করে, "চা খাবেন না দিদি ?"

পাঁচু কৃত্রিম ধমক লাগায়, "গোপালদি কি নিজের জায়গায় বসে ছাড়া কখনও কিছু খান ? উনি জায়গায় যাচ্ছেন. তুই চা নিয়ে সঙ্গে যা।"

মতি মৃদু হেসে উমাদিকে অনুসরণ করে। দাদা প্রশ্ন করেন, "ও নিজেব জায়গায় বসে ছাড়া খায় না কেন ম্যানেজাব ?"

"তাঁর কি একা খেলে চলে ? না, মায়েরা কখনও গোপালদের আগে কিছু খেতে পাবেন ?"

"তা গোপাল কি চা-ও খান নাকি ?" এবারে অমিয়বাবু জিজ্ঞেস করেন।

অমিয়বাবু মজার মানুষ। ভদ্রলোক অকৃতদার, বয়স পাঁচের কোঠায়। কালীঘাটে একখানি পৈতৃক বাড়ি আছে, তারই ভাড়ায় জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিচ্ছেন। গায়ের রঙ কালো, ছিপছিপে গড়ন। নিজে কানে খাটো বলে সর্বদা সবার সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলেন এবং কেউ তাঁর সঙ্গে আস্তে কথা বললে ভীষণ ক্ষেপে যান।

ম্যানেজার উত্তব দেয়, "হ্যাঁ। গোপাল চানাচুর আচার মসালা-দোসা সবই খায়। সে এতক্ষণ শুয়েছিল। এবারে গোপালদি তাকে ঘুম থেকে তুলবেন, মুখ ধুইয়ে বিছানায় বসিয়ে দেবেন। তার সামনে কিছুক্ষণ চায়ের কাপটি রেখে তারপরে নিজে খেয়ে নেবেন।"

"কার বিছানায় বসাবেন, নিজের, না গোপালের ?"

"আপনি গোপালের বিছানা দেখেছেন ?" ম্যানেজার অমিয়-বাবুকে পাল্টা প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ। একটি চৌকো পেতলের বাক্স, আগে বোধহয় গয়নার বাক্স ছিল। তারই ভেতরে গোপালের বিছানা। তোষক বালিশ তাকিয়া চাদর—সবই আছে। উমাদি তো বাক্সটাকে সর্বদাই সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন।"

"গোপালদি এখন সেই পেতলের বাক্সটির ডালা খুলে গোপালকে তার ভেতরে বসিয়ে রাখবেন। তারপরে বাক্সটিকে তার সিটের ওপরে রেখে দেবেন।"

সত্যেনদা শান্তিপ্রিয় গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তাঁর বোধহয় আলোচনাটা ভাল লাগে না। তিনি উঠে দাঁড়ান। বলে, "ঘোষ, বেরুবে নাকি?"

"হ্যাঁ দাদা। জামা-কাপড়টা ইস্ত্রি করাতে যেতে হবে।"

"তাহলে চলো!"

আমি উঠে দাঁড়াই। মা জিজ্ঞেস করেন, "কোথায় যাচ্ছ বাবা?"

"একবার বাজার থেকে ঘুরে আসছি।" উত্তর দিই।

সত্যেনদার মাকে আমি মা বলেই ডাকি। তিনিও আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। আদর্শ মা। আমার অন্যান্য সহযাত্রিনীদের মতো তিনি যথেচ্ছ কেনাকাটা করে বোঝা বাড়ান নি। কিন্তু পুজো দিয়েছেন প্রায় প্রত্যেক মন্দিরে।

অকালে পুত্রের বিয়োগব্যথায় ব্যথিত সত্যেনদার প্রতি মা-র সর্বদা সজাগদৃষ্টি। তাই আমি সঙ্গে যাচ্ছি শুনে তিনি বোধহয় নিশ্চিন্ত হলেন। বলেন, "যাও বাবা, ঘুরে এস। রাত ক'র না যেন।"

"ভয় নেই মা।" সত্যেনদা মৃদু হেসে বলেন, "আপনার নাবালক ছেলে দুটি অন্ধকারেও পথ চিনে ঠিক আপনার কাছে ফিরে আসবে।"

সত্যেনদা মাকে 'আপনি' বলেন।

সাহাবাবু জিজ্ঞেস করেন, "ঘোষদা, বাজারে যাচ্ছেন নাকি?"

"হ্যাঁ।" উত্তর দিই।

"আমার একটা ফরমাশ আছে!"

"বলুন।"

"কয়েকটা কলা আম ও গোটাদুয়েক আপেল নিয়ে আসবেন।"

"মাসিমার জন্য?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

মাসিমা পথের রান্না খাবার খান না। আজ বারোদিন হল আমরা কলকাতা থেকে রওনা হয়েছি, এর ভেতর তিনি একদিনও ভাত রুটি কিংবা লুচি খান নি—খাবেনও না। সঙ্গে করে চিঁড়ে-মুড়ি নিয়ে এসেছেন, তাই খাচ্ছেন এবং ঐ খেয়েই তীর্থদর্শন শেষ করে কলকাতায় ফিরবেন। তবে বলেছেন, দ্বারকায় গিয়ে দ্বারকানাথকে ভোগ দিয়ে একবেলা অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করবেন।

সাহাবাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে সত্যেনদার সঙ্গে নেমে আসি গাড়ি থেকে। সাহাবাবুর কথাই ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলি। পুরো নাম গোরাচাঁদ সাহা। বয়স বছর আটচল্লিশ। দেখে কিন্তু মনে হয় অনেক কম। বেশ সুন্দর চেহারা। সব সময় ফিটফাট থাকেন। কলকাতার একটি বিদেশী ব্যাঙ্কে ভাল চাকরি করেন। খুবই শান্ত এবং ভদ্র মানুষটি। স্ত্রী সেজদিও স্বামীর মতই সরলস্বভাবা। কেনাকাটা করতে খুব ভালোবাসেন। ভদ্রমহিলা সন্তানহীনা। আর তাই বোধহয় দেবরের মেয়ে বিউটিকে তিনি ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছেন। বিউটি সেজদিকে 'মা' ডাকে, আর সাহাবাবুকে ডাকে 'ছেলে'। সাহাবাবুও যে তাকে 'মা' বলেই সম্বোধন করেন।

ছোট হলেও মেহসানা বাজারটি বেশ সুন্দর। প্রয়োজনীয় সব কিছুই পাওয়া যায়। দোকানদাররাও ভারী ভদ্র।

দাড়ি কেটে ও কেনাকাটা সেরে ফিরে চলেছি স্টেশনে। আরে! দাসবাবুও সস্ত্রীক বাজারে এসেছিলেন দেখছি। কিছু কেনাকাটাও করেছেন। কি ব্যাপার! পরশুদিন মাউন্ট-আবুতে ভদ্রলোক বলেছিলেন—টাকা-পয়সা ফুরিয়ে গিয়েছে।

দাস-দম্পতিকে ধরবার জন্য পা চালাই। সত্যেনদা অবশ্যি আমার এ সদিচ্ছার সরিক হন না। তিনি তেমনি আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকেন। আমি এগিয়ে আসি।

দাসবাবুর বয়স বছর ষাটেক। ছোটখাটো রোগা কালো মানুষটি। পাকা চুল, নকল দাঁত। অনেকটা সেকালের জমিদারী সেরেস্তার তহশীলদারী চেহারা। লেখাপড়া জানেন বলে মনে হয় না। চিৎপুরে একটা মিষ্টির দোকানের মালিক ছিলেন। বেশ ভালো দোকান—দশ-বারোজন কর্মচারী কাজ করত। দোকানটি নাকি এখনও আছে, তবে তার মালিকানা পালটে গিয়েছে। অপুত্রক দাসবাবু ভাইপোদের মানুষ করেছিলেন, তারা জেঠামশায়ের দোকান দখল করে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করেছে। দাসবাবু এখন সস্ত্রীক জামাইয়ের আশ্রিত। তবে জামাইটি নাকি বড়ই ভাল। একটি কারখানায় ভাল চাকরি করে। দাসবাবুকে সোচ্চার স্বরে 'বাবা' বলে ডাকে।

জামাইয়ের জন্যই নিঃসম্বল দাসবাবু দ্বারকা-দর্শনে বেরুতে পেরেছেন। তবে কুণ্ডু স্পেশালকে পুরো টাকা দিতে পারেন নি বলে স্বামী-স্ত্রী দুজনে একখানি বার্থ পেয়েছেন। রাতে অবশ্য ম্যানেজার প্যাসেজে একটা বেঞ্চি পেতে দেয়। এবং মিসেস সেখানেই ঘুমান।

মিসেসের চেহারাটি দাসবাবুর ঠিক বিপরীত। তাঁকে দেখলে জমিদার-গিন্নী বলে মনে হয়। স্বভাবটাও অনেকটা সেই রকম। দাসবাবুর মতো সারাদিন বক্‌বক্ করেন না।

কুণ্ডু স্পেশালকে পুরো টাকা না দিতে পারলেও, দাসবাবু প্রায় প্রত্যেক জায়গায় নাতনীর জন্য কিছু না কিছু কিনেছেন। কেবল মাউন্ট-আবুতে কিছু কিনতে পারেন নি। বলেছিলেন, টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে। "তাহলে আজ আবার তিনি এ-সব কেনাকাটা করলেন কেমন করে?

কাছে এসে বলি, "আজ কি কিনলেন নাতনীর জন্য?"

"আর বলেন কেন ?" দাসবাবু জবাব দেন, "কয়েকটা কাঠের পুতুল।"

"টাকা পেলেন কোথায় ?" অভদ্রতা জেনেও প্রশ্নটা না করে পারি না।

দাসবাবু কিন্তু কিছুই মনে করলেন না। বেশ উৎসাহের সঙ্গে উত্তর দিলেন, "আরে তাই তো! কথাটা যে বলাই হয় নি আপনাকে।"

"কি কথা ?"

"টাকা এসে গিয়েছে।"

"এসে গিয়েছে !"

"হ্যাঁ। আজই ম্যানেজারবাবু অফিস থেকে চিঠি পেয়েছেন, আমার জামাই তাঁদের কলকাতার অফিসে আমার নামে আরও দুশো টাকা জমা দিয়েছে। বলি নি আপনাকে—জামাই নয়, গত জন্মে বাবাজী আমার ছেলে ছিল।"

ফিরে আসি গাড়িতে। দাদা শুয়ে আছেন কেন ? দিদি উমাদি ও বিউটি তাঁর পাশে বসে। উমাদি হাওয়া করছেন, বিউটি মাথার চুলে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে। দিদি বলছেন, "হরলিক্সটা খেয়ে নিন, একটু সুস্থ বোধ করবেন।"

"শরীর ভাল নেই নাকি ?" জিজ্ঞেস করি।

"না ভাই। শরীরের কিছুই হয় নি, মনটা ভাল নেই বলেই হয়তো শরীরটা একটু দুর্বল লাগছে।"

"তাহলে হরলিক্সটা ঠাণ্ডা করছেন কেন ? তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন না।" ধমক লাগাই আমি।

দাদা দ্বিরুক্তি না করে উঠে বসেন। সুবোধ বালকের মতো এক-চুমুকে হরলিক্সটুকু নিঃশেষ করে আবার শুয়ে পড়েন।

বিউটি সোচ্চার স্বরে বলে ওঠে, "কেমন জব্দ দাদু! আমি তো তখুনি বলেছিলাম, মামু আসার আগে খেয়ে নিন।"

দাদা শব্দহীন। সুতরাং বিউটিকেও নীরব হতে হয়। সে নীরবে দাদুর চুলের ভেতরে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে। আমি তার পাশে বসে জিজ্ঞেস করি, "মন খারাপ হবার কারণ কি? চিঠি এসেছে নাকি?"

"হ্যাঁ।" দাদা ক্ষীণ স্বরে উত্তর দেন।

"কে লিখেছেন?"

"ছোটবৌমা। সে আমার ওপর রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে।"

"কারণ?"

"আমি তার কথা শুনি নি। বলেছিল—আপনার শরীর খারাপ, এবার না হয় না-ই বা গেলেন।"

হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। হাসতে হাসতে বলি, "না, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। আমি ভাবলাম না জানি কি দুঃসংবাদ এসেছে!"

"দুঃসংবাদ ছাড়া আর কি?" দাদা প্রতিবাদ করেন, "তোমরা আমার সেই অসহায় ছেলেটাকে দেখ নি, ছোটবৌমা চলে গেলে কে তার দেখা-শোনা করবে? হয়তো দিনের পর দিন সে না-খেয়ে থাকবে।"

কথাটা মনে পড়ে আমার। একটি ছাড়া দাদার সব ছেলেরাই কৃতী। তিনজন য়ুরোপে লেখা-পড়া করেছে। দুজন এখনও য়ুরোপে আছে। মেয়েদেরও সবারই খুব ভাল বিয়ে হয়েছে। কিন্তু দাদার একটি ছেলে জন্ম থেকেই একটু অস্বাভাবিক—মানে তার মস্তিষ্কটা ঠিক পরিণত নয়। বহু চিকিৎসা করিয়েও কোন ফল হয় নি। বৌদি মারা যাবার পর থেকে সেই ছেলেটি দাদার গলগ্রহ। তাকে ঝি-চাকরদের হাতে ছেড়ে কোথাও যাওয়া মুশকিল। তবু ছোটবৌমা বাড়ি থাকলে খানিকটা নিশ্চিন্ত। সে-ও বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে।

সুতরাং দাদাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করা বৃথা। আমি পাশের খোপে আসি। সরকারদা দেখছি ইতিমধ্যে বেশ জমিয়ে নিয়েছেন। আমিও বসে পড়ি। সরকারদা বলে চলেছেন—

"ময় কৃষ্ণের আদেশমত পাণ্ডবদের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে এক মনঃপ্রহ্লাদিনী যশস্বিনী অতি বিচিত্রা ও সর্বরত্নভূষিতা সভাস্থলী নির্মাণ করে দিলেন। তিনি ভীমসেনকে দানবরাজ বৃষপর্বার সুবর্ণমণ্ডিত শত্রুনাশিনী গদা এবং ধনঞ্জয়কে দেবদত্ত মহাশঙ্খ উপহার দিলেন। বিশ্বকর্মা-নির্মিত যাদবসভা দেবসভা ও ব্রহ্মাসভার চেয়েও পাণ্ডব রাজসভা সুন্দর হল। শুভদিনে পাণ্ডবরা সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। মহর্ষি নাবদ নিজে এসে সেই সভাগৃহের প্রশংসা করলেন। তিনি পাণ্ডবদের রাজনীতি সম্পর্কে নানা উপদেশ দিলেন। তাঁদের কাছে ইন্দ্রসভা যমসভা বরুণসভা কুবেরসভা ও ব্রহ্মাসভার সৌন্দর্য বর্ণনা কবলেন। তারপবে রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞের যশঃকীর্তন করে জানালেন যে, স্বর্গবাসী মহারাজা পাণ্ডুর ইচ্ছা, তাঁর পুত্ররা রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন করেন।

"নারদ চলে যাবার পরে চার ভাই এবং মন্ত্রীরা সবাই যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির অপ্রমেয় মহাবাহু সর্বলোকোত্তম কৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন না। কারণ তিনি জানতেন বাসুদেব সর্বজ্ঞ ও সর্বকৃৎ। একমাত্র তিনিই তাঁকে সৎপরামর্শ দিতে পারেন। কাজেই তিনি জনৈক দূতকে দ্রুতগামী রথে দ্বারকায় পাঠালেন। ভগবান চক্রপাণি দূতের কাছে যুধিষ্ঠিরের আহ্বান পেয়ে ইন্দ্রসেনকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে রওনা হলেন।

"কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে এলে যুধিষ্ঠির তাঁকে জানালেন—আমার ইচ্ছা রাজসূয় যজ্ঞ করি, তুমি আমাকে পরামর্শ দাও। তুমি তো জান সংসারে সৎপরামর্শ পাওয়া খুবই কঠিন। কেউ বন্ধুত্বের জন্য দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করে না, কেউ স্বার্থপরতার জন্য প্রিয়বাক্য বলে, কেউ

বা নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির কথা মনে রেখে উপদেশ দেয়। কিন্তু কৃষ্ণ, তুমি তো সকল দোষ-রহিত এবং কাম-ক্রোধ বিবর্জিত, তুমি আমাকে যথার্থ পরামর্শ দান কর।

"কৃষ্ণ বললেন—মহারাজ আপনি সর্বগুণে গুণবান, অতএব আপনার পক্ষে রাজসূয় যজ্ঞ করা অবিধেয় নয়। আপনি সর্বজ্ঞ, তবু আপনাকে বলছি, আপনি জানেন যে সত্যযুগে জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করেছিলেন। তারপরে যাঁরা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মেছেন, তাঁরা কেউ ক্ষত্রিয় নন, ক্ষত্রিয়ের মতো আচার-ব্যবহার করে থাকেন মাত্র।

"—এখন মহাপতি জরাসন্ধ বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজিত করে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করেছেন। প্রতাপশালী শিশুপাল জরাসন্ধেব সেনাপতি হয়েছেন। সুতরাং নিয়মানুসারে তিনিই ভারত-সম্রাট, একমাত্র তাঁরই রাজসূয় যজ্ঞ করবার অধিকার আছে। জরাসন্ধ জীবিত থাকলে আপনার পক্ষে রাজসূয় যজ্ঞ করা সম্ভব নয়।

"—মহারাজ, আপনি জানেন যে দানবরাজ কংস যাদবদের পরাজিত করে সহদেবা ও অনুজা নামে বার্হদ্রথের দুই মেয়েকে বিয়ে করেছিল। সেই দুরাত্মা বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজিত করে সর্বপ্রধান হয়ে উঠল। তখন ভোজবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ আমাকে কংস-বধের অনুরোধ করে। আমি প্রথমে আহুককন্যা দান করে অক্রুরকে বশীভূত করি। তারপরে বলভদ্রের সাহায্যে কংস ও সুনামাকে সংহার করি।

"—কংস-ভয় নিবারিত হল বটে কিন্তু তারপরেই জরাসন্ধ প্রবল-পরাক্রান্ত হয়ে উঠলেন। আমরা জানতাম যে, তাঁর শুধু অসংখ্য সৈন্য নয়, হংস ও ডিম্বক মানে দুজন দেবতুল্য অনুচর আছে। তারা তিনজনে অনায়াসে ত্রিভুবন জয় করতে পারে।

"—এদিকে হংস নামে আরেকজন নরপতি ছিল। বলদেব

তাকে সংগ্রামে সংহার করেন। ডিম্বক সেই সংবাদ শুনে ভাবল তার সহচর হংস মারা গিয়েছে। হংস ছাড়া জীবন-ধারণ বৃথা বিবেচনা করে ডিম্বক যমুনায় প্রাণ বিসর্জন দিল। আর তার মিথ্যে মৃত্যু-সংবাদ শুনে ডিম্বক মারা গিয়েছে জেনে হংসও যমুনার জলে আত্মসমর্পণ করল। প্রিয় সহচরদের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে ব্যথিত জরাসন্ধ জয়যাত্রা বন্ধ করে মগধে ফিরে গেলেন।

"—মহারাজ, আপনি জানেন কংস জরাসন্ধের জামাই। কিছুকাল পরে একদিন তাঁর মেয়েরা আবার এসে তাঁকে কংস-হত্যার কথা স্মবণ করিয়ে দিয়ে বলল—তুমি আমাদের পতিহন্তাকে সংহার কব।

"— জবাসন্ধ আবার মথুরা আক্রমণ করলেন। আমরা আমাদের বিপুল ধনসম্পত্তি ভাগ করে প্রত্যেকে কিছু কিছু নিয়ে ব্রজমণ্ডল ছেড়ে পশ্চিমে পলায়ন করলাম। এখন আমরা পশ্চিম-দেশে বৈবতকেব কাছে কুশস্থলীতে বাস করছি। অর্থাৎ আমরা জবাসন্ধের ভয়ে পর্বতে আশ্রয় নিয়েছি। ঐ পর্বত দৈর্ঘ্যে তিন যোজন ও প্রস্থে এক যোজনের কিছু বেশি। পর্বতে একুশটি শৃঙ্গ আছে। আমরা কুশস্থলীর দুর্গসংস্কার করে নিয়েছি। সেখানে শত শত দ্বার তৈরি করেছি বলে এখন সে দুর্গ-নগরীর নাম দ্বারাবতী। আপনি জানেন যে জরাসন্ধের ভয়ে যদুবংশীয় সকলেই এখন সেখানে ঐক্যবদ্ধ এবং আমরা আঠারো হাজার জ্ঞাতিভাই দ্বারাবতী রক্ষার জন্য সর্বদা সজাগ রয়েছি।

"—হে ভারতসত্তম! আপনি সম্রাটতুল্য গুণশালী, আপনারই ভারত-সম্রাট হওয়া উচিত। কিন্তু জরাসন্ধ জীবিত থাকতে আপনার পক্ষে রাজসূয় যজ্ঞ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনি যদি সত্যই রাজসূয় করতে চান, তাহলে আগে জরাসন্ধকে বধ করে বন্দী বাজাদের মুক্ত করুন।"

থামলেন সরকারদা। কিন্তু আমরা কেউ কিছু বলে ওঠার

আগেই পাশের খোপ থেকে দাদা বলে উঠলেন, "একি! থামলে কেন? জরাসন্ধ-বধের কথা বলো।"

বুঝতে পারছি, তীর্থদর্শনে বেরিয়ে যে স্নেহপ্রবণ পিতা মুহূর্তের জন্য তাঁর অনুপযুক্ত অসহায় পুত্রটির কথা ভুলতে পারছেন না, মহাভারতের কাহিনী তাঁরও সব আশঙ্কা এবং বেদনার বিস্মৃতি ঘটিয়েছে। অথচ দাদার কাছে এ কাহিনী নতুন নয়। তিনি নিজেই পরবর্তী ঘটনাটির উল্লেখ করলেন। দাদা জীবনে বহুবার জরাসন্ধ-বধ কাহিনী পড়েছেন ও শুনেছেন। তবু আজ তিনি আবার তা শুনতে চাইছেন, কারণ মহাভারত কখনও পুবনো হয় না। অথচ মহাভারতে যে সমাজ ও জীবনের কথা বলা হয়েছে, তা অন্তত তিন হাজার বছবের পুরনো।

এর কারণ—ভারত-জীবনের প্রায় সবদিক মহাভারতে প্রতিফলিত এবং সেই অতীত ভারত আজও সম্পূর্ণ অতীত নয়। কয়েক বছর আগেও আমরা গাড়োয়ালের তমসা-উপত্যকায় মহাভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থাকে বেঁচে থাকতে দেখে এসেছি। দেখেছি, দুর্যোধন ও কর্ণ সেখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ লৌকিক-দেবতা। আজও সেখানে সব ভাই মিলে একটি মেয়েকে বিবাহ করে।*

মহাভারত শুধু প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস নয়, মহাভারত ভারতীয় জীবন সংস্কৃতি ও ধর্মের ধারক। আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, 'The *Mahabharata* is not merely a "song of Victory", it is a *Purana-Samhita*, a collection of old legends, and an *Itivritta* or traditional account of high-souled kings and pious sages, of dutiful wives and beautiful maids.'** মহাভারতের প্রতি আকর্ষণ

* লেখকের 'তমসার তীরে' বইখানি দ্রষ্টব্য।

** 'Advanced History of India'

আমাদের সহজাত। তাই দাদা ব্যক্তিগত বেদনা বিস্মৃত হয়ে মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে তলিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু মহাভারতের ভাবনা থাক্। সরকারদা ইতিমধ্যে আবার কৃষ্ণ-কথা শুরু করেছেন, তাই শোনা যাক্। সরকারদা বলছেন, "বাসুদেবেব কথা শুনে যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন—হে ধীমান্! তোমার মতো সংশয়চ্ছেদক পৃথিবীতে আর নেই। তুমি আমাকে যেমন পরামর্শ দিলে, এমনটি আব কেউ দিতে পাববে না। কিন্তু আমি ভাবছি, বলবাম ভীম অর্জুন এবং তোমার মধ্যে কে জবাসন্ধকে বধ করবে?

"কৃষ্ণ কোন উত্তব দেবার আগেই ভীম বলে উঠলেন—কৃষ্ণে নীতি, আমাতে বল এবং অর্জুনে জয়। অতএব আমরা তিনজনে একত্র হয়েই জরাসন্ধকে বধ করব।

"যুধিষ্ঠিব তখন কৃষ্ণকে বললেন—তুমি তো জান, ভীম ও অর্জুন আমার দু-চোখের মণি এবং তুমি আমার মন। তোমরা তিনজনে চলে গেলে, আমি বাঁচব কেমন করে?

"কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করলেন—মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যে শত্রু বহু সৈন্যের অধীশ্বব এবং বলবান, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ কবাব পক্ষপাতী নই। আমরা গোপনে শত্রুগৃহে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করব। মেজদা ঠিকই বলেছেন, আমি নীতিজ্ঞ, সে বলবান এবং অর্জুন আমাদেব রক্ষয়িতা। তিন অগ্নি একত্র হয়ে যেমন যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, আমরাও তিনজন তেমনি একত্রে জরাসন্ধকে বধ করব।

"ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিব প্রফুল্লচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। বললেন—তুমি প্রজ্ঞা নীতি বল ক্রিয়া এবং উপায়-সম্পন্ন, অতএব অর্জুন ও ভীম যথাক্রমে তোমার অনুগমন করবে। তাহলেই বিক্রম নীতি জয় ও বল সিদ্ধ হবে।

"বাসুদেব ভীম ও অর্জুন তখন তেজস্বী ব্রাহ্মণগণের পরিচ্ছদ পরিধান করে মগধের পথে যাত্রা করলেন। তাঁরা কুরুদেশ ছাড়িয়ে

কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়ে কালকূট অতিক্রম করলেন। তারপরে গণ্ডকী, মহাশোণ, সদানীরা ও সরযূ পার হয়ে পূর্ব-কোশলা দেখতে পেলেন। সেখান থেকে মিথিলা হয়ে মালায় এসে চর্মন্বতী নদী পেরোলেন। অবশেষে গঙ্গা ও শোণ 'অতিক্রম করে মগধদেশে উপস্থিত হলেন।

"তাঁরা দুবতিক্রম্য গিরিব্রজ অতিক্রম করে জরাসন্ধের প্রাসাদ-দ্বারে পৌঁছলেন। সেখানে তিনটি ভেরী ছিল। তাতে একবার আঘাত করলে একমাস ধরে শব্দ হত। তাঁরা ভেবী তিনটিকে ভেঙে প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। রাজসভার মালাকারদের কাছ থেকে জোব করে মালা ছিনিয়ে নিয়ে গলায় পরলেন। তারপরে জরাসন্ধের সামনে উপস্থিত হলেন। স্নাতক ব্রাহ্মণ দেখে জরাসন্ধ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি তাদের কুশল প্রশ্ন করলেন।

"ভীমার্জ্জুন কোন উত্তর দিলেন না, তাঁরা মৌন রইলেন। ধীমান বাসুদেব তাঁদের দেখিয়ে বললেন—মহারাজ, এঁরা নিয়মস্থ, এখন কথা বলবেন না। বাত প্রথম প্রহর অতিবাহিত হলে এঁরা আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন।

"স্নাতক ব্রাহ্মণদের প্রতি জরাসন্ধের শ্রদ্ধা এবং দুর্বলতার কথা কৃষ্ণের অজানা ছিল না। তাই তাঁরা স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করেছিলেন। তিনি জানতেন জরাসন্ধ দুপুর রাতেও স্নাতক ব্রাহ্মণবেশী ভীমার্জুনের সঙ্গে আলাপ করতে সম্মত হবেন। আর তখুনি কার্যসিদ্ধি করতে হবে।

"জরাসন্ধ তাঁদের যজ্ঞাগারে বিশ্রাম করতে বলে শয়নকক্ষে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তিনি মাঝরাতে আবার যজ্ঞাগারে ফিরে এলেন। এবারে কিন্তু তাঁদের দেখে জরাসন্ধের খানিকটা সন্দেহ হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা কে? সোজা পথে না এসে গিরিব্রজ অতিক্রম করে এখানে এলেন কেন, আর কেনই বা তখন আমার পূজা গ্রহণ করলেন না?

"কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—আমরা শত্রুগৃহে এসে কখনও তার পূজা গ্রহণ করি না।

"—শত্রু! আমি আপনাদের শত্রু! কখন আমি শত্রুতা করলাম?

"—তুমি বলি দেবার জন্য ক্ষত্রিয়রাজাদের বন্দী করে রেখেছ। আমরা ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয়। তোমাকে বধ করবার জন্য আমরা এই ছদ্মবেশ ধারণ করেছি।

"—আপনারা কে?

"—আমি তোমার পুরনো শত্রু বাসুদেব আর এরা ভীম ও অর্জুন।

"বিস্মিত হলেও নির্ভীক বীর জরাসন্ধ বললেন—আমি এখুনি সৈন্যদের ডেকে তোমাদের হত্যা করাতে পারি। কিন্তু তোমরা আমার অতিথি, সুতরাং তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। বলো, কে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? ইচ্ছে করলে অবশ্য তিনজনেই একসঙ্গে যুদ্ধ করতে পার।

"হলধরানুজ মধুসূদন জানতেন ব্রহ্মার বরে জরাসন্ধ যাদবদের অবধ্য। তাই তিনি তাঁকে বললেন—তুমিই বলো মহারাজ, তুমি কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে?

"জরাসন্ধ তখন তাঁর সেনাপতি কৌশিক ও চিত্রসেনকে সেখানে ডেকে পাঠালেন। ভীমকে দেখিয়ে তাদের বললেন—আমি এই মহাবীর বৃকোদরের সঙ্গে বাহুযুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছি। যদি এই যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয়, তাহলে তোমরা আমার ছেলে সহদেবকে মগধের রাজপদে অভিষিক্ত ক'র।

"ব্যাস, ভীম ও জরাসন্ধের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। প্রথমে তাঁরা করমর্দন করে নিলেন। তারপরে একে অপরকে আঘাত ও প্রত্যাঘাত করতে শুরু করে দিলেন। কেউই কম নন। কাজেই দিনের পর দিন ধরে যুদ্ধ চলল। তেরো দিন তেরো রাত যুদ্ধ চলার পরে

জরাসন্ধ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি যুদ্ধ থামাতে চাইলেন। সুযোগ উপস্থিত বুঝতে পেরে ভীমকে সচেতন করবার জন্য কৃষ্ণ তাঁকে বললেন—ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নয়, কারণ সে মরে যেতে পারে!

"ভীম দ্বিগুণ উৎসাহে জরাসন্ধের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি প্রচণ্ড বেগে তার পেটে লাথি মারলেন। কিন্তু বর্ম পরে থাকায় জরাসন্ধের কিছুই হল না।

"কৃষ্ণ আবার বললেন—মেজদা, তোমার যে দৈববল ও বায়ুবল আছে, একবার তা মহারাজা জরাসন্ধকে দেখাও।

"ভীম তখন জরাসন্ধের দু-পা ধরে কিছুক্ষণ মাথার ওপরে ঘুরিয়ে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিলেন। তারপরে হাঁটুর চাপে তাঁর পৃষ্ঠদেশ ভঙ্গ করলেন। এবং অবশেষে ভীম জরাসন্ধের পা-দুটি ধরে তাঁকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেললেন।

"শ্রীকৃষ্ণের মনোবাসনা পূর্ণ হল। বুদ্ধিমান শত্রুনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দিয়ে তাঁব চিরশত্রু জবাসন্ধকে বিনষ্ট করলেন।

"ভীমার্জুনকে নিয়ে জরাসন্ধের রথে চড়ে কৃষ্ণ জরাসন্ধের কারাগারে এলেন। কংস-বধের পরে মথুরা কারাগারে যেমন বসুদেব ও দেবকীকে মুক্ত করেছিলেন, তেমনি কৃষ্ণ তাঁর বান্ধবদের কারামুক্ত করলেন।

"মৃত্যুপথযাত্রী ক্ষত্রিয়রাজারা জীবন ফিরে পেলেন। তাঁরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে কৃষ্ণকে বললেন—আমরা আপনার ভৃত্য। আদেশ করুন, আমাদের কি করতে হবে?

"—মহারাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করতে চাইছেন, আপনারা তাঁকে সাহায্য করুন।

"নৃপতিগণ সম্মত হলেন, আর তারপরেই জরাসন্ধের পুত্র সহদেব সেখানে এসে কৃষ্ণের কৃপাপ্রার্থনা করলেন। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অভয়দান করলেন। বললেন—তুমি নিশ্চিন্তে রাজত্ব কর।

রাজসূয় যজ্ঞের পরেই মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর ছোট ভাই সহদেবের সঙ্গে তোমার ছোট বোনের বিয়ে দিয়ে তোমার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করবেন। তারপরে কৃষ্ণ ভীমার্জুনকে নিয়ে রথে চড়ে ইন্দ্রপ্রস্থ রওনা হলেন।

"যুধিষ্ঠির নিজে তাঁদের বরণ করলেন। সেখান থেকে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করা সম্পর্কে আরও কিছু পরামর্শ দিলেন। তারপরে কৃষ্ণ একদিন কুন্তী দ্রৌপদী সুভদ্রা ও পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মরাজ প্রদত্ত মনস্তুল্যগামী দিব্য রথে দ্বারকার পথে রওনা হলেন।"

চার

সকালে ঘুম ভাঙল গাড়ির ঝাঁকানিতে। গাড়ি চলার ঝাঁকানি নয়। শান্টিংয়ের ঝাঁকানি। গাড়ি চলার ঝাঁকানির একটা ছন্দ আছে. যতি আছে, মিল আছে। একটা তাল আছে, লয় আছে, সুর আছে। তাই তাতে ঘুম ভাঙে না বরং ঘুম আসে। কিন্তু শান্টিংয়ের ঝাঁকানি অবিকল গলা-ধাক্কার মতো। তাতে তন্দ্রা টুটে যায়, অন্তরাত্মা পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে ওঠে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসি। টর্চ জ্বেলে ঘড়ি দেখি। আরে, এ যে দেখছি পাঁচটা বেজে গিয়েছে। তাহলে তো ট্রেন এসে গিয়েছে। সম্ভবত তার সঙ্গে জুড়ে দেবার জন্যই আমাদের গাড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ দ্বারকা যাত্রা আসন্ন। সুতরাং শান্টিং এঞ্জিনটার ওপর অভিমান করা উচিত হবে না।

জানালা খুলে দিই। এখনও বেশ অন্ধকার রয়েছে। থাকবেই তো। এ যে বাংলা নয়, গুজরাত—ভারতের পশ্চিমতম রাজ্য। এখানে ভোর হয় অনেক দেরিতে।

আমাদের গাড়ি প্লাটফর্মে নিয়ে এল, ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দিল। যাক্, বাঁচা গেল। বেশ কিছুক্ষণ আর শান্টিংয়ের ঝামেলা সইতে হবে না।

গাড়ির সবারই প্রায় ঘুম ভেঙে গেছে। সবারই এক প্রশ্ন—ট্রেন ছাড়ছে নাকি? উত্তর শুনে সবাই খুশি। গতকাল সকালে আবু-রোড থেকে যাত্রা করে মাত্র ঘণ্টা পাঁচেক পরেই যাত্রাবিরতি ঘটাতে হয়েছিল। তারপর থেকে ঠায় বসা। বসে বসে শুধুই আজকের এই শুভমুহূর্তটির প্রতীক্ষা। অচল গাড়িতে বসে থাকা বড়ই কষ্টকর। সেই কষ্টের অবসান আসন্ন।

থেমে পাল্টা প্রশ্ন করি, "তা, আপনি শঙ্কু মহারাজের কোন্ বইতে এটা পড়েছেন ?"

"কেন, তাঁর 'মধু-বৃন্দাবনে' বইতে।"

ঢোঁক গিলে কোনমতে জিজ্ঞেস করি, "কৃষ্ণলীলার কাল সম্পর্কে সে কি লিখেছে বলুন তো ?"

"অনেকাদন আগে পড়েছি, সবটা মনে নেই। তাহলেও যতটা মনে পড়ছে বলছি।" একবার থামেন উমাদি। বোধহয় মনে করবার চেষ্টা করেন। তারপরে বলেন, "শঙ্কু মহারাজ বলেছেন—দ্বাবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর নেমিনাথ এবং শ্রীকৃষ্ণ সমসাময়িক। অর্থাৎ কৃষ্ণলীলার কাল খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দী।"

"তাহলে মহাভারতে নেমিনাথ, এমনকি জৈনধর্মের কোন উল্লেখ নেই কেন ?" আমি শঙ্কু মহারাজের বিরোধিতা করি।

"কারণ মহাভারতকার অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু ছিলেন।" উমাদি শঙ্কু মহারাজের পক্ষ নিলেন।

"কিন্তু একটা কথা আছে—যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে।"

"ওটা কথার কথা।" উমাদি প্রশ্নটা পাশ কাটিয়ে যান।

"আর আমি যদি বলি যে জৈনধর্ম প্রসারলাভের আগে, এমন কি রামচন্দ্রের আগেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল !"

"কথাটাকে সত্য বলে মেনে নিতে পারব না। কারণ শঙ্কু মহারাজ বলেছেন—দ্বাবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর নেমিনাথ শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক এবং তিনি মথুরায় জন্মগ্রহণ ও মোক্ষলাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে মথুরায় জৈনধর্ম প্রসার লাভ করে অনেক পরে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে। আর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ রামচন্দ্রের আগে হতে পারে না, কারণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মের বহু আগে রাবণের ভাগনে লবণকে পরাজিত করে শত্রুঘ্ন মথুরা জয় করেছিলেন।"

"রামায়ণে না থাকলেও বৃহদারণ্যক উপনিষদে জনক রাজসভার একটি আলোচনায় পরীক্ষিতের উত্তরপুরুষ সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

তাই শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন, 'পারস্পরিক প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এই দুই মহাগ্রন্থের রচনাকাল তথা ঘটনাগত পৌর্বাপর্ব সম্পর্কে কিছু ধারণা করার উপায় আছে। রামায়ণে উল্লিখিত বিদেহপতি জনক ও কেকয়রাজ অশ্বপতি যে দুজন সমকালীন ঐতিহাসিক ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই।···রামায়ণ ও রামায়ণ বচয়িতাকে রাজা জনক ও অশ্বপতির পূর্বে স্থাপন করা যায় না। পক্ষান্তরে মহাভারতোক্ত পাণ্ডববংশীয় শেষ রাজা জনমেজয় যে রাজা জনকের বহু পূর্ববর্তী তাতেও সন্দেহ নেই। কারণ বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে জানা যায়, জনক রাজার কালেই পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমেজয় একজন সুপ্রাচীন নৃপতি বলে গণ্য হতেন। সুতরাং মহাভারত-বর্ণিত রাজন্যবর্গ ও ঘটনাবলী যে রামায়ণের রাজন্যবর্গের পূর্ববর্তী তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে জনমেজয়ের তক্ষশিলা বিজয়ের পূর্বেই যে কুরুপাণ্ডবকাহিনী সুপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল এমন মনে করাও বোধকরি অসঙ্গত নয়। কারণ মহাভারতে বলা হয়েছে তক্ষশিলা নগরীতেই মহাভারতাচার্য বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে কুরুপাণ্ডবকাহিনী শুনিয়েছিলেন। এই বৈশম্পায়নও একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি শাঙ্খ্যায়ণ এবং আশ্বলায়ণের গৃহ্যসূত্র রচনার সময়েও বৈশম্পায়ন মহাভারতাচার্য বলে পরিচিত ছিলেন। পাণিনির ব্যাকরণে শুধু যে বৈশম্পায়ন নামটিই পাওয়া যায় তা নয়, মহাভারত নামও পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে এই সব গ্রন্থে রামায়ণের উল্লেখমাত্রও নেই। এর থেকেও মহাভারতের অগ্রগামিতাই সূচিত হয়। ঐতিহাসিকদের মতে পাণিনি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের লোক। রামায়ণকে ঐ সময়ের পরবর্তী বলেই স্বীকার করতে হয়। মোট কথা, রামকাহিনীর উৎপত্তি যখনই হোক আদিকাব্য রামায়ণ যে মূল-মহাভারতের পরবর্তী তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।'*

*'রামায়ণ-সমস্যা'

"তাছাড়া সম্প্রতি অযোধ্যায় খননকার্যের যে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে সেখানকার সভ্যতা খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর চেয়ে পুরনো নয়। অথচ আপনি জানেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্র বইতে বলেছেন, খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৩০ অব্দে মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল।"

"আধুনিক পুরাতাত্ত্বিকরা সে মত সমর্থন করেন না।"

"কিন্তু তাঁরা বলেন মহাভারতের সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দী।" উমাদিকে শেষ করতে দিই না আমি।

উমাদি একটু হাসেন। তারপরে বলেন, "কিন্তু ঘোষদা, ডঃ বি. বি. লালের এই মত কিন্তু অনেক পুরাতাত্ত্বিক মানতে পারছেন না। যেমন ধরুন, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ডি. সি. পাণ্ডে বলেছেন—খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৯০০০ বছরের মধ্যে কোন সময়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল। তিনি বলেছেন, মহাভারতে যথেষ্ট ঐতিহাসিক বস্তু রয়েছে। কারণ য়ুয়ান চোয়াঙ পর্যন্ত লিখে গিয়েছেন—মহাভারতের যুদ্ধের পর থেকেই কুরুক্ষেত্রে বহু মানুষের কঙ্কাল চাপা পড়ে রয়েছে।"

"তার মানে আপনিও শঙ্কু মহারাজের মতই মনে করেন মোটা-মুটিভাবে কৃষ্ণ তিন হাজার বছর আগে জন্মেছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

উমাদিকে আর না ঘাঁটিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে আসি। আবার সেই দুর্ভাবনাটা পেয়ে বসে আমাকে—ধরা পড়ে যাবার ভাবনা। ভদ্রমহিলা 'মধু-বৃন্দাবনে' পড়েছেন। জেনেছেন যে লেখকের পদবী 'ঘোষ'। আমাকে তিনি 'ঘোষদা' বলেই ডাকছেন। যে-কোন সময় প্রশ্নটার সম্মুখীন হতে পারি। এবং গতকাল যত সহজে দাদার কাছে নিষ্কৃতি পেয়েছি, অত সহজে এঁর কাছে পরিত্রাণ পাব বলে মনে হচ্ছে না।

দাদা উঠে বসেছেন। জিজ্ঞেস করি, "আজ কেমন আছেন?"

"ভাল, একেবারে ভাল।" একবার থেমে আবার বলেন, "আরে, ভাল হব না তো কি? আমার কি তোমাদের মতো ওষুধ-খাওয়া শরীর

যে একটু সর্দি-কাশি হলেই সাতদিন শুয়ে থাকতে হবে। বাহাত্তর বছর বয়স হল, বাহাত্তরটা ট্যাবলেট খেয়েছি কিনা সন্দেহ।"

জিজ্ঞেস করি, "অসুখ হলেও কি আপনি ওষুধ খান না?"

"অসুখ আমার খুব কম হয়। হলেও ওষুধ বড় একটা খাই না, ন্যাচাব্যাল ট্রিটমেণ্ট করি।"

"কি রকম?"

"শুয়ে থাকি কথা বলি না এবং জল ছাড়া আর কিছু খাই না। তাই কাল হরলিক্স খেতে চাই নি, কিন্তু তোমরা শুনলে না, জোর করে খাইয়ে দিলে।"

"দিদিমা, উঠে পড়ুন এবারে।" বাণেশ্বরের গলা পাচ্ছি। নিশ্চয়ই চা হয়ে গিয়েছে। তাই বোধহয় মিসেস দাসকে শয্যাত্যাগ করতে বলছে। কারণ তিনি প্যাসেজে শুয়েছেন। তাঁর বেঞ্চি না সরালে বাণেশ্বরের এদিকে আসা সম্ভব নয়।

বেঞ্চি সরাবার শব্দ হচ্ছে। মিসেস দাস আমাদের কামরায় প্রবেশ করেন। আর ঠিক তখুনি দাসমশায় বাঙ্ক থেকে ঠিক তাঁর সামনে লাফিয়ে পড়েন।

মিসেস প্রথমে একটু চমকে ওঠেন। তারপরেই কর্কশকণ্ঠে ধমক লাগান, "আঃ মর! বুড়োর ভীমরতি হয়েছে।"

দাসমশায় অপ্রস্তুত। কারণ ঘটনাটা সম্পূর্ণ কাকতালীয়। তিনি ওপর থেকে স্ত্রীকে দেখতে পান নি। এমনি নিচে নেমেছেন। কিন্তু দৃশ্যটা আমাদের তৃপ্ত করে। আমরা উচ্চস্বরে হেসে উঠি।

লজ্জিত দাসমশায় অমিয়বাবুর পাশে গিয়ে বসেন। মিসেস দাস স্বামীর বাঙ্কে বিছানাপত্র রেখে বাথরুমের দিকে চলে যান।

একটু বাদে বাণেশ্বর ও মতি চা নিয়ে আসে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে অমিয়বাবু দাসমশায়কে জিজ্ঞেস করেন, "তা, দাসদার রাতে ঠিকমত ঘুম হচ্ছে তো?"

অমিয়বাবুর মনে কি আছে বলতে পারি না। তবে তাঁর

প্রশ্নটার মধ্যে কোন জটিলতা ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ আগের ঘটনাটি বোধ করি শ্রীদাসের মনকে জটিল করে তুলেছে। তাই তিনি ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, "আপনি আমাদের কথায় কথা বলতে আসেন কেন? জীবনে স্ত্রী-সঙ্গ করলেন না, আপনি কেন এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে আসেন?"

কানে কম শুনলেও অমিয়বাবু মোটেই বোকা নন। বিন্দুমাত্র ক্রুদ্ধ না হয়ে তিনি সহাস্যে বলেন, "আমি আপনার স্ত্রী-সঙ্গের প্রসঙ্গে কিছু বলছি না, জানতে চাইছি—রাতে আপনার ঠিকমত ঘুম হচ্ছে কিনা?"

"না, হচ্ছে না। কেমন করে হবে? বউ রইল নিচে আর আমি রইলাম ওপরে—এ অবস্থায় কারও রাতে ঘুম হয়?"

বলা বাহুল্য অমিয়বাবু এবারে চুপ মেরে যান। আমরাও নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে থাকি।

বাণেশ্বরকে কাপ ফিরিয়ে দিয়ে বাইরে তাকাই। প্রাকৃতিক দৃশ্য আরও খানিকটা পাল্টে গিয়েছে ইতিমধ্যে। রেল-লাইনের দু'ধারেই বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। মাঝে মাঝে দু-একটি টিলা। ক্ষেতের মাটি কোথাও লাল, কোথাও ধূসর, আবার কোথাও বা বেলে। কিছুক্ষণ বাদে বাদেই এক-একটি স্টেশন আসছে, ট্রেন থামছে। স্টেশনগুলো বেশ বড় বড় কিন্তু যাত্রী নেই বললেই চলে। কেউ বড় একটা নামছেও না গাড়ি থেকে। মনে হচ্ছে গাড়ি না থামলেও চলত।

কিছুক্ষণ বাদে আরেকটা স্টেশন এলো, ট্রেন থামল। এখানে কিন্তু লোক নামছে—অনেক লোক। একদল মেয়ে-পুরুষ ও বালক-বালিকা নামল গাড়ি থেকে। স্টেশনের দিকে নয়, তারা নামল উল্টোদিকে—যেদিকে প্লাটফর্ম নেই। ওরা কি টিকিট করে নি? বোধহয় তাই।

কিন্তু এসব ভাবনা আমার পক্ষে অনধিকার-চর্চা। তার চেয়ে ঐ

আগন্তুকদের দেখা যাক্। তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই পরনে রঙীন পোশাক। জনকয়েকের কোমরে লম্বা তরোয়াল। মনে হচ্ছে এরা বরযাত্রী। বিয়ে কবতে আসার সময়ও রেলের টিকিট কাটছে না!

রেল-লাইনের ধারে একটা বড় গাছের ছায়ায় কয়েকটি গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—টায়ারের চাকার বেশ মজবুত গাড়ি। গরু-গুলিও বড় বড়। বরযাত্রীর দল সেই গাড়িগুলোতে চেপে বসলেন। গাঁয়েব মেটেপথ বেয়ে গো-যানের শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল। আমাদের রেলগাড়িও চলতে শুরু করল।

"দাদু কেমন আছেন?" বিউটি আমাদের খোপে আসে, এসে আমার পাশে বসে। ভাবি শান্ত সাহাবাবুব এই ষোড়শী ভাইঝিটি। ছোটখাটো শ্যামবর্ণা সুশ্রী তরুণী। গত বছর হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করে কলেজে পড়ছে।

দাদা আমার 'গারো পাহাড়ের পাঁচালি' পড়ছিলেন। তিনি বই থেকে মুখ তুলে সহাস্যে প্রশ্ন করলেন, "এতক্ষণে বুঝি গিন্নীর কর্তার কথা মনে পড়ল?"

আমরা সবাই হেসে উঠি। বিউটি ভ্রূভঙ্গী করে বলে, "দাদু, ভাল হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি!"

দাদা তাঁর গাড়ির গিন্নীকে আর ক্ষেপাতে সাহস পান না। স্বাভাবিক স্ববে বলেন, "ভাল আছি, খুব ভাল।"

বিউটি প্রসঙ্গ পালটায়। আমাকে বলে, "মামু, আজ মহাভারতের গল্প হবে না?"

আরে তাই তো! কথাটা যে ভুলেই গিয়েছিলাম। বিউটিকে বলি, "সরকারদাকে জিজ্ঞেস কর।"

সরকারদা পরের খোপে। বিউটি গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, "ও কাকু, আজ মহাভারতের গল্প বলবেন না?"

"বলব বৈকি।" সরকারদা উত্তর দেন।

"তাহলে আসুন।"

"ওখানে আসব ?" সরকারদা জিজ্ঞেস করেন।

"হ্যাঁ।" বৌদি বলেন, "তুমি ওখানেই যাও, আমি বইটা পড়ছি।" তিনি আমার 'গঙ্গাসাগর' পড়ছেন। ভাবতে ভাল লাগছে—আমার বই পড়বার জন্য বৌদি মহাভারতের কাহিনী শুনতে চাইছেন না। জানি না অন্য কোন লেখক এভাবে এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন কিনা।

"ঘোষদা, একটু প্রসাদ ছাড়ুন।" অমিয়বাবু হাত বাড়ান।

আমি নস্যির কৌটোটা তাঁর হাতে দিই।

সরকারদা এসে অমিয়বাবুর পাশে বসেন। ভদ্রলোক কানে কম শোনেন, সুতরাং তাঁর পাশে না বসলে সরকারদাকে বড্ড চেঁচাতে হয়।

"কাল যেন কতটা হয়েছিল ?" সরকারদা প্রশ্ন করেন।

সঙ্গে সঙ্গে বিউটি উত্তর দেয়, "জরাসন্ধ-বধের পরে কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে গেলেন।"

"ও হ্যাঁ।" সরকারদা একবার থেমে শুরু করেন, "তারপরে মহাভারতে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাই রাজসূয় যজ্ঞের প্রয়োজনে সহদেবের দিগ্বিজয়ের সময়। দিগ্বিজয়ের পথে সহদেব দ্বারকায় গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পর্কে খবরাখবর দিয়ে এসেছিলেন। সেই সংবাদ অনুসারে চরাচর-শ্রেষ্ঠ ভূতভাবন ভগবান্ সনাতন বাসুদেব যথাসময়ে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলেন।

"মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পুরোহিত ধৌম্য এবং পঞ্চপাণ্ডব সসম্মানে তাঁকে যজ্ঞশালায় বরণ করলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন —বাসুদেব! কেবল তোমারই অনুগ্রহে আমি সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর, তোমারই প্রসাদে আমি আজ অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি। এখন আমি রাজসূয় যজ্ঞ করে আমার সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্র ও ব্রাহ্মণদের দান করতে চাই। তুমি আমাকে যজ্ঞ আরম্ভ করার অনুমতি দান কর।

"শ্রীকৃষ্ণ সবিনয়ে উত্তর দিলেন আপনি নৃপশ্রেষ্ঠ, আপনি সম্রাট হবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আপনি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন, আমরা কৃতকৃত্য হব। যজ্ঞের জন্য আপনি আমাকে যে কাজে নিযুক্ত করবেন, আমি তা পালন করব।

"মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য, বসুপুত্র পৌল ও ধৌম্য প্রভৃতি বেদবেদান্তপাবগ পণ্ডিতদেব পৌবোহিত্যে এবং শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে পাণ্ডবদের বাজসূয় যজ্ঞ আবম্ভ হল। একে একে ভীষ্মদেব ধৃতবাষ্ট্র ও দুর্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ যজ্ঞস্থলে এলেন। এলেন দ্রোণাচার্য কৃপাচার্য ও সিন্ধুবাজ জয়দ্রথ। এলেন বঙ্গ কলিঙ্গ মালব দ্রাবিড় সিংহল ও কাশ্মীবেব বাজাবা। এলেন বলবাম অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব প্রভৃতি যাদবগণ। এলেন বিরাট-বাজ ও শিশুপাল এবং আবও অনেকে।

"যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁদেব প্রত্যেককে পবম সমাদবে বরণ করলেন। দুঃশাসনেব ওপব তাঁদেব খাওয়া-দাওয়াব ভার পড়ল। অশ্বত্থামাকে বিপ্রসেবাব দায়িত্ব দেওয়া হল। সঞ্জয় বাজ-পরিচর্যায় নিযুক্ত হলেন আব ভীষ্ম ও দ্রোণ সবকিছু দেখাশোনা কবতে থাকলেন।

"অবশেষে অভিষেক দিবসে অর্ঘ্যদানেব সময উপস্থিত হল। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিবকে বললেন—আচার্য, ঋত্বিক, সম্বন্ধী, স্নাতক, নৃপতি এবং প্রযব্যক্তি এই দু'জনকে প্রথম অর্ঘ্য দাও। তাবপবে উপস্থিত অভ্যাগতদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁকে অর্ঘ্য প্রদান কর।

"—তিনি কে? যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন।

"ভীষ্ম উত্তব দিলেন—জ্যোতিষ্কেব মধ্যে যেমন ভাস্কর, তেমনি মনুষ্য-সমাজে কৃষ্ণ। তেজ বল ও পবাক্রম সর্ববিষয়েই শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ। তাঁর আগমনে আমাদের এই সভা উদ্ভাসিত। অতএব তাঁকেই অর্ঘ্য প্রদান কর।

"ভীষ্মেব আদেশে সহদেব কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করলেন। বাসুদেব আনন্দে তা গ্রহণ করলেন।

"শ্রীকৃষ্ণের পিসতুতো ভাই শিশুপাল কিন্তু প্রতিবাদ জানালেন। কৃষ্ণকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলার জন্য তিনি ভীষ্মকে যার-পর-নেই অপমান করলেন। ভীম রেগে গেলেন, কিন্তু ভীষ্ম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন —ব্যস্ত হয়ো না, সময় হলে কৃষ্ণই ওকে হত্যা করবে, কারণ শিশুপাল কৃষ্ণের বরে অন্যের অবধ্য। কৃষ্ণ তাঁর পিসী, শিশুপালের মা দেবী যাদবীকে কথা দিয়েছেন যে তিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করবেন। আজ তা পূর্ণ হল, সুতরাং একটু ধৈর্য ধারণ কর।

"চেদিপতি শিশুপাল আবার বাসুদেবকে বললেন—জনার্দন, আজ আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছি। এস, তোমার প্রিয়সখা পাণ্ডবদের সামনেই তোমাকে যমালয়ে পাঠাই।

"কৃষ্ণ শান্তস্বরে সমবেত ভূপতিদের বললেন—এই দুরাচার শিশুপাল আমার পিসতুতো ভাই হয়েও সর্বদা আমাদের ক্ষতি করেছে। আমার অনুপস্থিতির সুযোগে সে একবার দ্বারকা দগ্ধ করেছে। সেবারে ভোজরাজ যখন রৈবতক পর্বতে বিহার করছিলেন, তখন এই পাপিষ্ঠ তাঁর বহু অনুচরকে হত্যা করেছিল। সে আমার বাবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব চুরি করেছিল। এই দুরাত্মা সৌবীর দেশগামিনী বভ্রূপত্নী এবং নিজের মামাতো বোন বিশাল-রাজের কন্যা ভদ্রাকে অপহরণ করেছে। এমন কি রুক্মিণীর দিকে পর্যন্ত হাত বাড়িয়েছিল। সে আমার অনুরক্ত জেনেও তাঁকে বিয়ে করতে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, আমার স্ত্রী হবার পরেও একবার সে রুক্মিণীকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছিল। আজ আপনাদের সকলের সামনে শিশুপাল আমাকে দুঃসহ অপমান করেছে। আমি ওর একশো অপরাধ ক্ষমা করেছি, কিন্তু আর ওকে ক্ষমা করব না। দেখুন, আপনাদের সকলের সামনেই আমি ওকে সংহার করছি।

"কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই অরাতিনিসূদন মধুসূদন সুদর্শন-চক্রের সাহায্যে চেদিপতি শিশুপালের শিরশ্ছেদ করলেন।

তাঁর দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তাঁর শরীর থেকে সুমহৎ তেজঃপুঞ্জ নির্গত হয়ে কমললোচন কৃষ্ণের দেহে লীন হয়ে গেল।...”

“হরিবোল, জয় হরি!...”

অমিয়বাবুর আকস্মিক হরি-বন্দনার জন্য একবার থামতে হয় সরকারদাকে। তারপরে একটু হেসে তিনি কাহিনী শেষ করেন, “যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীমার্জুন ও নকুল সহদেব শিশুপালের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সুসম্পন্ন করলেন। যথাসময়ে রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হল। কুন্তী দ্রৌপদী সুভদ্রা ও পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে এলেন।”

পাঁচ

সকাল সাড়ে ন'টায় ট্রেন বীরামগাঁম পৌঁছল। ব্রডগেজ এবং মিটারগেজ উভয় লাইনেরই বেশ বড় জংশন। এখান থেকে গাড়ি যায় বরোদা-আনন্দ-আমেদাবাদ এবং ভবনগর-রাজকোট-ওখা। আমরা মেহসানা থেকে ৬৫ কিলোমিটার এসেছি। হাওড়া-বম্বে মেল 'ভায়া' নাগপুরের সঙ্গে এখানকার জন্য একখানি বগি থাকে। কলকাতা থেকে গুজরাটের যাত্রীরা সাধারণতঃ সেই বগিতে চেপে বসেন। রওনা হবার তৃতীয় দিনে এখানে পৌঁছে যান।* আর আমরা রওনা হবার তেরোদিন বাদে বীরামগাঁম এলাম। আমরা যে পর্যটক, দেখতে দেখতে পথ চলছি। ইতিমধ্যে দিল্লী মথুরা আগ্রা জয়পুর আজমীর চিতোরগড় উদয়পুর ও আবু-রোডে নেমেছি। গতকাল সকালে দ্বারকা রওনা হয়েছি।†

দিল্লী ছাড়ার পরে আর এত বেশি সময় একসঙ্গে গাড়িতে থাকি নি। বসে থাকতে থাকতে কোমর ধরে গিয়েছে। তাই ম্যানেজারের সঙ্গে নেমে পড়ি গাড়ি থেকে। ম্যানেজার স্টেশন-মাস্টারের অফিসে যাচ্ছে। জংশন স্টেশন এলেই ওকে কর্মতৎপর হতে হয়। শুধু গাড়ি কাটানো কিংবা জোড়ানো নয়, তার পরেও জল আলো পাখা এবং গাড়ি পরিষ্কার করানোর সমস্যা।

ম্যানেজার কিন্তু অন্য কথা বলে, "বইখানি বেশ ভাল লাগছে।"

"কোন্ বই?" আমি বুঝতে পারি না।

"আপনার বই—উত্তরস্যাং দিশি।"

*গত ২রা অক্টোবর (১৯৭৫) থেকে একটি সাপ্তাহিক হাওড়া-আমেদাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেণ চালু হয়েছে। হাওড়া থেকে আমেদাবাদ ২,০৯০ কিলোমিটার পথ যেতে ট্রেণটির ৪৬ ঘণ্টার মতো সময় লাগছে।

†লেখকের 'রাজভূমি-রাজস্থান' বইখানি দ্রষ্টব্য।

চমকে উঠি। তাহলে কি ধরা পড়ে গেলাম! ঐ বইতে যে আমার ছবি রয়েছে! তাহলেও কোনমতে প্রশ্ন করি, "আমার বই?" কণ্ঠস্বরে বোধহয় একটু উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়।

ম্যানেজার আমার দিকে তাকায়। একবার চোখাচোখি হয়। তারপর চোখ নামিয়ে নিয়ে বলে, "না, মানে আপনি যে বইখানি কল্পনাদিকে পড়তে দিয়েছিলেন, শঙ্কু মহারাজের বই।"

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। সহাস্যে জিজ্ঞেস করি, "বইখানি ভাল লাগছে বুঝি?"

"হ্যাঁ, এমনিতেই ওঁর লেখা আমার ভাল লাগে, তার ওপর চাম্বার দিকে যাওয়া হয় নি, দেখা হয় নি মণিমহেশ।"

"কুলু-মানালী গিয়েছেন?"

"হ্যাঁ, আমাদের কোম্পানীর ট্রিপ হয়।" একবার থামে ম্যানেজার। তারপর বলে, "আমাদের মালিক ফকিরবাবু তো আপনার বন্ধু।..."

"কেমন করে জানলেন?"

"বারে! হাওড়ায় গাড়ি ছাড়াব আগে তিনি যে আপনাকে দেখিয়ে আমাকে বলে গেলেন—ঐ ভদ্রলোক আমার বিশেষ বন্ধু। ওঁব দিকে একটু স্পেশাল কেয়ার নিও।"

ফকিরবাবু অনুরোধ রক্ষা করেছেন, নিজের কর্মচারীদের কাছে পর্যন্ত আমার পরিচয় প্রকাশ করেন নি। অথচ আমার প্রতি যাতে স্পেশাল কেয়ার নেওয়া হয়, সে ব্যবস্থাও করে গিয়েছেন।

পাঁচু প্রস্তাবটি পেশ করে, "ঘোষদা, কলকাতায় ফিরে ফকিববাবুকে বলুন না মণিমহেশ যাত্রার ব্যবস্থা করতে!"

"বেশ, বলব।"

"প্লীজ..."

গাড়ীতে ফিরে দেখি স্টেশনের হৈ-চৈতে অনেকেরই দিবানিদ্রা টুটে গিয়েছে। তারা অত্যন্ত বিরক্ত। কিন্তু তাসাড়ুদের উৎসাহে

বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়ে নি। সবচেয়ে বিস্ময়কর উকিলবাবু সামন্তবাবু ও অমিয়বাবুর সঙ্গে আজ ঠাকুরমশায়ও তাসের আড্ডায় বসে গিয়েছেন। মাঝে মাঝেই তিনি উকিলবাবুর সঙ্গে তর্ক করছেন। ওঁরা ব্রিজ খেলছেন।

খেলা নয়, আমি ভাবি ঠাকুরমশায়ের কথা। দীর্ঘকায় প্রৌঢ়। গায়ের রঙটি ফর্সা। বড় বড় চোখ। উন্নত নাসিকা। বেশ বোঝা যায় যে তিনি যৌবনে সুপুরুষ ছিলেন। খুব কম কথা বলেন। ভদ্রলোক কৃষ্ণনগরের লোক। সেখানেই থাকেন। স্কুল-মাস্টারী করতেন। কয়েক বছর আগে অবসর নিয়েছেন। তবে এখনও প্রাইভেট ট্যুশানী করেন। মেয়ে দুটির বিয়ে হয়ে গিয়েছে, ছেলেটি কলকাতায় একটা রাজ্য সরকারী অফিসের কেরানী, মেসে থাকে।

ঠাকুরমশায়ের মথুরা-বৃন্দাবন ও দ্বারকা দর্শনের ইচ্ছা বহুদিনের। কিন্তু কৃষ্ণের রাজপুরী যে কৃষ্ণনগর থেকে বহুদূর। দর্শন করতে অনেক টাকার দরকার।

অবসরপ্রাপ্ত দরিদ্র স্কুলমাস্টার অত টাকা পাবেন কোথায় ?

ছেলে কিন্তু একবারও সে-কথা ভাবে নি। গতবার পুজোর সময় বাড়ি এসে বাপ-মার মনের ইচ্ছা জানার পর থেকেই সে তাঁদের দ্বারকা পাঠাবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছে। কলকাতায় ফিরে গিয়েই চিঠি লিখেছে—বাড়ির পেছন দিকে যে খালি জমিটুকু আছে, পত্রপাঠ খদ্দের দেখে বিক্রি করে দাও। আশা করি, হাজারখানেক টাকা পেয়ে যাবে। বাকি টাকা আমি কো-অপারেটিভ থেকে ধার নেবার ব্যবস্থা করছি। আগামী ফেব্রুয়ারীতে কুণ্ডু স্পেশালের গাড়ি যাচ্ছে, তোমরাও যাচ্ছ সেই সঙ্গে। আমি ডিসেম্বরে আসছি।

ছেলে কোন কথা শোনে নি। বাধ্য হয়ে ঠাকুরমশায় বসতবাড়ির খালি জমিটুকু বিক্রি করেছেন, ছেলেও ধার করেছে। সে কুণ্ডু স্পেশালের টাকা-পয়সা মিটিয়ে দিয়েছে। সব ব্যবস্থা ঠিকমত হয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে জামা-কাপড় জিনিসপত্র ও পথখরচ নিয়ে ঠাকুরমশায়

কৃষ্ণনগর থেকে সস্ত্রীক কলকাতায় রওনা হয়েছেন। শেয়ালদা পেঁছেও গিয়েছিলেন ঠিকমত। কুলির মাথায় ট্রাঙ্ক ও বিছানা চাপিয়ে নিজে বেতের ঝুড়িটা হাতে নিয়েছেন। কুলির পেছনে পথ চলে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসেছেন। শেডের তলায় একটা জায়গায় মালপত্র রেখে কুলিভাড়া মিটিয়েছেন। তারপর স্ত্রীকে বিছানার ওপর বসে থাকতে বলে ছেলেকে ফোন করতে গিয়েছেন। কোন্ ট্রেনে তাঁরা আসবেন ঠিক না থাকায় ছেলে তাঁকে শেয়ালদা পেঁাছে অফিসে ফোন করতে বলেছিল। বলেছিল—ফোন পেলে আধঘণ্টার মধ্যে স্টেশনে গিয়ে আমি তোমাদের মেসে নিয়ে যাব।

ফোন করে ফিরে আসতেই স্ত্রী জিজ্ঞেস করেন—খোকাকে পাওয়া গেল ?

—হ্যাঁ। এখুনি আসছে। বলল, কাল নাকি আমাদেব গাড়ি ছাড়ছে না, পরশুদিন ছাড়বে।

—কেন ?

কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই চেঁচিয়ে ওঠেন ঠাকুরমশায়—ট্রাঙ্ক···আমাদের ট্রাঙ্ক কোথায় গেল !

স্ত্রী বিছানার ওপর থেকে উঠে দাঁড়ান। তাড়াতাড়ি পেছনে তাকান। বলেন—এই তো আমার ঠিক পেছনে, এখানে ট্রাঙ্কটা ছিল। কোথায় গেল ? তিনি কেঁদে ফেলেন।

ঠাকুরমশায়ের চোখদুটিও অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। দুজনের যাবতীয় জামা-কাপড় ও পথখরচ প্রায় আট শ' টাকা ছিল ঐ ট্রাঙ্কে। সারাজীবন যিনি সত্য পথে থেকেছেন, কোনদিন কাউকে ঠকান নি, তাঁর কেন এমন সর্বনাশ হল ! আর প্রকাশ্য দিবালোকে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল স্টেশনে এমন রাহাজানি কেমন করে সম্ভব ?

না, স্টেশনের প্রহরীদের কেউ তাঁর এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নি, বরং সেই 'কেয়ার টেকার'-এর দল 'কেয়ারলেসনেস'-এর জন্য ঠাকুরমশায়ের স্ত্রীকেই তিরস্কার করেছে। অগণিত যাত্রীদের মধ্যে

কেউ সেই রেল-পুলিসদের বলে নি—তোমাদের কর্তব্যহীনতার জন্যই এখানে এমন ঘর্টনা হামেশা ঘটছে এবং তোমরা ইচ্ছে করলে অনায়াসে অনভিজ্ঞ যাত্রীদের এই সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাতে পার।

ঠাকুরমশাই ঠিক করেছিলেন যাত্রা বন্ধ করবেন। কিন্তু ছেলে সেকথা শোনে নি। বলেছে—দুদিন সময় যখন পাওয়া গেছে, একটা ব্যবস্থা কবে ফেলব। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।

ঠাকুরমশাই নিশ্চিন্ত হতে পাবেন নি, কিন্তু ছেলে তার কর্তব্যে অবহেলা করে নি। কোথা থেকে যেন শ' চাবেক টাকা যোগাড় কবেছে। মাকে দুখানি শাড়ি, দুটি শায়া ও দুটি ব্লাউজ কিনে দিয়েছে। বাকি টাকাটা দিয়ে বলেছে—সব জায়গায় সব কিছু দেখতে পারবে না, কিন্তু মথুবা বৃন্দাবন ও দ্বাবকাব পথ-খবচ এতেই হয়ে যাবে। টাকাটা সব সময় কোমরে বেঁধে রেখো। সে বাপকে তার নিজের দুখানি ধুতি ও একটা পাঞ্জাবি 'দয়ে দিয়েছে।

মা-বাপ ছেলের দেওয়া সেই জামা-কাপড় পবেই তীর্থদর্শন করছেন। তীর্থস্থান ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবছেন না। কারণ কুণ্ডু কোম্পানী আমাদের রেলস্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছেন। তারপর সব খরচ আমাদের। আমরা কোথাও সবাই মিলে একটা বাস ভাড়া করছি, কোথাও টাঙ্গায় করে দর্শন করছি। সব দেখতে হলে ওঁদের দুজনের প্রায় শ' আটেক টাকার প্রয়োজন ছিল। কাজেই ওঁরা নামতে পারেন নি দিল্লী আগ্রা চিতোরগড় উদয়পুব ও আবু-রোডে। কিন্তু দর্শন করেছেন মথুরা বৃন্দাবন অম্বর পুষ্কর নাথদ্বার ও একলিঙ্গজী। দর্শন করবেন প্রভাস ও দ্বারকা—পূর্ণ হবে ভক্ত-ব্রাহ্মণের মনস্কামনা।

হাওড়ায় গাড়ি ছাড়বার পর থেকেই ঠাকুরমশায়কে দেখে এসেছি শান্ত শিষ্ট ও স্বল্পবাক্ মানুষ। শেয়ালদায় ট্রাঙ্ক চুরির কথাও তিনি বলেন নি, বলেছেন তাঁর স্ত্রী। ঠাকুরমশায় গাড়িতে সাধারণতঃ শুয়েই থাকেন। আজই দেখছি তাঁর অন্য রূপ। তিনি

শুধু উঠে বসেন নি, তাসের আড্ডায় যোগ দিয়েছেন। মাঝে মাঝে বচসায় পর্যন্ত অংশ নিচ্ছেন।

কেন তাঁর এই আকস্মিক পরিবর্তন? দ্বারকা নিকটবর্তী হচ্ছে বলে? ভগবৎ দর্শন আসন্ন বলে কি ভক্ত এমন পুলকিত?

ম্যানেজার জানাল, অনেক চেষ্টা করেও সে আবু-রোডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে নি। শ্রীর কোন খবর পাওয়া গেল না আজ। আমেদাবাদে পৌঁছবার আগে আর বোধহয় পাওয়াও যাবে না। আমরা এখন ওদের থেকে ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছি।

একটু পরেই গাড়ি ছাড়ল। আর তার পরেই কৃষ্ণকথার আসর বসল। তাসের আড্ডা ভেঙে গিয়েছে। তাঁদেরও কয়েকজন আমাদের আসরে যোগ দিলেন।

সরকারদা শুরু করেন, "শিশুপাল-বধের পরে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাই দ্বৈতবনে বনপর্বের দ্বাদশ অধ্যায়ে। কিন্তু তার আগে সভাপর্বের ছেষট্টি অধ্যায়ে দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণের সময় কৃষ্ণের উল্লেখ আছে।....."

"হ্যাঁ, কৃষ্ণ অদৃশ্য থেকে তাঁকে কাপড় যুগিয়েছিলেন।" বিউটি মাঝখান থেকে বলে বসল।

সরকারদা মৃদু হেসে বলেন, "কৃষ্ণ কৃষ্ণার লজ্জা নিবারণ করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেদিন ভুবনেশ্বর কেশবের হয়ে মহাত্মা ধর্ম অন্তরাল থেকে যাজ্ঞসেনীকে কাপড় যুগিয়েছিলেন। দুঃশাসন বহু চেষ্টা করেও তার ভ্রাতৃবধূকে প্রকাশ্য সভায় বিবসনা করতে পারে নি।

"অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ সেদিন দুর্যোধনের চক্রান্ত, শকুনির পাশা খেলা এবং দ্রৌপদীর অপমানের কথা জানতে পেরেও ইন্দ্রপ্রস্থে আসতে পারেন নি।"

"কারণ?" অমিয়বাবু জিজ্ঞেস করেন।

সরকারদা উত্তর দেন, "তখন তিনি শাল্বের সৌভ-নগর বিনাশে ব্যস্ত ছিলেন।"

"একটু খুলে বলুন না কাকা!" বিউটি ফরমাশ করে।

সরকারদা বলে চলেন, "তুমি জান যে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছিলেন এবং তখুনি তিনি শিশুপালকে সংহার করেন। শিশুপাল ছিলেন সৌভ-রাজ শাল্বের অতিশয় প্রিয়পাত্র। তিনি প্রতিশোধ নেবার জন্য দ্বারকা আক্রমণ করে যাদবদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করলেন। কৃষ্ণ-বলরাম সহ প্রায় সমস্ত যাদব-বীর তখন ইন্দ্রপ্রস্থে ছিলেন। তাহলেও উপস্থিত যাদবরা তাঁকে যথাসাধ্য বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু তেমন সুবিধা করতে পারেন নি।

"কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরেই শুনতে পেলেন সব। তিনি তৎক্ষণাৎ মহাদেবকে প্রণাম করে চতুরঙ্গিণী সেনা নিয়ে সৌভ-নগর যাত্রা করলেন। তিনি পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে শাল্বকে সমরে আহ্বান জানালেন। একে তো তখন সৌভ-নগর ছিল প্রায় এক ক্রোশ উঁচুতে, তার উপরে শাল্ব ছিলেন মায়াবী। শাল্ব সেখানে বসেই যুদ্ধ করতে লাগলেন। নানা অস্ত্র প্রয়োগ করেও কৃষ্ণ যখন সুবিধা করতে পারলেন না, তখন তিনি দানবান্তকারী দিব্য আগ্নেয়াস্ত্র এবং অরাতিকুলবিমর্দন সুদর্শন-চক্র ব্যবহার করলেন। সুদর্শন প্রথমে সৌভ-নগরকে দ্বিখণ্ডিত করে মাটিতে ফেলে দিল, তারপরে শাল্বকে নিহত করল।"

"সৌভ-নগর এক ক্রোশ উঁচুতে! ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না কাকা!" সরকারদা থামতেই বিউটি জিজ্ঞেস করে, "সৌভ তো একটা জনপদ?"

"না। মহাভারতের বর্ণনা পড়ে মনে হয় সৌভ একটা আকাশ-যান, মানে বিমান।" সরকারদা উত্তর দেন।

"তখনকার দিনেও এরোপ্লেন ছিল?"

"রামায়ণ ও মহাভারত পড়ে তো মনে হয় ছিল। কিন্তু সেকথা থাক্, এবারে আমরা আসল কথায় আসি।

"ধর্মবাজ যুধিষ্ঠিব পাশা খেলায পবাজিত হয়ে চাব ভাই ও দ্রৌপদীকে নিযে বনবাসী হলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে তাঁবা প্রথমে এলেন কাম্যবনে। সেখানে সঞ্জয ও বিদুর তাঁদেব সঙ্গে দেখা কবলেন। কিছুকাল সেখানে কাটিযে তাঁবা দ্বৈতবনে এলেন। এদিকে শাল্বকে নিহত কবে দ্বাবকায ফিবেই কৃষ্ণ শুনতে পেলেন সব। দুঃখসন্তপ্ত পাণ্ডবদেব সঙ্গে সাক্ষাৎ কববাব জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটে এলেন দ্বৈতবনে। পাণ্ডবদেব দুববস্থা দেখে তিনি দুর্যোধনদেব ওপব খুবই বোগে গেলেন। যুধিষ্ঠিবকে বললেন —পৃথিবী অবশ্যই দুবাত্মা দুর্যোধন কর্ণ শকুনি ও দুঃশাসনেব বক্ত পান কববে। আমবা এখুনি ওদেব পবাজিত কবে আপনাকে সিংহাসনে বসাবো। আমবা দুর্যোধনেব অনুগত নৃপতিদেবও ক্ষমা কবব না, কাবণ যে ঘৃণিত কাকেব অনুগামী হয সেও বধ্য আব তাই সনাতন ধর্ম।

"অমিততেজা কেশবকে ক্রুদ্ধ হতে দেখে পার্থ প্রমাদ গণলেন। তিনি কৃষ্ণকে শান্ত কববাব জন্য বলতে থাকলেন—হে কৃষ্ণ। তোমাব তা এমন ক্রুদ্ধ হওযা সাজে না। তুমি না যত্রসাযংগৃহ মুনি হযে দশ হাজাব বছব গন্ধমাদন পবতে বিচবণ কবেছিলে, কেবল জল পান কবে এগাবো বছব পুষ্কবে বাস কবেছিলে, ঊর্ধ্ব বাহু হযে বদ্রীনাথে শুধু বায়ু ভক্ষণ কবে একপাযে একশ' বছব দাড়িযে ছিলে? যজ্ঞের সময তুমিই তো উত্তবীয বস্ত্র-বিবর্জিত হযে সবস্বতী তীরে বাবো বছব কাটিযেছিলে। মহামুনি ব্যাস আমাকে বলেছেন লোকপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত কবাই তোমাব একমাত্র উদ্দেশ্য, কাবণ তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ, সবভূতেব আদি ও অন্ত। তুমি তপোনিধান ও নিত্যস্বরূপ।

"তুমি নবকলেবব পবিগ্রহ কবে মনুষ্যলোকে আবির্ভূত হলেও তুমিই নাবাযণ, হবি, ব্রহ্মা, সোম, সূর্য, ধর্ম, বিধাতা, যম, অনল, অনিল, বৈশ্রবণ, রুদ্র, কাল, আকাশ, পৃথিবী, দশদিক, অজ, চবাচবগুরু ও স্রষ্টা। তুমি দেবমাতা অদিতিব গর্ভে পুত্ররূপে জন্ম নিযে ইন্দ্র-হিতনিষ্ঠ বিষ্ণু বলে বিখ্যাত হযেছ। তুমি বালক হযেও তিন পাযে

পৃথিবী আকাশ ও স্বর্গকে আবৃত করেছ, নিসুন্দ ও নরকাসুরকে বধ করে প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ নিষ্কণ্টক করেছ, রুক্মিরাজকে পরাজিত করে তাঁর বোন রুক্মিণীকে সহধর্মিণী করেছ। অবশেষে তুমি দ্বারকা নগরীকে আত্মসাৎ করে মহাসাগরের অন্তর্গত করবে।

"হে মধুসূদন, তুমি তো নৃশংসতা কপটতা ক্রোধ ও মাৎসর্যের বশীভূত নও। তুমি তো কখনও মিথ্যা কথা বলো না। প্রলয়কালে তুমিই তো মীনরূপে বেদকে রক্ষা করেছিলে, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা তোমারই নাভিমূল থেকে সৃষ্ট হয়েছেন। তুমিই তোমার ললাট থেকে ত্রিলোচনকে সৃষ্টি করে মধু-কৈটভকে দগ্ধ কবেছিলে। তুমি শৈশব ও কৈশোরে বলদেবের সঙ্গে ব্রজে ও মথুবায় যে লীলা করেছ, তা কেউ কোনকালে করতে পারেন নি, পারবেনও না। সুতরা তোমার তো এমন ধৈর্য হারালে চলবে না কেশব, তুমি শান্ত হও।

"অর্জুনের কথায় যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। তিনি শান্তস্বরে অর্জুনকে বললেন—হে পার্থ! তুমি আমার, আমি তোমার। তুমি নর, আমি নারায়ণ। আমরা নর-নারায়ণ রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছি। সুতবাং তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।

"দ্রৌপদী চোখেব জল ফেলে কৌবব-সভায় তার অপমানের কথা কৃষ্ণকে জানালেন। কৃষ্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—যারা সেদিন তোমাকে অপমান করেছে, তোমার স্বামীরা তাদের সবাইকে হত্যা করবে। আজ তুমি যেমন চোখের জল ফেলছ, তখন তাদেব স্ত্রীরাও এমনি অশ্রুপাত করবে এবং তাদের সে অশ্রুধারা কোনদিন শুকোবে না। আমি সত্য করে বলছি, তুমি রাজরাণী হবে। যদি কখনও আকাশ ভেঙে পড়ে, হিমাচল শীর্ণ হয়, সমুদ্র শুকিয়ে যায় কিংবা পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়, তাহলেও এই সত্য মিথ্যে হবে না।

"দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। তিনি তাঁকে পাশা খেলার সময় উপস্থিত না হতে পারার কারণ জানালেন, শাল্ব-বধের কাহিনী শোনালেন। বললেন—আমি তখন দ্বারকায়

থাকলে কিছুতেই আপনাকে শকুনির সঙ্গে পাশা খেলতে দিতাম না। আপনি তো জানেন যে স্ত্রী, দ্যূত, মৃগয়া এবং সুরায় আসক্ত হলে মানুষ অধঃপাতে যায়। আমি সেদিন উপস্থিত থাকলে হয় দুর্যোধন মারা যেত, না হয় পাশা খেলা বন্ধ হত। যাক্‌গে, যা হবার হয়ে গিয়েছে। এখন ফলভোগ করতেই হবে। কারণ বাঁধ একবার ভেঙে গেলে বন্যা রোধ করা খুবই কঠিন কাজ।

"অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুভদ্রা ও অভিমন্যু সহ দ্বারকায় ফিরে এলেন।"

থামলেন সরকারদা। সত্যেনদা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা, বনবাসের সময় দ্রৌপদীর ছেলেরা কোথায় ছিলেন?"

"কখনও তাঁদের মামাবাড়িতে, কখনও দ্বারকায়। তবে তারা দ্বারকায় থাকতেই বেশি পছন্দ করতেন। সুভদ্রা তাঁদের খুবই যত্ন করতেন। প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ ও অভিমন্যু তাদের অস্ত্রশিক্ষা দিতেন।"

"তারপরে কৃষ্ণ কি করলেন কাকু?" এবারে বিউটির প্রশ্ন।

মৃদু হেসে সরকারদা বিউটিকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি নিশ্চয়ই জান যে বনবাসের সময় দ্রৌপদী ও পঞ্চ-পাণ্ডব ভারতের তাবৎ তীর্থ দর্শন করেছিলেন?"

বিউটি বেণী দুলিয়ে মাথা নাড়ে।

সরকারদা বলতে থাকেন, "তীর্থ-পরিক্রমায় বেরিয়ে তাঁরা মহর্ষি লোমশের সঙ্গে প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হলেন।"

"আমরা প্রভাসে যাব না মামু?"

"হ্যাঁ।" আমি বিউটির প্রশ্নের উত্তর দিই। বলি, "আমরা বেট-দ্বারকা দেখে প্রভাস যাব।"

সরকারদা আবার শুরু করেন, "খবর পেয়ে বলরাম কৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন শাম্ব সাত্যকি এবং অন্যান্য যাদবরা দ্বারকা থেকে ছুটে গেলেন সেখানে। দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদের পোশাক এবং চেহারা দেখে তাঁরা খুবই দুঃখিত হলেন। বলরাম ও সাত্যকি দুর্যোধনের ওপর খুবই

রেগে গেলেন। সাত্যকি বললেন—আমি বলদেব কৃষ্ণ এবং প্রদ্যুম্ন যাঁদের সহায় তাঁরা কেন এমন ভিক্ষুকের মতো বনে বনে ঘুরে বেড়াবে? চল, আমরা আজই সসৈন্যে হস্তিনাপুর যাত্রা করি। বৃষ্ণি ভোজ এবং অন্ধকদেরও সঙ্গে নিই। ধৃতরাষ্ট্রদের নিশ্চিহ্ন করে মহারাজা যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করি। তা না করলে আমরা কর্তব্যহীনতার পরিচয় দেব।

"সাত্যকির কথায় উত্তেজিত যাদবরা সবাই কৃষ্ণের দিকে তাকালেন। একটুকাল নীরব থেকে বাসুদেব সাত্যকিকে লক্ষ্য করে সবিনয়ে বললেন—আপনি যা বললেন, তা সম্পূর্ণ সত্য। সত্যই ধৃতরাষ্ট্রদের ধ্বংস করে পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া আমাদের পরমতম কর্তব্য। কিন্তু আপনারা তো ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জানেন। তিনি কিছুতেই অন্যের জয়লব্ধ রাজ্য গ্রহণ করবেন না। আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আপনাদের মনস্কামনা অবশ্যই পূর্ণ হবে এবং পাণ্ডবরাই তা পূর্ণ করবে। আপনারা শুধু আর কিছুকাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন।

"যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণকেই সমর্থন করলেন। তিনি যাদবদের বললেন —তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় বড়ই আনন্দ পেলাম। এখন তোমরা দ্বারকায় ফিরে যাও। আমরাও যাত্রা করি। সুখের দিন ফিরে আসবে। তখন আবার দেখা হবে।" সরকারদা চুপ করলেন।

বিউটির বোধহয় তাঁকে থামতে দেবার ইচ্ছে নেই। তাই সে বলে বসল, "আচ্ছা কাকু, পাণ্ডবদের জব্দ করবার জন্য দুর্যোধন তো সঁ-শিষ্য দুর্বাশাকে এই কাম্যবনেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"সে কখন?"

"অনেক পরে। বনপর্বের দু-শ' বাষট্টি অধ্যায়ে।"

"দু-শ' বাষট্টি!" বিউটি বিস্মিত।

"হ্যাঁ।" সরকারদা বলেন, "কাশীদাসী মহাভারতে আদিপর্ব সবচেয়ে বড় হলেও মূল-মহাভারতের আঠারটি পর্বের মধ্যে শান্তিপর্ব হল সবচেয়ে বড়, তারপরেই বনপর্ব। তিনশ' চোদ্দটি অধ্যায় আছে বনপর্বে। বনবাসের সময় পাণ্ডবরা দীর্ঘকাল কাম্যবনে কাটিয়েছেন। তীর্থযাত্রার আগে ও পরে। দুর্বাশা এসেছিলেন একেবারে শেষদিকে, আমরা এখনও সেখানে আসি নি। শ্রীকৃষ্ণ দু-বার কাম্যবনে পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।"

"কাম্যবনটা কোথায়?"

"এই তো মুশকিলে ফেললে। মহাভারতের মধ্যে আবার ভূগোলের প্রশ্ন কেন?" সরকারদা হাসতে হাসতে বলেন।

বিউটি লজ্জা পেয়ে মুখ লুকোয়। বেচারীর কৌতূহলটা নিবৃত্ত করা যাক্। আমি বলি, "কাম্যবন বর্তমান রাজস্থানের ভরতপুর জেলার কামাঁ তহশিল। এখন আর বন নেই, ছোট শহর। দূরত্ব ভরতপুর থেকে ৩৫ মাইল। কাম্যবন শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোরের লীলাভূমি এজমণ্ডলের দ্বাদশ বনের অন্যতম। ভক্ত-বৈষ্ণবরা বন-পরিক্রমার সময়ে কাম্যবনে রাত কাটান। মথুরা থেকে বাসে করেও কাম্যবনে যাওয়া যায়।"

"শঙ্কু মহারাজের 'মধু-বৃন্দাবনে' বইতে কাম্যবনের কথা পড়েছি।" আমি থামতেই কল্পনাদি বলে ওঠেন। আবার আমার বুকটা কেঁপে ওঠে। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে চুপ করে থাকি।

কল্পনাদি বলে চলেছেন, "কাম্যবনে অনেক দর্শন আছে—বিমলাকুণ্ড ও ধর্মরাজের কুয়ো, যেখানে তিনি যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করেছিলেন। আছে কামেশ্বর শিব, রাধাগোবিন্দ ও রাধাগোপীনাথ মন্দির। আছে চরণ-পাহাড়ী, ব্যোমাসুরের গুহা, ভোজনথালী ও প্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভজনস্থলী প্রভৃতি।"

থামলেন কল্পনাদি। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। রীতিমত ঘেমে গিয়েছি।

তাড়াতাড়ি বাথরুমে চলে আসি। চোখে-মুখে জল দিই।

বাথরুম থেকে বের হতেই দেখা হয় বড় ঠাকুরমার সঙ্গে। কেন যেন তিনি প্যাসেজে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঠাকুরমা অভিযোগ করেন, "দাদা ছাখি আইজ-কাইল আমাগো একদম ছাখা-শুনা করতে আছো না।"

কথাটা মিথ্যে নয়। গত কয়েকদিন সত্যই ওঁদের খোঁজ-খবর করতে পারি নি।

ঠাকুবমা আবার বলেন, "একবার চলো না আমাগো জাগায়।"

ওঁদের জায়গা অর্থাৎ গাড়ির অপর প্রান্তে কিচেনের পাশের খোপটি।

উকিলবাবু ও সামন্তবাবুর খোপ পেরিয়ে ঠাকুরমাদের জায়গায় আসি। মেজ ঠাকুবমা ও ছোট ঠাকুরমাও খুশি হন আমাকে দেখে। তাঁরাও একই অভিযোগ কবেন।

বড় ঠাকুবমা বলেন, "দাদা, একটু আচার খাও।"

"এখন থাক্। একটু বাদেই তো চা আসবে।" আমি আপত্তি করি।

"তাহলে একটু চানাচুর খাও।"

এবারে আর আপত্তি করতে পারি না। সীটের পাশে রাখা বোতল ও কৌটোর সারি থেকে একটি কৌটো খুলে তিনি খানিকটা চানাচুব আমাব হাতে দিলেন। আগেই বলেছি ঠাকুরমারা অতিশয় পর্যটনপটু। সূঁচ-সুতো থেকে ওষুধ পর্যন্ত যখন যা দরকার, ওঁদের কাছে চাইলেই পাওয়া যায়।

এঁরা সকলেই ব্যবসায়ী পরিবারের বৃদ্ধা বিধবা, সুতরাং স্বচ্ছল অবস্থা। ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীরা হাওড়ায় এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে গিয়েছেন। প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসই তাঁরা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন। এবং মানুষের প্রয়োজনের যেহেতু কোন সীমারেখা নেই, সেইহেতু জিনিসপত্রগুলোর পরিমাণ একটু বেশিই।

"দাদা, একটা লেবেঞ্চুশ খাবা নাকি ?" ছোট ঠাকুরমা জিজ্ঞেস করেন।

শেষ চানাচুরটুকু মুখের ভেতরে চালান করে দিয়ে বলি, "লজেন্স কিনলেন নাকি ?"

"হ।"

"কোথায় ?"

"ঐ যে পরশু যেখানে শ্বেত-পাথরের মন্দির ছ্যাখ্‌লাম।"

"মাউন্ট আবুতে ?"

ছোট ঠাকুরমা মাথা নাড়েন। তিনি আমার হাতে একটি লজেন্স গুঁজে দেন।

মেজ ঠাকুরমা বলেন, "দাদা, কয়দিন ধরিয়াই তোমারে একটা কথা কমু ভাবতে আছি। কওয়া আর হইয়া ওঠে নাই।"

"বেশ তো, বলুন না !"

"তুমি তো সব মন্দিরের কথা খাতায় লেইখ্যা লইতে আছো ?"

বুঝতে পারছি তিনি আমার ডায়েরী লেখার কথা বলছেন। বলি, "একটু-আধটু লিখে নিচ্ছি আর কি। অনেকেই তো লিখছেন।"

"হ, তা ল্যাখ্‌তে আছে। তোমার ছ্যাখা-ছ্যাখি অনেকেই ল্যাখ্‌তে আরম্ভ করছে।"

ভদ্রমহিলা ঠিকই বলেছেন। জয়পুরে সেদিন প্রথম যখন পথে বেরিয়ে ডায়েরী লিখতে শুরু করেছিলাম, তখন বেশ কয়েকজন কৌতূহলী সহযাত্রী আমাকে নানা প্রশ্নে জর্জরিত করেছিলেন। সবাইকে একই উত্তর দিয়েছিলাম—এটা আমার একটা 'হবি', বেড়াতে বেরুলেই 'নোট্‌স' রাখি।

—কি করবেন এই নোট্‌স দিয়ে ?

—বুড়ো বয়সে যখন আর বেড়াবার শক্তি থাকবে না, তখন এগুলো পড়ব বসে বসে।

জানি না সেদিন তাঁরা আমার সে কথা বিশ্বাস করেছিলেন কিনা। তবে পরের দিন আজমীরে দেখেছি আমার কয়েকজন সহযাত্রী খাতা-পেন্সিল নিয়ে পথে বেরিয়েছেন এবং আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা ডায়েরী লিখছেন। বলা-বাহুল্য সে প্রতিযোগিতা আজও শেষ হয় নি।

এবারে বড় ঠাকুরমা কাজের কথাটি বলেন, "তোমার খাতার থিকা মন্দিরগুলার নাম আর দর্শনের তারিখ লেইখ্যা এ্যাকটা ফর্দ আমাগো কইরা দেবা?"

"জায়গাগুলার নামও লেইখ্যা দিও।" ছোট ঠাকুরমা যোগ করেন।

"বেশ তো, এ আর একটা কঠিন কাজ কি?" আমি বলি, "সব দেখা হোক্, নিশ্চয়ই আপনাদের একটা লিস্ট আমি করে দেব।"

"বাইচ্যা থাকো বাবা!" প্রায় সমবেত স্বরে ঠাকুরমারা আশীর্বাদ করেন আমাকে।

আর ঠিক তখুনি পাশের খোপ থেকে বাণেশ্বর বলে ওঠে.

"ঘোষদা, সীটে চলুন। চা নিয়ে যাচ্ছি।"

আমি উঠে দাঁড়াই।

ছয়

সন্ধ্যের একটু পরে ট্রেন রাজকোট পৌঁছল। বেশ বড় জংশন। এখান থেকে ট্রেন যায় ভেরাভল এবং ওখা অর্থাৎ প্রভাস ও দ্বারকা। রাজকোট জেলা জামনগর জেলার পূর্ব-সীমা। দ্বারকা জামনগর জেলার পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। রাজকোট শহর জেলার মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত।

বীরামগাম ও রাজকোটের মাঝে আমরা তিনটি জংশন পেরিয়েছি। সুরেন্দ্রনগর, থান ও ওয়ানকানের জংশন। সুরেন্দ্রনগর থেকে ট্রেন যায় ভবনগর।

কিন্তু ভবনগরের কথা থাক্, তার চেয়ে বরং রাজকোটের কথাই ভাবা যাক্। রাজকোট ষোড়শ শতাব্দীর শহর। বর্তমান জনসংখ্যা তিন লক্ষের কিছু বেশি। আয়তন পঁচিশ বর্গমাইলের মতো। মহাত্মা গান্ধী তাঁর শৈশবের কয়েকটি বছর অতিবাহিত করেছেন এই শহরে। তিনি যে বাড়িটিতে বাস করতেন, সেটি এখন পুণ্যতীর্থে পরিণত। নাম—'বাপুনো দেলো'।

আরও কয়েকটি দর্শনীয় স্থান আছে রাজকোটে। যেমন ওয়েস্টসন মিউজিয়াম ও রাষ্ট্রীয় শালা। ১৮৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই যাদুঘরটি রাজকোটের বিখ্যাত জুবিলী গার্ডেনে অবস্থিত এবং মহাত্মাজীর উপস্থিতিতে ১৯২১ সালে স্থাপিত।

কিন্তু সে-সব কিছুই দেখতে পারব না আমরা। কারণ দেখা তো দূরের কথা ম্যানেজার গাড়ি থেকে নামতে পর্যন্ত দিল না।

আমরা মেহসানা থেকে ২৪৬ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছি। প্রায় চোদ্দ ঘণ্টা সময় লেগেছে। এখান থেকে দ্বারকা রেলপথে ২১৮ কিলোমিটার, দশ ঘণ্টার মতো সময় লাগবে আমাদের।

আগামীকাল সকাল আটটা নাগাদ আমরা দ্বারকা পৌঁছব। অতএব দ্বারকা এখনও বহু দূর।

এখানে গাড়ি কাটা কিংবা জোড়া লাগাবার ঝামেলা নেই। ট্যাঙ্কে জল ভরাবার ব্যবস্থা বাণেশ্বরই করে ফেলল। সুতরাং ম্যানেজার নিশ্চিন্তে তাসের আড্ডায় বসে রইল।

না। ম্যানেজার বোধহয় আর নিশ্চিন্তে থাকতে পারল না। সহসা রমানাথ এসে হাজির হয়েছে। রমানাথ ত্রিপাঠী প্রধান পাচক। সে বড় একটা কিচেন ছেড়ে বাইরে আসে না। একান্ত প্রয়োজন হলে সহকারী গৌরকে পাঠায়। সুতরাং বিস্মিত হলাম।

শুধু আমরা নই, ম্যানেজারও। সে জিজ্ঞেস করে, "কি ব্যাপার রমানাথ ?"

"আজ্ঞে গার্ডসাহেব বলছেন গাড়ির ভেতর রান্না করতে পারবে না, স্টোভ নিবিয়ে দাও।"

সর্বনাশ! রান্না করতে পারবে না কি! এতগুলো লোক তাহলে খাবে কি ? অথচ এ গাড়িতে কিচেন নেই বলে রান্না করা সত্যই বে-আইনী।

পাঁচু কিন্তু নির্বিকার। সে রমানাথের কথার কোন উত্তর না দিয়ে তাসের কল্ দিচ্ছে। লোকটা তো অদ্ভুত! এতবড় একটা দুঃসংবাদ শুনেও তাস খেলছে!

ডাকাডাকি শেষ হলে পাঁচু রমানাথের দিকে একবার তাকায়। তারপরে নিজের হাতের তাসের দিকে নজর রেখে জিজ্ঞেস করে, "গার্ডের সঙ্গে ক'জন আছে ?"

"আজ্ঞে দু'জন।"

"বাণেশ্বরকে দিয়ে এক পট চা আর বারোখানা বিস্কুট গার্ডের কামরায় পাঠিয়ে দাও।"

"স্টোভ নেভাব না তাহলে ?"

"না না।' পাঁচু প্রায় ধমকেব স্বরে রমানাথকে বলে, "স্টোভ নেভাবে কি ? ববং একটা কাজ....."

"কি ?"

ম্যানেজাব নিরুত্তব। সে আবাব তাসে ডুবে গিয়েছে। কি একটু ভেবে নিয়ে সে সশব্দে ইশ্‌কাবনেব টেক্কাটাকে তুরূপ কবে। তাবপবে ধীবে-সুস্থে বমানাথেব দিকে তাকায়। বলে, "দু' কৌটো চাল বেশি নিও।"

বমানাথ চলে যায়। তাস খেলা চলতে থাকে। পাঁচু যতই নির্বিকাব থাক্, আমি মনে মনে একটু চিন্তিত না হয়ে পারি না।

বাজকোট থেকে ট্রেন ছাড়ল। কিন্তু কয়েক মিনিট বাদেই আবাব একটা স্টেশনে ট্রেন থামল। তাড়াতাড়ি দবজার কাছে আসি বাণেশ্বব চা-বিস্কুট নিয়ে নেমে যায়। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকি।

ছোট স্টেশন, কিন্তু গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তখনও। ব্যাপাব কি ? দবজা দিয়ে গলা বাড়াই না, লাইন ক্লিয়াব রয়েছে। তাহলে গাড়ি দাঁড়িয়ে কেন ?

পেছনে তাকাতেই কাবণটা বুঝতে পাবি। আমাদেব গাড়িব ঠিক আগেই গার্ডেব গাড়ি। গার্ডসাহেব সবুজ আলো হাতে নিয়ে বাণেশ্বরেব সঙ্গে কথা বলছেন, ড্রাইভাবকে আলো দেখাচ্ছেন না।

কথা বোধ হয় শেষ হযেছে। বাণেশ্বব ফিবে আসছে। এবাবে গার্ডসাহেব আলো দেখালেন। গাড়ি চলতে শুরু কবে। বাণেশ্বর গাড়িতে উঠে আসে।

দবজা বন্ধ কবে বাণেশ্বরকে জিজ্ঞেস করি "গার্ডসাহেব এতক্ষণ কি বলছিলেন তোমাকে ?"

"রাতে কি রান্না হয়েছে ?"

"তুমি বললে বুঝি ?"

"হ্যাঁ।"

"তা তিনি কি বললেন ?"

"বললেন—তিন থালি খাবার পাঠিয়ে দিও।"

অন্তর্যামী ম্যানেজারকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়ে জায়গায় ফিরে আসি।

না! সরকারদাকে ওরা রেহাই দেবে না। ,আবার কৃষ্ণকথার আসর বসেছে। আমিও সামিল হই।

সরকারদা বলে চলেছেন, "পাণ্ডবরা তীর্থদর্শন শেষ করে কাম্য-বনে ফিরেছেন শুনে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে নিয়ে দ্বারকা থেকে কাম্য-বনে পৌঁছলেন। কুশলাদি বিনিময়ের পরে দ্রৌপদী সত্যভামাকে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। কৃষ্ণ এসে বসলেন পাণ্ডবদের সঙ্গে। কথায় কথায় কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—মহারাজ, রাজ্যলাভের চেয়ে ধর্মরক্ষা অনেক বড়। আপনি সত্যপথে থেকে সরলভাবে সেই ধর্মকে রক্ষা করে ইহলোক এবং পরলোক জয় করেছেন। ভোগের ভেতরেও দান সত্য তপ শ্রদ্ধা ক্ষমা ও ধৃতির কথা বিস্মৃত হন নি। নিজের স্ত্রীকে সবার সামনে বিবসনা করার চেষ্টা করতে দেখেও আপনি সেই দুর্বিসহ নৃশংসাচার সহ্য করেছেন। এখন যাদ আপনার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে বলুন, আমরা কৌরবকুল নির্মূল করে আপনাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করি। আরেকটি কথা, সেদিন সভায় আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তার যেন অন্যথা না হয়। আপনি আদেশ করলেই যাদবরা আপনার শত্রুদের বিনাশ করবে।

"যুধিষ্ঠির তখন করজোড়ে কৃষ্ণকে বললেন—হে কেশব! তুমি পাণ্ডবদের অদ্বিতীয় গতি। বিপদ ও সম্পদে আমরা সর্বদাই তোমার শরণাপন্ন। তুমিই আমাদের কর্তা ও উপদেষ্টা। প্রতিজ্ঞামত আমাদের দ্বাদশ বর্ষ বনবাস প্রায় সম্পূর্ণ, তবে এর পরেও এক বছর অজ্ঞাতবাস করতে হবে। তারপরে আমরা তোমার পরামর্শমত কাজ করব।

"ঠিক এই সময় অজর ও অমর মহাতপাঃ মার্কণ্ডেয় সেখানে উপস্থিত হলেন। কালজ্ঞ সনাতন পুরুষ বাসুদেব তাঁকে বললেন—আপনি পাণ্ডবদের কাছে যা কীর্তন করতে এসেছেন, তা কীর্তন করুন।

"রূপগুণ-সম্পন্ন ধর্মাত্মা মার্কণ্ডেয় তখন বিভিন্ন কাহিনী বলে পাণ্ডবদের নানা উপদেশ দান করতে থাকলেন। তিনি তাঁদের 'দ্বিজাতি-মহাত্মা-কথন' থেকে শুরু করে কার্তিকের মহিষাসুর সংহার পযন্ত বহু কাহিনী শোনালেন। বনপর্বের আটচল্লিশটি অধ্যায় জুড়ে রয়েছে এই সব কাহিনী ও উপদেশ।"

"আটচল্লিশ অধ্যায়!" বিউটি বিস্মিত।

"হ্যাঁ।" সরকারদা বলেন, "একশ' চুরাশি থেকে দু-শ' একত্রিশ অ ্যায়। এবারে আমি তার পরের তিনটি অধ্যায় বলছি।"

"বেশ, বলুন।" বিউটি বেণী দুলিয়ে অনুমতি দেয়।

সরকারদা শুরু করেন, "এদিকে সত্যভামা কথায় কথায় দ্রৌপদীকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, পাণ্ডবদের তুমি এমন বশ করলে কেমন করে? ব্রত উপবাস স্নান মন্ত্র, কোন ওষুধ কিংবা কামশাস্ত্রের বশীকরণ বিদ্যায়? আমাকে একটু বলে দাও, যাতে আমিও কৃষ্ণকে বশ করতে পারি।

"পতিব্রতা দ্রৌপদী উত্তর করলেন—তুমি বুদ্ধিমতী, বিশেষতঃ কৃষ্ণের মহিষী, তোমার তো এমন প্রশ্ন করা উচিত নয়। কারণ কেবল অসৎ স্ত্রীরাই বশীকরণ বিদ্যার সাহায্য নেয়। যাক্ গে, আমাব কথা আমি তোমাকে বলছি, শোন। আমি কাম ক্রোধ ও অহংকার বিসর্জন দিয়ে সর্বদা সপত্নীদের সঙ্গে স্বামীসেবা করি। অভিমান ত্যাগ করে স্বামীদের প্রতি প্রণয় প্রকাশ করি। তাঁদের সঙ্গে কোনদিন কলহ করি না। কখনও দ্রুতপায়ে চলাফেরা কিংবা কুৎসিত ভাবে বসি না। শত সুন্দর হলেও স্বামী ছাড়া অন্য কোন মানুষ গন্ধর্ব, এমনকি দেবতাকে পর্যন্ত মনে স্থান দিই না। আমি সবদা

গুরুজনদের উপদেশ মনে রাখি। কখনও শাশুড়ীর নিন্দা করি না অসৎ রমণীদের মতো ব্যবহার কিংবা দুষ্টা স্ত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করি না। আমি সমস্ত গৃহকর্ম নিজেই করি। মহারাজ যুধিষ্ঠিব ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিদিন ব্রাহ্মণ ভোজন করাতেন, আমি তাঁদের পরিচর্যা করতাম। বাড়ির ঝি-চাকরদের দেখাশোনাও আমি নিজেই করতাম। আমি একা রাজকোষাগারের তত্ত্বাবধান করতাম। দিবা-রাত্রি সমান জ্ঞান করে ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে সহচরী করে আমি সর্বদা স্বামীদের আরাধনা করি। কখনও তাদের না খাইয়ে নিজে খাই না। কারণ পতিকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকাই স্ত্রীদের সনাতন ধর্ম।

"দ্রৌপদীর কথায় সত্যভামা বড়ই লজ্জা পেলেন। বললেন—তুমি বোধহয় আমার ওপর রাগ করছো। আমি কিন্তু কিছু মনে করে কথাটা বলি নি তোমাকে, এমনিই ঠাট্টা করেছি।

"দ্রৌপদী সহাস্যে বললেন—না না, রাগ করব কেন? তোমার কথায় আমি কিছুই মনে করি নি। যাক্ গে, এবারে স্বামীর চিত্ত অনুরঞ্জন ও আকর্ষণের জন্য কয়েকটি অব্যর্থ উপায়ের কথা বলছি। সেগুলি অনুসরণ করলে দেখবে তোমার স্বামী অন্য কোন নারীর দিকে তাকাবেন না পর্যন্ত।

"সত্যভামাও হেসে বললেন—বেশ, বলো।

"দ্রৌপদী বলতে শুরু করলেন—তুমি কৃষ্ণের প্রতি প্রতিদিন অকৃত্রিম-প্রণয় প্রকাশ করে তাঁর বেশভূষা, আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেবে। ঘরের বাইরে স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেই উঠে দাঁড়াবে এবং তিনি ঘরে ঢুকলে তাঁকে বসতে দিয়ে তাঁর সেবা করবে। তিনি দাস-দাসীকে কোন ফরমাস করলে তুমি নিজে সেই কাজ করে দেবে। স্বামী তোমাকে যে-সব কথা বলবেন, তা গোপনীয় না হলেও কাউকে প্রকাশ করবে না। সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে।

"—স্বামীর প্রিয়পাত্রের সেবা-যত্ন করবে, কিন্তু অন্য পুরুষদের

সামনে সংযত এবং মৌনী হয়ে থাকবে। প্রদ্যুম্ন এবং শাম্ব তোমার ছেলে হলেও স্বামীর অনুপস্থিতিতে কখনও তাদের সঙ্গে একত্রে বাস করো না। সর্বদা সত্যকুল ও পুণ্যশীলা নারীদের সঙ্গে সখ্যতা করবে এবং ক্রুর কলহপ্রিয় অতিভোজী অসৎ ও চপলাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করবে।

"দ্রৌপদী ও সত্যভামার কথাবার্তা শেষ হবার পরে শ্রীকৃষ্ণ কাম্যবন থেকে সস্ত্রীক দ্বারকা যাত্রা করলেন।"

"তারপরে মহাভারতে আমরা কখন আবার কৃষ্ণকে দেখতে পাই কাকু?" সরকারদা থামতেই বিউটি জিজ্ঞেস করে।

সরকারদা সহাস্যে উত্তর দেন, "এইবারে তোমার সেই দুর্বাসাকে জব্দ করবার কাহিনী। দুর্যোধনের অনুরোধে পাণ্ডবদের জব্দ করতে এসে দুর্বাসা নিজেই জব্দ হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।"

"বেশ, বলুন।" বিউটি উৎসাহিত।

সরকারদা বলে চলেন, "দশ হাজার শিষ্যসহ মহাযশাঃ দুর্বাসা কাম্যবনে এলেন। যুধিষ্ঠির ভাইদের সঙ্গে তাঁকে পরম আদরে বরণ করে করজোড়ে বললেন—আপনারা তাড়াতাড়ি স্নান ও আহ্নিক সেরে আসুন, ইতিমধ্যে রান্না হয়ে যাবে। রমণীরত্ন দ্রৌপদী বিপদে পড়লেন। ঘরে যে কিছুই নেই, কেমন করে তিনি এতগুলো মানুষের অন্ন জোগাড় করবেন! আর না করলেও তো কোন উপায় নেই। দুর্বাসা যে অত্যন্ত অবিবেচক ও ক্রুদ্ধ-স্বভাব।

"নিরুপায় কৃষ্ণা তখন কৃষ্ণকে স্তব করতে শুরু করলেন। বললেন —হে বিশ্বাত্মন, বিশ্বসংহারকারীণ বিপন্নপাল! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে বরেণ্য, হে অনন্ত, হে পরমারাধ্য পুরাণপুরুষ! আমি তোমার শরণাগত। তুমি আমাকে রক্ষা কর।

"অচিন্ত্যগতি ভক্তবৎসল বাসুদেবের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি পাশে ঘুমিয়ে-থাকা রুক্মিণীকে কিছু না বলেই দ্বারকা থেকে ছুটে গেলেন কাম্যবনে। দ্রৌপদী তাঁকে সব ঘটনা খুলে বলতে পারার

আগেই কৃষ্ণ বললেন—আগে আমাকে কিছু খেতে দাও, বড্ড খিদে পেয়েছে।

"দ্রৌপদী করুণকণ্ঠে বললেন—আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন তো আর কিছু নেই!

"কৃত্রিম রাগ করে কৃষ্ণ বললেন—দেখো, খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে, এখন হাসিঠাট্টা ভাল লাগছে না, শিগগীর কিছু খেতে দাও, আচ্ছা, তোমার এ টো থালাটা নিয়ে এসো দেখি।

"অসহায়া দ্রৌপদী চোখের জল ফেলতে ফেলতে সেই থালা এনে শ্রীকৃষ্ণের সামনে ধরলেন। থালার কোণে কয়েক কণা শাকান্ন শুকিয়ে ছিল। সখীসহায় শ্রীকৃষ্ণ সযত্নে সেই শাকান্ন মুখে দিয়ে বললেন—তোমার অন্নে বিশ্বাত্মা তুষ্ট হল। এখন মেজদাকে বল, ব্রাহ্মণদের খেতে ডাকুক।

"এদিকে দুর্বাসা ও তাঁর শিষ্যরা তখন সবে স্নান সেরে ঘাটে উঠেছেন। হঠাৎ তাঁদের মনে হল পেট ভরে গিয়েছে, ভীষণ খাওয়া হয়েছে। একসঙ্গে সবার ঢে কুর উঠতে থাকল।

"দুর্বাসা প্রমাদ গণলেন। ঢেকুর তুলতে তুলতে তিনি কোনমতে শিষ্যদের বললেন—এ যে দেখছি স্নান করেই পেট ভরে গেল। আর তো কিছু খেতে পারব না আজ। বনবাসী পাণ্ডবদের জব্দ করতে এসে তো ভারী বিপদে পড়ে গেলাম। ওরা ধার্মিক ব্রতধারী তপস্বী ও নারায়ণপরায়ণ। খাবার নষ্ট করার জন্য ওরা যদি একবার আমাদের প্রতি কোপ দৃষ্টিপাত করে, তাহলে যে আমরা ভস্ম হয়ে যাব। এসো আমরা এখান থেকেই পালিয়ে…"

সরকারদাকে থামতে হয়। বিউটি হো হো করে হেসে ওঠে।

বিউটির হাসি থামলে তিনি আবার বলতে থাকেন, "কাজেই ভীম নদীতীরে বহু খোঁজাখুঁজি করেও দুর্বাসা এবং তাঁর শিষ্যদের টিকি পর্যন্ত দেখতে পেলেন না। তিনি ফিরে এসে কৃষ্ণকে সশিষ্য দুর্বাসার অদৃশ্য হবার সংবাদ দিলেন।

"কৃষ্ণ তখন পাণ্ডবদের বললেন—তোমাদের বিপদ দেখে পাঞ্চালী আমাকে শরণ করেছিল, আমি তাই ছুটে এসেছি তোমাদের কাছে। দুর্বাসার থেকে আর তোমাদের কোন ভয় নেই। সে তোমাদের ত্বেজে ভয় পেয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। সে-প্রতিকুল অবস্থায় তোমাদের কখনও ভয় পাবার কারণ নেই। তোমরা ধর্মের অনুগত, অধর্ম কখনও তোমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। এখন তোমরা আমাকে বিদায় দাও।"

"তারপরই বোধহয় আমরা কৃষ্ণকে দেখতে পাই বিরাট রাজসভায় ?"

"হ্যাঁ।" সরকারদা কল্পনাদির প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেন, "আপনারা জানেন অজ্ঞাতবাসের সময় দ্রৌপদী ও পাণ্ডবরা বিরাট-রাজবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিরাটরাজার সেনাপতি কীচক সৈবিন্ধ্রিরূপী দ্রৌপদীর সতীত্বনাশের চেষ্টা করলেন। ভীম কীচক ও তার ভাইদের হত্যা করলেন।

"কীচক মারা গিয়েছে শুনে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার প্ররোচনায় দুর্যোধন সসৈন্যে ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা কর্ণ ও কৃপাচার্য প্রভৃতি সহ বিরাটরাজের গোধন অপহরণ করতে আসেন। বৃহন্নলাবেশী অর্জুন কৌরবদের পরাজিত করে বিরাটরাজার গোধন উদ্ধার করেন। পরিচয় পাবার পরে কৃতজ্ঞ বিরাটরাজ অর্জুনকে উত্তরার পানিগ্রহণ করবার অনুরোধ করলেন, কিন্তু অর্জুন সম্মত হলেন না। তিনি বললেন—আমি উত্তরার পিতৃতুল্য। সুতরাং আমার প্রথম পুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহ হবে।

"বিরাটরাজের দূতের কাছে সংবাদ পেয়ে বলরাম সুভদ্রা অভিমন্যু ও তাঁর ভাইদের এবং অন্যান্য যাদবদের নিয়ে বাসুদেব বিরাটনগরে এলেন। খবর পেয়ে দ্রুপদরাজ এবং কাশীরাজসহ পাণ্ডবদের আত্মীয়-স্বজনরাও অনেকেই সেখানে উপস্থিত হলেন। মহাসমারোহে উত্তরার সঙ্গে অভিমন্যুর শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হল।

"বিয়ের পরে পাণ্ডবদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য সেখানে সভা বসল। কৃষ্ণ প্রস্তাব করলেন—মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছেন। অতএব এখন যাতে দুর্যোধন তাঁকে অর্ধেক রাজত্ব ফিরিয়ে দেয় আমাদের সে চেষ্টা করা উচিত। আসুন, আমরা সন্ধি-প্রস্তাব সহ কোন ধার্মিক কুলীন ও প্রমাদশূন্য পুরুষকে দুর্যোধনের কাছে দূতরূপে প্রেরণ করি।

"বলরাম কৃষ্ণের প্রস্তাব সমর্থন করলেন। কিন্তু সাত্যকি এবং দ্রুপদ যুদ্ধঘোষণার পরামর্শ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্রুপদরাজকে বললেন—আপনি বয়সে ও জ্ঞানে সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনার পরামর্শ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। দ্রোণ ও কৃপাচার্য আপনার সখা, ধৃতরাষ্ট্রও আপনাকে যথেষ্ট মান্য করেন। আবার আপনি পাণ্ডবদের পরমাত্মীয়। আমাদেরও একই অবস্থা। আমাদের কাছে কৌরব ও পাণ্ডব উভয়েই সমান। সুতরাং একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে যাতে গৃহযুদ্ধ পরিহার করা যায়। তবে দুর্যোধন যদি একান্তই সন্ধিতে সম্মত না হয়, তাহলে যুদ্ধ করতেই হবে।

"দ্রুপদ তাঁর সভাপণ্ডিতকে দূতরূপে দুর্যোধনের কাছে পাঠাতে সম্মত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বজনসহ দ্বারকায় ফিরে এলেন।"

একবার থামলেন সরকারদা। একটু বাদে আবার বলতে থাকলেন, "এবারে আমি আপনাদের কাছে যে কাহিনীটি বর্ণনা করব, সেটি মহাভারতকার উদ্যোগ পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। ঘটনাটি ক্ষুদ্র হলেও অসামান্য, কারণ সেটি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ করে দিয়েছে। আমাদের কাছেও ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ সেটি যেখানে সংঘটিত হয়েছিল, আমরা আগামীকাল সেই দেব-রতি দ্বারকার পদার্পণ করব। যাক্‌গে, এবার মূল কাহিনীতে আসা-যাক্।

"বিরাটনগর থেকে দ্বারকাধীশ দ্বারকায় ফিরে এলেন। দুর্যোধনের কাছে দূত পাঠিয়েও পাণ্ডবরা কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। কারণ তাঁরা শুনেছিলেন, দুর্যোধন শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত

হচ্ছেন। অর্জুন তাই দ্বারকা রওনা হলেন। যথা সময়ে দুর্যোধন সংবাদ পেলেন, অর্জুন দ্বারকায় আসছেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ বায়ু-বেগশালী ঘোড়ায় চড়ে দ্বারকা রওনা হলেন।

"দুর্যোধন ও অর্জুন একই দিনে দ্বারকায় পৌঁছলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন নিদ্রাভিভূত।"

"কপট নিদ্রা।" দিদি মন্তব্য করেন।

"অনেকে তাই বলেন বটে।" সরকারদা উত্তর দেন, "কিন্তু মহা-ভারতে কপটতার কোন উল্লেখ নেই। মহাভারতকার বলেছেন, প্রথমে দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের শয়নগৃহে প্রবেশ করেন। তিনি নিদ্রামগ্ন বাসুদেবের মাথার কাছে প্রশস্ত আসনে উপবেশন করলেন। ধনঞ্জয় একটু পরে সেখানে এলেন। তিনি বিনীতভাবে যদুপতির পায়ের কাছে বসে রইলেন।

"কিছুক্ষণ পরে শ্রীকৃষ্ণের ঘুম ভাঙল। তিনি প্রথমে পার্থকে দেখলেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর আকস্মিক আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। অর্জুন বললেন—আমি তোমার সাহায্যপ্রার্থী।

"ঠিক তখুনি মাথার কাছ থেকে দুর্যোধন বলে উঠলেন—আমিও একই উদ্দেশ্যে তোমার কাছে এসেছি বাসুদেব! যদিও জানি তোমার কাছে আমরা দুজনেই সমান, কিন্তু আমি আগে এসেছি। সুতরাং আমার দাবী অগ্রগণ্য। সাধুরা প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন করেন। তুমিও আজ সেই সদাচার পালন কর।

"কৃষ্ণ বললেন—আপনি যে আগে এসেছেন, সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি অর্জুনকে আগে দেখেছি। তার ওপরে সে আপনার চেয়ে ছোট। সুতরাং তার কাছেই আমি প্রথমে সাহায্যের প্রস্তাব রাখব।

"তারপরে বাসুদেব সব্যসাচীকে বললেন—আমার সমযোদ্ধা এক অর্বুদ নারায়ণী-সৈন্য এক পক্ষ পাবে, অপর পক্ষ পাবে অস্ত্রহীন আমাকে। তুমি কাকে চাও?

"—তোমাকে। অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন।

"—আমি কিন্তু কখনই যুদ্ধ করব না! কৃষ্ণ অর্জুনকে মনে করিয়ে দেন।

"অকম্পিত কণ্ঠে অর্জুন উত্তর দেন—তাহলেও আমি তোমাকেই চাই।

"—বেশ, তবে তাই হোক্।

"অর্জুনের নির্বুদ্ধিতা দেখে দুর্যোধন পুলকিত হলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নারায়ণী সেনা-নিবাসের দিকে যাত্রা করলেন।

"দুর্যোধন চলে যাবার পরে কৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন—আমি যুদ্ধ করব না জেনেও তুমি আমাকে নিলে কেন?

"—কারণ তুমি সহায় হলে, আমি একাই কৌরবদের বিনাশ করতে পারব। আর নারায়ণ ও নারায়ণী-সেনার মধ্যে তো নারায়ণকেই গ্রহণ করা উচিত। এখন তুমি আমার সারথি হয়ে আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর।

"পার্থসারথি প্রসন্নকণ্ঠে বলে উঠলেন—তথাস্তু!"

॥ সাত ॥

সকালে ঘুম ভাঙল মতির মুখ দেখে। সে চা নিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসি। তাই তো, এ যে দেখছি সাড়ে ছ'টা বাজে!

তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ হাতে নিই। জ্ঞান জানলাটা খুলে দেয়। গাড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। সিঙ্গল লাইন, কাজেই উল্টোদিক থেকে একটা গাড়ি আসাব পবে আমাদের গাড়ি ছাড়ল।

পথের পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যে একটু পরিবর্তন এসেছে। গাছপালা শস্যক্ষেত্র সবই আছে, তবে লালমাটিতে বালির ভাগ বেড়েছে। শুধু বালি নয়, তার সঙ্গে পাথরও মিশে রয়েছে।

কিছুক্ষণ বাদেই আমি দ্বারকা পৌঁছচ্ছি। আমার বহুকালেব বাসনা পূর্ণ হবে আজ। গঙ্গা থেকে গোমতী বহুদূর। বাসনা থাকলেই তীর্থদর্শন হয় না। তার জন্য সময় সুযোগ এবং অর্থের প্রয়োজন। সবই যখন জোগাড় হল, তখন সহসা শান্ত গুজরাট অশান্ত হয়ে উঠল—শুরু হল রাজনৈতিক আন্দোলন। অনেক ভাবনা-চিন্তাব পরে রওনা হলাম। ঠিক ছিল দোল-পূর্ণিমার দিনে আমরা মন-দ্বারকায় পৌঁছব। কিন্তু কয়লায় অভাবে গাড়ি বাতিল হয়ে যাওয়ায় পথে দেরি হয়ে গেল। শেষ বাধা এলো শ্রীর অসুখ। সব বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে এসেছি।

কিছুক্ষণ পরেই আমরা দ্বারকা পৌঁছব। সহযাত্রীরা যে-যার গোছগাছ করছেন। স্নানের কাপড়-চোপড় ও পুজোর জিনিসপত্র বের করছেন। আমার কোন আয়োজনের প্রয়োজন নেই, আমি শুধু দ্বারকাধীশকে দর্শন করতে এসেছি, মন-দ্বারকার ধূলি মাথায় মাখতে এসেছি। মনে মনে তাই দ্বারকার কথাই ভাবতে থাকি।

শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, হরিবংশ ও মহাভারত প্রাচীন গ্রন্থে দ্বারকার কথা আছে। দ্বারকা-মাহাত্ম্যে

বলা হয়েছে শর্যাতি নামে জনৈক চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। উত্তানবর্হি, আনর্ত ও ভূরিসেন নামে তাঁর তিন ছেলে ছিল। শর্যাতি ছিলেন বড়ই দাম্ভিক এবং নাস্তিক। বড় এবং ছোট ছেলে বাবার স্বভাব পেলেও মেজ ছেলে আনর্ত ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। কথায় কথায় তিনি একদিন পিতাকে বললেন—আপনি রাজা হলেও রাজ্য আপনার নয়।

—কার তাহলে? ক্রুদ্ধ পিতা প্রশ্ন করলেন।

ভক্ত-পুত্র নির্ভয়ে উত্তর দিলেন—ভগবানের।

পুত্রের এই অবাধ্যতা বরদাস্ত করলেন না অহংকারী পিতা। তিনি তৎক্ষণাৎ আনর্তকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

সহায়-সম্বলহীন আনর্ত হাঁটতে হাঁটতে সাগর-সৈকতে উপস্থিত হলেন। তিনি বৈকুণ্ঠপতিকে স্মরণ করতে থাকলেন।

ভক্তের ভগবান তখন বৈকুণ্ঠ থেকে শতযোজন ভূখণ্ড উৎপাটিত করে ভীমানাদি সাগরে স্থাপন করলেন। মর্ত্যের সেই বৈকুণ্ঠই করুণাময় কৃষ্ণের দ্বারকা। আমরা আজ সেখানেই চলেছি। কিন্তু আমাদের কথা থাক্, দেবদত্ত-দ্বারকার পুণ্য কথাই ভাবা যাক্।

আনর্ত ও তাঁর বংশধরগণ বহুকাল সুখে রাজত্ব করেন এখানে। কথিত আছে, আনর্তের এক ছেলের নাম ছিল রেবত। তাঁর নাম থেকেই রৈবতক পাহাড়ের নাম হয়। অনেকে অবশ্য বলেন, বলরামের স্ত্রী রেবতীর নামানুসারে রৈবতক পাহাড়ের নাম হয়েছে। যে-কারণেই নামকরণ হয়ে থাক্, মহাভারতে বহুবার রৈবতক পাহাড়ের উল্লেখ আছে। সেযুগে যাদবদের শৈলাবাস ছিল রৈবতক। পণ্ডিতরা বলেন একালের গির্নার পাহাড়ই সেকালের রৈবতক। জুনাগড় শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত গির্নার পাহাড় হিন্দু ও জৈনদের একটি পবিত্রস্থান। কেউ-বা বলেন, রেবতই নাকি কুশস্থলী নগরী নির্মাণ করেন। পরে পুণ্যজন রাক্ষস কুশস্থলী অধিকার করলে আনর্তের বংশধরগণ কুশস্থলী ত্যাগ করেন।

কারও মতে, বৈবস্বত মনুর প্রপৌত্র রেবত কুশস্থলী নগরীর পত্তন

করেন। আবার অনেকে বলেন বৈবস্বত মনুর পুত্র সূর্যবংশীয় প্রথম রাজা ইক্ষাকুর ভাগনে আনর্ত এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। পরশুরাম দশগোত্রীয় ব্রাহ্মণ এনে সেখানে বসতি স্থাপন করিয়েছিলেন। আর সেই নগরী ছিল সোনার তৈরি।

জরাসন্ধের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে কৃষ্ণ যখন নতুন নগরী নির্মাণের কথা ভাবছিলেন, তখন গরুড় তাঁকে জনহীন কুশস্থলীর সন্ধান দেন। কৃষ্ণ কুশস্থলীতে প্রাচীন দুর্গের সংস্কার সাধন এবং অসংখ্য দ্বারযুক্ত প্রাচীর নির্মাণ করেন। তাই তখন কুশস্থলীর নাম হয় দ্বারাবতী বা দ্বারকা।

শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণু-পুরাণে কুশস্থলীকে আনর্ত রাজ্যের রাজধানী বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে দ্বারকার প্রাচীন নাম কুশস্থলী।

হরিবংশমে কুশস্থলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—কুশস্থলী অতিশয় রমণীয় ও সুরক্ষিত স্থান। নগরীর চারিদিকে সাগর, তারপরে সোনার প্রাচীর, সুতরাং দেবগণেরও দুর্ভেদ্য। সেখানে নানাবিধ ফল-ফুল জন্মায় এবং সব রকমের রত্নখনি রয়েছে। নগরীতে বহু লোক বাস করেন। বড় বড় বাড়ি, বিচিত্র প্রাঙ্গণ, মনোহর রাজপথ, বিপুল তোরণ ও রমণীয় গোপুরম প্রভৃতি সবই রয়েছে সেখানে। রাজপথে দিবারাত্র হাতি ঘোড়া রথ এবং পথচারী যাতায়াত করে। নগরীর নিকটেই অনিন্দ্যসুন্দর রৈবতক পাহাড়।

বিভিন্ন পুরাণ এবং মহাভারতে বলা হয়েছে যে, যাদবগণ বেশিদিন দ্বারকায় রাজত্ব করতে পারেন নি। কারণ গান্ধারীর শাপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মাত্র ছত্রিশ বছর পরে যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যায়। তখনি তিরানব্বুই বছর বয়সে শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্যলীলা সংবরণ করেন এবং সমুদ্র দ্বারকাকে গ্রাস করে।*

* শ্রীমদ্ভাগবতের মতে (একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ) অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ ১২৫ বছর মর্ত্যলোকে প্রকট ছিলেন এবং তিনি যেদিন অন্তর্ধান করেন, সেদিন থেকেই কলিযুগের আরম্ভ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ৫২০১ বছর আগে (১৯৭৫ খ্রীঃ) আবির্ভূত

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা কোথায় ছিল, সে সম্পর্কে আজও কোন সঠিক সিদ্ধান্ত হয়নি। কারও মতে সে দ্বারকা ছিল বর্তমান গুজরাটের আমরেলী জেলার কোড়িনার তালুকে। আবার জনৈক গবেষক দাবী করেছেন, তিনি বিমান থেকে বর্তমান দ্বারকার উপকণ্ঠে সমুদ্রের মধ্যে প্লাবিত প্রাচীন দ্বারকাকে দেখতে পেয়েছেন। কেউ বা বলেছেন —বর্তমান দ্বারকার মাটির নিচেই রয়েছে প্রাচীন দ্বারকা। সমুদ্র তীরের অসংখ্য বালিয়াড়ি শহরের তিনদিকে সমুদ্রের বেষ্টনী এবং গোমতীর সংকীর্ণতাকে তাঁরা তাঁদের যুক্তি হিসাবে পেশ করেছেন। বলেছেন—যদি এখানেই দ্বারকা না হবে তাহলে শঙ্কর ও রামানুজের মতো আচার্যরা, কবীর নানক ও বিবেকানন্দের মতো সন্ন্যাসীরা এবং নরসিংহ মেহতা ও মীরাবাঈ-এর মতো ভক্তরা কেন এখানে আসবেন? কেন তাঁরা বলবেন, এই সেই দ্বারকা?

এঁদের বক্তব্যকে কিন্তু কোনমতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ ইদানিং খনন করে বর্তমান দ্বারকার প্রায় চল্লিশ ফুট মাটির নিচে বালি ও পলিমাটি মিশ্রিত বাড়িঘরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। সেইসব বাড়ির দেওয়াল ও মেঝেতে চূণাপাথর ব্যবহার করা হয়েছিল।

খননকার্যের সময় চীনামাটির বাসনপত্রের টুক্‌রো পাওয়া গিয়েছে। কাজেই মনে হয়, সেকালের দ্বারকার সঙ্গে রোমের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। এই খননকার্যের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, খ্রীস্টজন্মের বহু পূর্বে দ্বারকা একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। আর সম্ভবতঃ গোমতীর একটি দ্বীপে সেই নগরীর অবস্থিতি ছিল। পরে গোমতী মজে যাওয়ায় দ্বীপটি মূল-ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে।

অনেকে অবশ্য মনে করেন, যে কারণেই হোক্ সেই প্রথম দ্বারকা

হয়েছিলেন। ভাগবতের মতে শ্রীকৃষ্ণের মহাজীবনের প্রথম ১১ বছর বৃন্দাবন-লীলা। ১১ থেকে ২২ বছর পর্যন্ত মথুরালীলা এবং ২৩ থেকে ১২৫ বছর দ্বারকালীলা। কিন্তু আধুনিক গবেষকগণ এই বক্তব্য মেনে নেন নি।

ধ্বংস হয়ে যায়। তারপরে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শতকে কচ্ছ উপসাগরের বারাকে (Bareke) দ্বীপে দ্বিতীয় দ্বারকার পত্তন হয়। সেই নগরীর সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের দেশসমূহের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। চতুর্থ দশকে সে দ্বারকাও ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁদের মতে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শতাব্দীতে বর্তমানের এই তৃতীয় দ্বারকার পত্তন হয়েছে।

ব্রেকফাস্ট এসে গিয়েছে, সুতরাং ভাবনা থামাতে হল। অনেকেই অবশ্য খাবার নিলেন না। রণছোড়জীকে দর্শন না করে তাঁরা জল গ্রহণ করবেন না। আমি ভক্তিহীন দর্শক, সুতরাং জ্ঞানের হাত থেকে থালাখানি হাতে নিই।

একটা স্টেশনে গাড়ি থামল। নাম লেখা রয়েছে ওখামাটি।

এখান থেকে দ্বারকা ২২ কিলোমিটার। তাহলেও মনে হচ্ছে আমরা আরব সাগরেব খুব কাছে চলে এসেছি। সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি না বটে, সামনে একটা পাহাড় রয়েছে। তবে বেশ বোঝা যাচ্ছে পাহাড়টার ওপারেই সাগর। খাল কেটে সাগরের জল এনে এখানে নুনের কারখানা করা হয়েছে এখন সকাল সওয়া আটটা তার মানে ট্রেন একঘণ্টা লেট।

মৃদুমন্দ বেগে গাড়ি চলেছে। লাইনের ধারে কাঁটাবন আর লালমাটির রুক্ষ প্রান্তর। আরেকটা স্টেশন এল, নাম গোরিঞ্জা।

গাড়ি চলছে, কিন্তু কেন যে এত আস্তে আস্তে চলছে বুঝতে পারছি না।

আমরা রেলে চেপে দ্বারকা চলেছি, কিন্তু মোটর কিংবা জাহাজে চড়েও দ্বারকা আসা যায়। এখান থেকে নিয়মিত বাস যায় জামনগর পোরবন্দর এবং ওখা। সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর জাহাজ সপ্তাহে একবার করে বম্বে থেকে ওখা যাতায়াত করে। তবে দ্বারকায় কোন বিমানক্ষেত্র নেই। নিকটতম বিমানক্ষেত্র জামনগর—দূরত্ব ১৮০ কিলোমিটার।

আবার গাড়ি থামল, আরেকটা স্টেশন। নাম বরাদিয়া। টাইম টেবল নেই, ম্যানেজারকেও দেখতে পাচ্ছি না। জানা দরকার এমনি অপ্রয়োজনীয় আরও কতগুলো স্টেশনে থামতে হবে আমাদের এবং দ্বারকা আর কতদূর?

ওটা কি? ঐ যে সীমাহীন সাদা! সমুদ্র কি? হ্যাঁ, তাই তো! সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। তাহলে কি দ্বারকা এসে গেল?

গাড়ির অপর প্রান্তে ম্যানেজারের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, "দ্বারকা এসে গেছে। বলুন—রণছোড়জী কি…।"

সারা গাড়ি গর্জে ওঠে—"জয়।"

"বলুন—দ্বারকাধীশ কি…।"

"জয়।"

"বলুন—কৃষ্ণ ভগবান কি…"

"জয়।"

জয় জয় আর জয়। শুধু আমাদের গাড়ি নয়, সমস্ত ট্রেনটাই জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে। ট্রেন থেমেছে দ্বারকায়।

আমি মন-দ্বারকার মাটিতে মাথা ঠেকাই—'দেবগদি' দ্বারকা—স্বর্গের সিংহাসন দ্বারকা।

ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মধ্যবয়সী জনৈক দীর্ঘকায় ব্যক্তি ছুটে আসেন আমাদের কাছে। দু'হাত জোড় করে বিনীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, "পাঁচুবাবু কোথায়?"

বলি, "গাড়িতে রয়েছেন। এখুনি নামবেন। আপনি…"

ভাঙা ভাঙা বাংলায় ভদ্রলোক উত্তর দেন, "আমি পাণ্ডা। আমার নাম মণিলাল জীবরাজ ভট্ট। আসলে আমরা ভট্টাচার্য। দু' পুরুষ ধরে এখানে রয়েছি। শুধু বাঙালীদের তীর্থ দর্শন করাই। আমাদের আদি-নিবাস নদীয়া।"

স্টেশনটি বড় নয়। একটি প্লাটফর্ম। শহরের একপ্রান্তে রেল-স্টেশন। লোকালয় একটু দূরে বলে মনে হচ্ছে।

ম্যানেজার সদলবলে গাড়ি থেকে নেমে আসে। চীৎকার করে বলতে শুরু করে, "ঠাকুরমা-দিদিমা, মাসি-পিসী, দাদা-বৌদি, মামা-কাকা ও বাবারা! আমরা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় এসে গিয়েছি। এখন আমরা টাঙ্গায় চড়ে গোমতীতে স্নান করতে যাব। সেখান থেকে যাব রণছোড়জীর মন্দিরে। দর্শন করে ফিরে আসব গাড়িতে। খাওয়া-দাওয়ার পর আবার টাঙ্গায় করে রুক্মিণী মায়ের মন্দির, সিদ্ধেশ্বর মহাদেব, ভদ্রকালী, গোবর্ধনজী, দামোদরজী, মীরাবাঈ ও নরসিংহ মেহতার মন্দির এবং গান্ধীঘাট দর্শন করতে বের হব।"

টাঙ্গা এগিয়ে চলেছে। দ্বারকার পথ। কত অসংখ্যবার হয়তো এই পথ দিয়ে কৃষ্ণ আসা-যাওয়া করেছেন। এসেছেন রুক্মিণী ও সত্যভামা, অর্জুন ও সুভদ্রা—আরও অনেকে। আজ আমি এসেছি। আমি ধন্য। আমি আজ মন-দ্বারকার পথিক।

দ্বারকার কথাই ভেবে চলি—দ্বারকা বিষ্ণুতীর্থ। কিন্তু শৈবতীর্থ হিসাবেও এর স্বীকৃতি রয়েছে। শিব-পুরাণের মতে নাগেশ শিব হলেন দ্বারকার জ্যোতিলিঙ্গ। তবে বৈদিক যুগে দ্বারকার নাম তীর্থ হিসাবে পাওয়া যায় না। এমন কি মহাভারতের যুগেও দ্বারকা তীর্থ রূপে স্বীকৃত ছিল না। আর তাই পাণ্ডবরা তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে প্রভাসে এসেও দ্বারকায় আসেন নি।

দ্বারকা বর্তমানে ওখামণ্ডল তালুকের সদর। সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপের পশ্চিমপ্রান্তে আরব সাগরের তীরে অবস্থিত এই নগরী, বীরামগাম-ওখা মিটারগেজ রেলপথের একটি স্টেশন। দূরত্ব আমেদাবাদ থেকে ৩৭৮ কিলোমিটার ও জেলাসদর জামনগর থেকে ১৩৭ কিলোমিটার। ২২°২২´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৬৯°০৫´ পূর্ব দ্রাঘিমায় গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে গড়ে উঠেছে শহরটি। যদিও ভূগোলবিদরা বলেন এটি মূল-গোমতী নয়, তার একটি খাঁড়ি। মূল-গোমতী প্রায় দশ কিলো-মিটার দূর দিয়ে প্রবাহিত। এই খাঁড়িটি সেই নদী থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে একেও সবাই গোমতী বলেন।

অনেকের মতে দ্বারকা নামটি এসেছে দ্বার শব্দ থেকে। প্রাচীন কালে এটি একটি সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। আর সেই বন্দরই ছিল ভারতের পশ্চিম প্রবেশদ্বার। দ্বারকা বহুবার জলদস্যুদের শিকার হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও এখানে ওয়াঘের জলদস্যুদের অত্যাচার ছিল। ফলে দ্বারকাকে দ্বারামতী বা দ্বারাবতী অর্থাৎ দ্বার-নগরীও বলা হয়।

দ্বারকা শুধু শঙ্করাচার্যের চারধামের অন্যতমা নয়, প্রাচীন ভারতের সপ্তপুরীর অন্যতমাও বটে। অপর ছ'টি পুরী হল—বারাণসী মথুরা হরিদ্বার অযোধ্যা উজ্জয়নী ও কাঞ্জিভরম।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী দ্বারকা দর্শন করতে আসেন। এই আসা কবে থেকে শুরু হয়েছে জানি না, কিন্তু জানি—এ আসার শেষ নেই। যতদিন জগৎ থাকবে, ততদিন দ্বারকার পথ আমার মতো শত-সহস্র পুণ্যার্থীর প্রবাহে প্রতিদিন মুখরিত হয়ে থাকবে। আর তাই ব্রিটিশ সরকার ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে ওখামণ্ডল বরোদার গাইকোয়াড়কে উপহার দিয়েছিলেন। ১৯৪৯ সাল অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি পর্যন্ত দ্বারকা বরোদা রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল ১৯৪৯ সাল থেকে। দ্বারকা জামনগর জেলার একটি শহর।

বড় শহর নয়। আয়তন মাত্র ৪২·০৭ বর্গ কিলোমিটার। ৩,০৪৪টি বাড়ি ও ৩,১২৩টি পরিবার নিয়ে শহর। ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী দ্বারকার স্থায়ী জনসংখ্যা মাত্র ১৭,৮০১ জন। তাঁদের মধ্যে ৯,১৮৫ জন পুরুষ ও ৮,৬১৬ জন নারী।

বাড়িগুলির মধ্যে অবশ্যি বেশ কয়েকটি ধর্মশালা রয়েছে। রয়েছে একটি হাসপাতাল এবং হাই স্কুল। এখানে পাশ্চাত্য ঢঙের কোন হোটেল নেই, তবে চারটি দিশী হোটেল রয়েছে। আর আছে রেলওয়ে রিটায়ারিং-রুম জেলা বোর্ড ও নির্মাণ বিভাগের বিশ্রাম-ভবন।

পথের ডানপাশে দেওয়াল-ঘেরা বিরাট একটা কারখানা। পাণ্ডাজীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, আমার অনুমান সত্য—

এটাই এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানী। শুনেছি এ অঞ্চলে সিমেণ্ট তৈরির প্রধান উপকরণ বেল্‌টোনাইট্‌ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। স্থানীয়রা বেল্‌টোনাইট্‌কে বলেন—মগমাটি।

মনে পড়ছে চেরাপুঞ্জির নিকটবর্তী মেঘালয় সরকারের মাম্‌লু (Mawmluh) সিমেণ্ট কারখানার কথা। দ্বারকা ভারতের পশ্চিম-সীমা আর মাম্‌লু পূর্বপ্রান্ত। দু-য়ের মাঝে দূরত্ব যা-ই হোক্‌, দু-জায়গাতেই প্রচুর পরিমাণে বেল্‌টোনাইট্‌ পাওয়া যায়। আর তারই ফলে ভারতের দুই প্রান্তে গড়ে উঠেছে দুটি সিমেণ্ট তৈরির কারখানা। ব্যাপারটা বিস্ময়কর বৈকি !

পাণ্ডাজীকে আবার জিজ্ঞেস করি, "দ্বারকার প্রধান উৎসব কি কি ?"

"অন্নকুট, হোলি, ফুলদোল ও জন্মাষ্টমী।"

হেসে বলি, "একটিও তো শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলা নয়, সব ক'টিই যে তাঁর ব্রজলীলা।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" পাণ্ডাজী সবিনয়ে স্বীকার করেন। বলেন, "অন্নকুট হল আমাদের নবান্ন। নতুন ফসল দিয়ে প্রথম দ্বারকানাথের পুজো করা হয়। আর সেদিন থেকেই শুরু হয় আমাদের নববর্ষ। রণছোড়জীর মন্দিরে রঙ খেলে হোলি আরম্ভ হয়। ভজন গান উৎসবের প্রধান অঙ্গ।

"জন্মাষ্টমীতে কেমন আনন্দ হয় ?"

"জন্মাষ্টমী মথুরার উৎসব হলেও দ্বারকায় সেদিন খুবই আনন্দ হয়। বহু পুণ্যার্থী তখন এখানে আসেন। রাতে দ্বারকাধীশ মন্দিরে মহাসমারোহে কৃষ্ণ ভগবানের জন্মোৎসব পালিত হয়। সেই উৎসবের ধারাবিবরণী আকাশবাণীর রাজকোট কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়।"

একটু থামেন পাণ্ডাজী। তারপরে আবার বলেন, "আমাদের এখানে কিন্তু শিবরাত্রি এবং ভীম-একাদশীতেও মহোৎসব হয়।"

"আচ্ছা, দ্বারকা দর্শনের শ্রেষ্ঠ সময় কখন ?"

"শীতকালে মানে নভেম্বর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে। গ্রীষ্মকালে বেশ গরম পড়ে দ্বারকায়।'

"কি রকম বৃষ্টি হয় এখানে ?"

"খুবই কম। ফলে দ্বারকায় জলাভাব লেগেই আছে।"

স্টেশন থেকে রওনা হয়ে শহরের ভেতর দিয়ে পথ চলে প্রায় দু-কিলোমিটরে এসে টাঙ্গা থামল। খানিকটা দূরে বাড়ি-ঘরের পেছনে মন্দিরচূড়া দেখা যাচ্ছে। শুনেছি মন্দিরটি সাততলা এবং একশ' ষাট ফুট উঁচু। ছাপ্পান্ন ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে মূল-মন্দিরে উঠতে হয়। চূড়ায় শিখর-কলশ ও লাল বর্ডার দেওয়া দ্বারকাধীশেব পতাকা সগর্বে উড়ছে। আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম করি।

পাণ্ডাজীর পেছনে পেছনে ছোট গলি পেরিয়ে আমরা সাগরতীরে আসি। বাঁধানো পথ থেকে নেমে আসি বেলাভূমিতে। বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চলি। সামনে খানিকটা দূরে উত্তরদিকে বন্দর দেখা যাচ্ছে। দূরত্ব এখান থেকে প্রায় দু-কিলোমিটার। কিছুদিন আগে বন্দরটির আমূল সংস্কার সাধন করা হয়েছে। দ্বারকা বন্দরের বর্তমান নাম রূপেন। দূরত্ব এখান থেকে প্রায় দু-কিলোমিটার। খুব প্রাচীন হলেও, বন্দর এখন মোটেই বড় নয়। কারণ এখানে জল খুবই কম। জাহাজকে বহু দূরে থাকতে হয়। বন্দরের প্রধান রপ্তানি কাঠ ও মাছ।

আমরা কিন্তু সাগরতীরে এসেও সাগরজলে স্নান করলাম না। পাণ্ডাজীর পেছনে বালি ভেঙে হেঁটে চললাম বাঁদিকে—গোমতীর তীরে। খানিক এগিয়ে বাঁদিকে একটি ছোট মন্দির। মন্দিরের মেঝে বেলাভূমি থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে। পাণ্ডাজী জানালেন—সঙ্গম নারায়ণের মন্দির।

গোমতীর তীরে এলাম। এখানেও দুটি ছোট ছোট মন্দির রয়েছে। পাণ্ডাজী জানালেন, "সত্যনারায়ণ ও নৃসিংহদেবের মন্দির। আর এই গোমতীর ওপারেই পঞ্চতীর্থ—পাঁচটি স্বাদু জলের ঝরণা।"

জামা খুলে জলে নামি—গোমতীর পুণ্যসলিলে অবগাহন করি। গঙ্গাতীরের মানুষ আমি, এসেছি গোমতীর তীরে। বহুকালের বাসনা পূর্ণ হল। আমি আজ রণছোড়জীকে দর্শন করব।

পুণ্যতীর্থেব এই পুণ্যধারা যতই প্রাচীন ও পবিত্র হোক্, এখন কিন্তু দ্বারকার গোমতী নামেই নদী। আর তাই হয়তো ইংরেজরা একে খাঁড়ি বলেছেন। সেকালের গোমতী মজে গিয়ে একালে খাঁড়ি হয়েছে। সেকালে নাকি গোমতী ছিল দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত এক সুবিশাল নদী। আগেই বলেছি, তারই এক দ্বীপে ছিল শ্রীকৃষ্ণের দ্বাবকা। এখন নদী মজে যাওয়ায় দ্বীপটি মূল-ভূখণ্ডের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

গোমতী মোটেই গভীব নয়, তাব ওপবে নোনা জল এবং এখন ভাঁটা চলছে। তাহলেও বেশ কিছুক্ষণ ধরে অবগাহন করি। দাদা তা বীতিমত সাঁতাব কাটছেন। কে বলবে বাহাত্তুরে বুড়ো! বরিশালেব বাঙ্গাল, জল পেয়ে বয়সেব কথা ভুলে বসে আছেন।

স্নান করে উঠে আসি পাড়ে—বাঁধানো পাড়ে। স্নানার্থীদের সুবিধাব জন্য এখানে খানিকটা জায়গা বাঁধিযে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মেয়েদেব কাপড় বদল করবাব জায়গা ঘিবে দেওয়া হয় নি। কেন, তা কর্তৃপক্ষই বলতে পাবেন। একে শত শত লোক স্নান কবছেন, তার ওপরে প্রবল বাতাস বইছে। কাজেই মেয়েদের পক্ষে এখানে সম্ভ্রম বাঁচিয়ে বেশ পরিবর্তন অসম্ভব। অথচ লজ্জা-সরমের মাথা খেয়েও তাদেব সে কাজটি শেষ করতে হল।

স্নান শেষে সারি বেঁধে মন্দিরে চলেছি—বণছোড়জীর মন্দিরে। পাণ্ডাজী 'লীড' করছেন, ডেপুটি-লীডার পাঁচু। সে বাঁশি বাজাচ্ছে মাঝে মাঝে। এ অধিকার তার অবশ্যই আছে। একে সে আমাদের ম্যানেজার, তার ওপরে ওর পুরো নাম পাঁচুগোপাল দে। অনেকে নাকি ওকে শুধু গোপাল বলেই ডাকেন। গোকুলের গোপালই তো বৃন্দাবনের মুরলীধর, আবার তিনিই এই দ্বারকায় এসে রণছোড়জী।

যে-পথে এসেছিলাম সে-পথে ফিরে যাচ্ছি না কিন্তু। এখন চলেছি পাণ্ডাজীর বাড়িতে। ভিজে কাপড় ও জুতো সেখানে রেখে মন্দিরে যাব।

সংকীর্ণ বাঁধানো পথ। গলি বলাই ঠিক হবে। দু'পাশেই বাড়ি-ঘর। জনৈকা যুবতী জল নিয়ে চলেছে। একটি বা দুটি নয়, চার ঘড়া জল। একটির ওপরে আরেকটি সাজিয়ে ঘড়াগুলো মাথায় নিয়েছে। দু'হাত দুলিয়ে দুলকি চালে ঘরে ফিরছে। বিস্ময়কর ব্যালান্স।

শুধু ব্যালান্স নয়, সত্যি কথা বলতে কি মেয়েটিকেও না দেখে পারছি না—মেয়েটি প্রকৃত সুন্দরী। সৌরাষ্ট্রের নারীদের সৌন্দর্য-খ্যাতি সুপ্রাচীন। পুরাণে বলা হয়েছে—

'সৌরাষ্ট্রে পঞ্চরত্নানি নদী নারী তুরঙ্গমাঃ।
চতুর্থং সোমনাথশ্চ পঞ্চমং হরিদর্শনম্॥'

সৌরাষ্ট্রে পাঁচটি রত্ন রয়েছে, নদী নারী অশ্ব সোমনাথ এবং হরিদর্শন।

আমরা সৌভাগ্যবান। সৌরাষ্ট্রের নদীতে স্নান সেরে হরিদর্শনে যাবার পথেই তার নারীবত্নের সৌন্দর্য সন্দর্শনের সুযোগ লাভ করলাম।

ভিজে জামা-কাপড়, জুতো ও ক্যামেরার কেস পাণ্ডাজীর বাড়িতে রেখে আমরা মন্দিরে চলেছি। যথারীতি উকিলবাবু সেখানেই রয়ে গিয়েছেন। উনি তীর্থে এসেও মন্দিরে যান না। সঙ্গে স্ত্রী রয়েছেন। তাঁর দর্শনেই নাকি উকিলবাবুর দর্শন হয়ে যায়। কবি বলে গিয়েছেন 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য', আর এবারে যাত্রায় বেরিয়ে দেখতে পেলাম—সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য।

তবে কবির সঙ্গে উকিলবাবুর কিছু পার্থক্য আছে। তাঁর রণছোড়জী অদর্শনের কারণ খরচ কমানো নয়। তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এসেছেন এবং এজন্য কুণ্ডু স্পেশালকে তাঁর পুরো টাকা দিতে হয়েছে। সুতরাং কবির সিদ্ধান্ত উকিলবাবুর ক্ষেত্রে অচল।

উকিলবাবুর মন্দির দর্শন না করার কারণ যা-ই থাক্, স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আসার কারণটা বুঝতে পারছি। মিসেস উকিল অতিশয় স্থূলকায়া। যে কোন কর্তব্যপরায়ণ স্বামীর পক্ষেই এমন স্থূলাঙ্গী স্ত্রীকে একাকিনী ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

সেকালেও শুনেছি গোমতীতে স্নান সেরে দর্শন যেতে হত। তবে তখন স্নানেব জন্য সামন্তদের সোয়া চাব টাকা এবং পাণ্ডাদের সাড়ে তিন টাকা দক্ষিণা দিতে হত। মন্দির জাতীয়করণের পর যাত্রীরা সেই ব্যয়ভার মুক্ত হয়েছেন।

সেকালের মতো একালেও অবস্থাপন্ন ভক্তরা দ্বারকায় এসে ব্রাহ্মণ-ভোজন করিয়ে থাকেন। অনেকে দরিদ্রদের কাপড় ও কম্বল বিতরণ করেন।

একালেও সেকালেব মতো গায়ে ছাপ দেবার নিয়ম রয়েছে। পদ্মাকৃতি কিংবা গোলাকার এক টুক্‌রো লোহা গরম করে যাত্রীদের ইচ্ছামত শরীবের কোন অংশে চেপে ধরা হয়। সুদৃশ্য ফোস্কাটি দ্বারকা দর্শনের নিদর্শনরূপে ভক্তের অঙ্গে চিরস্থায়ী হয়ে থাকে।

একালেও স্বচ্ছল যাত্রীরা রণছোড়জীকে রঙীন পোশাক উপহার দেন। শুনেছি মন্দির-সংলগ্ন বাজারে রণছোড়জীর পোশাক কিনতে পাওয়া যায়। সরকার মন্দির অধিগ্রহণ করার পরে কি অবস্থা বলতে পারব না, তবে আগে যাত্রীদের কিনে দেওয়া পোশাক রণছোড়জীর গায়ে বড় একটা উঠত না। ফিরে যেত দোকানদারের কাছে। আবার পরদিন হয়তো কোন যাত্রী সেই পোশাকটিকেই কিনে নিয়ে আসতেন।

গোমতীর তীর মন্দির থেকে তেমন দূরে নয়, তাহলেও কয়েক মিনিট হাঁটতে হয়েছে আমাদের। অথচ ১৯০৮ সালে প্রকাশিত 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার'-এ পড়েছি—'…temple of Dwarkanath is built on the north bank of Gomti…'

তাহলে কি মাত্র ছেষট্টি বছর আগেও গোমতী এমন মজে যায়

নি ? তখনও কি গোমতীর পুণ্যধারা দ্বারকাধীশ মন্দিরের পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হত ?

হয়তো হবে। ভারতের বহু মজে-যাওয়া নদীই তো গত শতকে নাব্য ছিল। আর নদীমাতৃক দেশে এই মজে-যাওয়া নদীগুলো এখন পরিণত হয়েছে স্থায়ী অভিশাপে। ভারতের প্রধান নদীগুলোকে নাব্য করে তুলতে পারলে শুধু যে বন্যারোধ এবং পরিবহণের উন্নতি হবে তাই নয়, সেই সঙ্গে আমরা লক্ষ লক্ষ একর পলিময় ভূখণ্ড উদ্ধার করতে পারব।

কাজটা কঠিন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেকালে ভগীরথ হাতুড়ি-বাটালি এবং কোদাল ও খন্তা দিয়ে যা পেরেছেন, একালে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে আমরা তা পারব না কেন ?

স্থাপত্যকলার বিচারে জগৎ-মন্দিরের গড়নটা সাধারণ হিন্দু-মন্দিরের মতই। কেবল কারুকার্যটা শুনেছি বাইরের দিকে—সারা মন্দির জুড়ে। ভেতরের দেওয়ালে কোন কারুকায নেই। এবং কোন অহিন্দু মন্দিরে ঢুকতে পারেন না।

পথ থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে আমরা মন্দির-তোরণে এলাম। তোরণের ঠিক ওপরে সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রতিমূর্তি—আমরা প্রণাম করি।

তোরণ পেরিয়ে অঙ্গন। কিন্তু অঙ্গনে উঠবার আগেই পাণ্ডাজীর সঙ্গে বাঁ-দিকের বারান্দায় আসতে হয়। একটু এগিয়ে ডানদিকে একটি গর্তের ভেতর কুশেশ্বর শিবকে দর্শন করি।

তারপরে এগিয়ে চলি অঙ্গনের দিকে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ-তীর্থে এসে এ কি ভাবনা পেয়ে বসল আমাকে! দ্বারকা নয়, দ্বারকাধীশ নয়, আমি ভেবে চলেছি ইতিহাসের কথা—এই মন্দির নির্মাণের কথা।

না, সে ইতিহাস জানা নেই আমাদের। থাকবে কেমন করে ? ভারতে প্রাচীন কীর্তি আছে অসংখ্য, কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস নেই

একখানিও। তাই কিংবদন্তীকে আমরা ইতিহাসের আসন এগিয়ে দিয়েছি। বলছি, বিশ্বকর্মা একরাতে এই মন্দির তৈরি করে দিয়েছেন। কিংবা কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ ব্রজমণ্ডলের কয়েকটি বিখ্যাত মন্দিরের মতো এ মন্দিরটিও নির্মাণ করেছেন।

বলা বাহুল্য, যাঁরা ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করছেন। তাঁদের অনেকে বলছেন—প্রায় ১,৪০০ বছর আগে গাঙ্গেয় উপত্যকার জনৈক গুপ্তরাজা এই মন্দির নির্মাণ করে দেন। তিনি গুজরাত আক্রমণ করে ওখামণ্ডল অধিকার করেছিলেন।

আবার অনেকে এই মন্দিরের আদি-ইতিহাস আবিষ্কারের জন্য আজও নিরলস সাধনা করে চলেছেন। তাঁরা এখানে এক টুকরা কালো পাথর কুড়িয়ে পেয়েছেন, যেটি নাকি পূর্ববর্তী দ্বারকাধীশ বিগ্রহের অংশ। পঞ্চদশ খ্রীস্টাব্দের মুসলমান আক্রমণকারীরা সেই বিগ্রহ বিনষ্ট করে। ঐ অংশটুকু দেখে নাকি মনে হয় যে, বিগ্রহটি খোদাই-বিদ্যার নির্দিষ্ট নিয়মে নির্মিত হয়েছিল।

তাঁরা এই মন্দিরের তিনতলায় সম্বত ১৬২৪ (১৫৬৮ খ্রীঃ) ও জনৈক স্থপতির নাম খোদিত একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করেছেন। সেই স্থপতির তত্ত্বাবধানে তখন এই মন্দির মেরামত করা হয়েছিল। ভবনগরের নিকটবর্তী তালাজা থেকে তাঁকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। গবেষকরা অনুমান করছেন ঐ প্রস্তরলিপি-খানি এই মন্দির নির্মাণের প্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কার করতে সাহায্য করবে।

ঐতিহাসিকদের আরও গুটিকয়েক গবেষণার বস্তু রয়েছে এই মন্দিরে। যেমন, চারতলায় রয়েছে একটি ছোট মন্দির, যেটি আপাত-দৃষ্টিতে অবিকল বৌদ্ধস্তূপের মতো।

এ থেকে অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে, এই জগৎ-মন্দির জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের (খ্রীঃ সপ্তম কিংবা অষ্টম

শতাব্দী) আগে নির্মিত। কারণ শঙ্করাচার্যের পরে এ মন্দিরে বৌদ্ধ-স্তূপ তৈরি করা সম্ভব নয়।

শুনেছি মন্দিরের বিশাল ও বিচিত্র শিখরটিও ঐতিহাসিক এবং পুরাতাত্ত্বিক গবেষকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। দ্বারকাধীশের কাছে প্রার্থনা করি তাঁদের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক্, মূক· মুখর হোক্। ইতিহাস কথা বলুক্।

কুশস্থলীর কুশেশ্বরকে দেখে উঠে আসি অঙ্গনে। পাথরের অঙ্গন পেরিয়ে আবার শুরু হল সিঁড়ি—অনেক সিঁড়ি। আমরা উঠতে থাকি।

পাণ্ডাজীকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছি না এখন। তিনি ম্যানেজারকে সাহায্য করতে পেছিয়ে পড়েছেন। তাঁরা দুজনে মিসেস উকিলের দু'খানি বাহু দু-কাঁধে নিয়ে অতিকষ্টে তাঁকে ঠেলে দিচ্ছেন। আর মিসেস এক-পা এক-পা করে এক-একটি সিঁড়ি ওপরে উঠছেন। বাণেশ্বর রয়েছে ঠিক তাঁর পেছনে, পড়ে গেলে ধরে ফেলবে—এই আশায় বোধকরি।

দ্বারকানাথ না করুন! বাণেশ্বরের যেন হাত লাগাবার প্রয়োজন না হয়। কারণ মিসেস যদি সত্যি সত্যি পড়ে যান, তাহলে বাণেশ্বর কিছুতেই তাঁর অধঃপতন রোধ করতে পারবে না। মাঝখান থেকে তাকেও দ্বারকার হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে।

উঠে এলাম মন্দিরে—জগৎ-মন্দিরে। আমার সারা শরীরে মুহূর্তে একটা অভূতপূর্ব পুলকের শিহরণ মূর্ত হয়ে ওঠে। ছুটে আসি গর্ভ-মন্দিরের সামনে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার। দেখা হল না তাঁর সঙ্গে। এখন তিনি রাজবেশ পরিধান করছেন। মন্দিরদ্বারে পরদা ঝুলছে।

কয়েকজন ভক্ত পরদার সামনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমার সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই তাঁদের সামিল হলেন। কিন্তু আমি কয়েক পা পেছিয়ে নাট-মন্দিরের মাঝখানে এসে দাঁড়াই।

নাট-মন্দির ও গর্ভ-মন্দির নিয়েই মূল-মন্দির। বেলেপাথরের মন্দির। বাইরের সিঁড়ি থেকে শুরু করে ভেতরের বিগ্রহ পর্যন্ত সব কিছুই এখানে পাথরে তৈরি।

মন্দিরের ভেতরে কোন কারুকার্য নেই বটে, কিন্তু দ্বারের ঠিক ওপরে গর্ভ-মন্দিরদ্বারের ওপরে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমন লীলা ও রণছোড়জীর ছবি। রয়েছে কৃষ্ণলীলার আরও কয়েকখানি ছবি ও একটি দেওয়াল ঘড়ি—এখন সকাল সওয়া দশটা।

মন্দির-গাত্রে একটা বোর্ডে লেখা রয়েছে—'শ্রীরাম জয়রাম, জয় জয় রাম····· যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ এবং রামকৃষ্ণ করুণাময়।'

একটি বছর বারো বয়সের ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে অতর্কিতে সামনে এসে আমার কপালে চন্দন-তিলক এঁকে দিল। তার পরেই কোমল কণ্ঠে বলল—"মহারাজ, পাইসা দে।"

একটা দশ পয়সা হাতে গুঁজে দিতেই তার সারা মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ম্যানেজার ও পাণ্ডাজী মিসেস উকিলকে নিয়ে নির্বিঘ্নে উঠে এসেছেন মন্দিরে এবং বাণেশ্বর অক্ষত রয়েছে। সত্যই মিসেসকে প্রশংসা করতে হয়। এই দেহ নিয়ে তিনি প্রত্যেকটি মন্দির দর্শন করছেন। করুণাময় ভগবান কেন তাঁকে মেদমুক্ত করছেন না, বুঝতে পারছি না। তাঁর লীলা সত্যই বুদ্ধির অগম্য।

পাণ্ডাজী মিসেসের হাত ছেড়ে দিয়ে বলেন, "একটু বসুন মা! বিশ্রাম করুন। ঠাকুরকে রাজবেশ পরানো হচ্ছে। দর্শনের এখনও আধঘণ্টা বাকি।"

শ্রান্ত মিসেস বসে পড়েন মন্দিরের মেঝেতে। পাণ্ডাজী এগিয়ে আসেন আমার কাছে। কথায় কথায় তিনি আমাকে বলে চলেন, "দেখুন, ষাটটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে নাট-মন্দিরের ত্রিকোণাকৃতি ছাদটি। স্তম্ভগুলি বেলেপাথর এবং গ্র্যানিট-য়ের তৈরি, এর ওপরে আরও ছ'টি তলা রয়েছে। চতুর্থ তলায় শক্তিমাতার মন্দির

আর পঞ্চম তলায় রয়েছে লাড়োয়া মন্দির। পঞ্চম তলার ছাদ অর্থাৎ মূল-মন্দিরটি ১০০ ফুট উঁচু। তার ওপরে ৬০ ফুট উঁচু মোচাকৃতি মন্দিরশীর্ষ। এরই মধ্যে দুটি তলা রয়েছে। মন্দিরের ভিত্তিমূল অর্থাৎ এই মূল-মন্দিরটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার দৈর্ঘ্য ৯০ ফুট।"

"এবারে একটু পুজোর কথা বলুন।" সরকারদা পাণ্ডাজীকে অনুরোধ করেন।

পাণ্ডাজী বলেন, "এখানে দিনে সাতবার ও রাতে চারবার ঠাকুরের ভোগ-পুজো হয়। নামে পুজো দিয়ে 'প্রসাদ' পেতে হলে অন্তত একটাকা পঁচিশ পয়সা খরচ করতে হয়। রাজভোগ অর্থাৎ অন্নপ্রসাদ পেতে হলে অবশ্য সওয়া একান্ন টাকার পুজো দিতে হয়।"

"আমি তারই একটি দেব ঠাকুরজী!"

"বেশ, আমাকে টাকা দিন, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আরও দুজন দিয়েছেন।"

বুঝতে পারছি তাঁদের একজন সামন্তবাবু অপরজন মাসীমা। তিনি কলকাতা ছাড়ার পরে আজই প্রথম অন্ন গ্রহণ করবেন।

সরকারদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে পাণ্ডাজী মন্দিরের দপ্তরে চলে গেলেন। আর তার ঠিক পরেই ম্যানেজার আমাকে বলে, "চলুন ঘোষদা! দর্শনের যখন দেরি আছে, একটু ঘুরে আসা যাক্।"

আমি ম্যানেজারের সঙ্গে নেমে আমি মন্দির থেকে। ঘুরে ঘুরে সব দেখতে থাকি। আরও অনেক মন্দির রয়েছে দেখছি। তোরণ থেকে যে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে আমরা মন্দিরের কাছে পৌঁছেছি, সেই প্রাঙ্গণের দু'পাশে সারি সারি মন্দির। সত্যই দর্শনীয়—অম্বাজী, পুরুষোত্তমজী, অনিরুদ্ধজী এবং দুর্বাসা মুনির মন্দির।

একটি দরজা পেরিয়ে আমরা প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে পাশের বাড়িতে এলাম। ম্যানেজার বলেন, "এখানে দর্শন করবেন জাম্ববতী, শ্রীরাধিকা, লক্ষ্মীনারায়ণ, গোপালকৃষ্ণ, সত্যভামা, সরস্বতী ও লক্ষ্মী তথা রুক্মিণীর মন্দির।"

"রুক্মিণীর মন্দির শুনেছি এখান থেকে অনেকটা দূরে ?"

"হ্যাঁ। সেটা বড মন্দিব, আমবা বিকেলে দেখতে যাব। এটা ছোট মন্দিব, দর্শন কবুন। এই বাডিটাই আদি সারদা মঠ।

"শঙ্কবাচার্য হিন্দুধর্মকে বক্ষা কবাব জন্য ভাবতের চারিদিকে যে চাবটি মঠ স্থাপন কবেছিলেন, এটি তাবই অন্যতম। পশ্চিম ভাবতে ধর্মবক্ষাব পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ছিল এই সাবদাপীঠ। আচার্য শঙ্কব প্রখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিক মদন মিশ্রকে এই মঠের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত কবেন। কথিত আছে, মদন মিশ্র প্রথম জীবনে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ-বিবোধী ছিলেন। শঙ্কব তাঁকে তর্কযুদ্ধে পবাজিত কবে নিজেব দলে আনেন। সাবদাপীঠেব বর্তমান শঙ্করাচার্য অর্থাৎ অধ্যক্ষ হলেন মদন মিশ্রেব ৭৭তম উত্তবসাধক।

"শুধু দেব-দেবী ও যাগ-যজ্ঞ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন না এঁরা। সাবদাপীঠ বিদ্যাসভা এখানে একটি আর্টস কলেজ ও সংস্কৃত আকাদেমী পবিচালনা কবেন। তাঁবা ভাবতবিদ্যা ও সংস্কৃত ভাষায় পি এইচ্. ডি. গবেষণায সাহায্য কবেন "

একবার থামে ম্যানেজাব। তাবপবে আবাব বলে, "সরস্বতী মন্দিবে দেখতে পাবেন আদি শঙ্কবাচার্যেব গদি ও শয্যা—ঠিক সেইভাবে বেখে দেওয়া হয়েছে।"

"এখন সারদা মঠ কোথায় ?"

"এব পবেব বাড়িটাতেই বর্তমান শঙ্করাচার্যেব গদি।"

সব মন্দিব দর্শন করে আমরা সবস্বতীব মন্দিবে এলাম। প্রবেশ করি সেই পুণ্যগৃহে, যেখানে সেই সর্বত্যাগী সাধক তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনের কয়েকটা দিন কাটিয়ে গিয়েছেন। আমার শরীরের শিরায় শিরায় পুলকের শিহরণ বয়ে যায়। বার বার মনে হয় আমি ধন্য, আমি আজ সনাতন ধর্মের সেই সুমহান রক্ষকের পদধূলিধন্য নিবাসে উপস্থিত হতে পেরেছি।

আচার্য শঙ্করের স্মৃতিধন্য প্রাচীন সারদাপীঠ দর্শন করে বর্তমান

ম্যানেজারের সঙ্গে নাট-মন্দিরের মাঝখানে আসি। এখনও দর্শন শুরু হয় নি। তবে গর্ভ-মন্দিরের সামনে বেশ ভীড় হয়েছে। এমন কি মিসেস উকিল পর্যন্ত তাঁদের সামিল হয়েছেন। আমিও এগিয়ে চলি।

ম্যানেজার বাধা দেয়। সে সহসা আমার একখানি হাত ধরে। অবাক হয়ে পেছনে তাকাই। ম্যানেজার গম্ভীরস্বরে বলে, "ঘোষদা, একটা কথা!"

"বলুন।"

ম্যানেজার আমাব হাত ছাড়ে না। আমার দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বলে, "ঘোষদা! আপনি দ্বারকায় এসেছেন?"

অবাক কণ্ঠে উত্তব দিই, "হ্যাঁ।"

"আপনি দ্বারকাধীশের মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছেন?" পাঁচু আবার বলে।

আমার বিস্ময় বাড়ে। তবু উত্তর দিই, "হ্যাঁ।"

"আপনার সামনে ঐ পরদাব পেছনে রণছোড়জী দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি অন্তর্যামী, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের, শুনতে পাচ্ছেন আমাদের কথাবার্তা!"

"হ্যাঁ।"

"এবার বলুন আপনি কে? বলুন, আপনি শঙ্কু মহারাজ কি না?"

প্রথম দিন থেকেই পাঁচুকে দেখে আমাব অত্যন্ত চালাক-চতুর বলে মনে হয়েছে। কিন্তু সে যে এতখানি বিচক্ষণ তা বুঝতে পারি নি।

পাঁচু আবার বলে, "ঘোষদা, এই পবিত্র মন্দিরে দাঁড়িয়ে কারও কিন্তু মিথ্যে কথা বলা উচিত নয়।"

"জানি।" আমি অসহায় স্ববে উত্তর দিই।

"তাহলে বলুন, আপনি শঙ্কু মহারাজ কি না?"

"আপনার অনুমান সত্য। কিন্তু রণছোড়জীর সামনে দাঁড়িয়ে আপনিও আমাকে কথা দিন, কথাটা গোপন রাখবেন। কোন কারণেই হাওড়া ফিরে যাবার আগে কাউকে আমার প্রকৃত পরিচয় জানাবেন না।"

"আমি আপনাকে কথা দিলাম ঘোষদা! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

আর কোন কথা বলার সুযোগ পাই না। ঘণ্টা বাজছে, পরদা সরে যাচ্ছে। রণছোড়জীর জয়ধ্বনিতে মন্দির মুখরিত হয়ে উঠছে। তাড়াতাড়ি ছুটে আসি গর্ভ-মন্দিরের সামনে।

মন্দিরদ্বার রুপোর পাত দিয়ে মোড়া। তাতে নানা রকমের কারুকার্য।

সতৃষ্ণ নয়নে দর্শন করি! মন ভরে যায়। কষ্টিপাথরের দণ্ডায়মান অপরূপ একক মূর্তি। মাথার ওপরে রুপোর ছত্র। গায়ে চমৎকার পোশাক। সর্বাঙ্গে মূল্যবান অলঙ্কার। হাতে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম ধারণ করে তিনি আমাকে অভয় দান করছেন।

পূজারী আরতি করছেন। তালে তালে ঘণ্টা ও কাঁসর বাজছে। ভক্তবৃন্দ মাঝে মাঝে জয়ধ্বনি দিচ্ছেন,

—দ্বারকানাথজী কি····· জয়!

—কৃষ্ণকান্হাইয়া কি · ···জয়!

—রণছোড়জী কি ·····জয়!

একটা শব্দময় আশ্চর্য-সুন্দর ধ্যানগম্ভীর পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে আমার চারিপাশে।

পূজারী আরতি শেষ করলেন। তিনি শান্তিবারি বর্ষণ করছেন। আমি বহু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। কিন্তু বেশ কয়েক ফোঁটা শান্তিজল আমার গায়ে পড়ল। আমার মন-প্রাণ স্বর্গীয় শান্তিতে পরিপূর্ণ হল। আমি কৃপাসিন্ধু কৃষ্ণকে প্রণাম করলাম।

তাঁর কাছে আমি শ্রীর আশু আরোগ্য কামনা করি, শঙ্করী

পূর্ণিমা ও ভৌমিকবাবুর মঙ্গল প্রার্থনা করি। আর বলি—ঠাকুর! তুমি আমার মানসীকে শান্তি দাও, তাকে সুখী কর।

আমি তাঁকে আবার প্রণাম করি। যুগে যুগে আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ, কবীর ও নানক, মেহতা ও বিবেকানন্দ এসে যাঁকে প্রণাম কবেছেন, আমি সেই প্রাণপুরুষকে প্রণাম করি। যুগাতীত কাল থেকে এই আসমুদ্র-হিমাচলের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে যিনি ধারণ করে রয়েছেন, আমি সেই পুরাণ-পুরুষকে প্রণাম করি। আমি বিশ্ব-ইতিহাসের মহোত্তম মহামানবকে প্রণাম করি।

ভক্ত-সাধিকা মীরাবাঈ যাঁর দেহে বিলীন হয়ে রয়েছেন, আমি সেই প্রেমময় পুরুষোত্তমকে প্রণাম করি। সমবেত ভক্তদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমিও গাইতে থাকি :

'পিয়া ম্হাঁরে নৈণাঁ আগে রহজ্যো জী।
নৈণাঁ আগে বহজ্যো
ম্হাঁনো ভুল মত জাজ্যো জী॥
ভৌসাগরমেঁ বহী জাত হুঁ
বেগ মহাঁবী সুধ লীজ্যো জী।
মীরাকে প্রভু গিবধব নাগর,
মিল বিছুড়ন মত কীজ্যো জী॥'

—হে প্রিয়তম, তুমি আমার দু' চোখের সামনে দাঁড়াও। আমার দৃষ্টির সামনে চিরস্থায়ী হও। কৃপা কবে তুমি আমাকে ভুলে যেও না। ভবসাগর যে বয়ে যায়, তুমি তাড়াতাড়ি আমার খবর নাও। হে মীরার প্রভু, হে প্রিয়তম গিরিধারী, একবার আমাকে দেখা দিয়ে তুমি যেন আবার আমাকে ছেড়ে চলে যেও না।

॥ আট ॥

মন-দ্বারকাব পথ দিয়ে টাঙ্গা চলেছে ছুটে। রণছোড়জীকে দর্শন করে পরিতৃপ্ত অন্তরে আমরা ফিরে চলেছি গাড়িতে। না, গাড়ি নয় বাড়ি। গাড়িকে বাড়ি করে আমরা আজ দু-সপ্তাহ ধরে রাজস্থান ও গুজরাত ভ্রমণ কবছি।

কিন্তু ভ্রমণেব কথা নয়, রণছোড়জীর কথাই আলোচনা করছি। পাণ্ডাজী বলছেন, "আপনাবা যে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে এলেন, সেটি রণছোড়জীব আদি-বিগ্রহ নয়, প্রতিনিধি বিগ্রহ। আদি-বিগ্রহ রয়েছেন আমেদাবাদের কাছে ডাকোবে। প্রভাস থেকে আপনারা ডাকোর যাবেন, দর্শন কববেন আদি-রণছোড়জীকে।

"ডাকোরের পাণ্ডারা বলেন, বন্দানো নামে সেখানকার জনৈক দরিদ্র-ভক্তের সঙ্গে রণছোড়জী নিজেই চলে গিয়েছেন সেখানে। আর পণ্ডিতরা বলেন, ১২৬৯ খ্রীস্টাব্দে ডাকোরবাসীরা রণছোড়জীকে চুরি করে নিয়ে যায়।"

"এটি তাহলে দ্বিতীয় বিগ্রহ?" পাণ্ডাজী থামতেই দাদা প্রশ্ন করেন।

পাণ্ডাজী উত্তর দেন, "না, তৃতীয়। দ্বিতীয় বিগ্রহটিও সওয়া দু'শ বছর আগে চুরি হয়ে যায়। তিনি রয়েছেন বেট-দ্বারকায়, আগামী-কাল আপনারা তাঁকে দর্শন করবেন।"

"কিন্তু বেট-দ্বারকায় তো শুনেছি শঙ্খনারায়ণ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

মৃদু হেসে পাণ্ডাজী বলেন, "ওরা তাই বলে বটে। না বললে যে সবাই ওদের চোর বলবেন। আপনারা কাল যাচ্ছেন সেখানে, দেখতে পাবেন, ওরা যে নামই দিয়ে থাকুক্, তিনিও রণছোড়জী।"

সেই আদি ও অকৃত্রিম সমস্যা—আসল আর নকলের ঝগড়া। এ কলহ চিরকালের। নবদ্বীপ ও মায়াপুর, গোকুল-মহাবন আর গোকুলের মতই বেট-দ্বারকা আর দ্বারকার কলহও মিটবে না কোন কালে। দ্বারকার মানুষরা বলেন, তাঁদের দ্বারকাই আসল দ্বারকা, আবার বেট-দ্বারকার বাসিন্দারা দাবী করেন, তাঁরাই আসল দ্বারকার অধিবাসী। অতএব আসল আর নকলের কথা থাক্, পাণ্ডাজীর কথাই শোনা যাক্। পাণ্ডাজী বলে চলেছেন, "প্রতি বছর এক নির্দিষ্ট তিথিতে বিশেষ লক্ষণযুক্ত একটি রঙীন পাখী সমুদ্র থেকে সোজা উড়ে আসে দ্বারকাধীশের মন্দিরে। আমরা তার গায়ের রঙ দেখে মৌসুমী বায়ুর গতি ঠিক করতে পারি।

"পাখীটা উড়ে এসে একেবারে গর্ভ-মন্দিরের ভেতরে বিগ্রহের পায়ের কাছে বসে। নির্বিকার চিত্তে নৈবিদ্যের চাল খেতে সুরু করে। খাওয়া শেষ হবার পরে সে রণছোড়জীর সামনে নাচগান আরম্ভ করে দেয়। ক্লান্তিহীন ভাবে বেশ কিছুক্ষণ একটানা নাচগান করার পরে হঠাৎ সে রণছোড়জীর পায়ের কাছে পড়ে যায়, একটু বাদে সেই অবস্থাতেই শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।"

"মারা যায়!" আঁতকে উঠি।

"হ্যাঁ।" পাণ্ডাজী বলেন, "আর এ।নয়ম চলে আসছে বহু কাল থেকে, অন্তত সম্রাট আকববের সময় থেকে। কারণ আবুল ফজল এই পাখীটির কথা বলে গিয়েছেন।"

পাণ্ডাজী বলে চলেছেন দ্বারকা ও দ্বারকাধীশের কথা। শুনতে খারাপ লাগছে না। তবু কেন যেন আমার মনে পড়ছে অন্য কথা। যিনি লুপ্তপ্রায় দ্বারকাকে প্রকট করে তুলেছিলেন, যিনি ধ্বংসপ্রায় হিন্দুধর্মকে রক্ষা করেছিলেন, আমি ভাবছি সেই আচার্য শঙ্করের বিস্ময়কর জীবনকথা—

বেদান্ত এবং উপনিষদের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যকে সেকালে সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও পণ্ডিতের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, আর একালে তিনি

শঙ্করাবতার রূপে পূজিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা তাঁর কোন নিভুল জীবনী নেই। এই যুগাবতারের মহাজীবনকে অবলম্বন করে যে-ক'খানি পুস্তক প্রণীত হয়েছে, তা থেকে আমরা তাঁর পার্থিব জীবন সম্পর্কে সামান্য কথাই জানতে পারি।

মাধবাচার্যের 'শঙ্কর বিজয়' গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি, তিনি মালাবারের কালাদি গ্রামে (বর্তমান কেরালার কানাড়িতে) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবার নাম শিবগুরু, মায়ের নাম সতীদেবী। কিন্তু চিদ্বিলাস যতির 'শঙ্কর বিজয়' বইয়ে বলা হয়েছে তাঁর পিতার নাম শিবগুরু ও মাতার নাম আর্যাম্মা।

আবার আনন্দগিরির 'শঙ্কর দিগ্বিজয়' গ্রন্থে বলা হয়েছে, তাঁর মা হলেন পরমাসুন্দরী বিশিষ্টা। বিশ্বজিৎ নামক জনৈক সংসার-বিরাগী ভক্ত-ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বিশিষ্টাব। বিয়ের পরে স্বামী কিছুদিন ঘরে ছিলেন। তারপরেই তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করে বনবাসী হন। বিরহিনা বিশিষ্টা মহাদেবের সেবা-পূজায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব বিশিষ্টার কামনা পূর্ণ করেন। বিশিষ্টা একটি দেবদুর্লভ পুত্রলাভ করলেন। তিনিই শঙ্কর।

ঐ সব গ্রন্থে কিন্তু শঙ্করের জন্ম-তারিখ কিংবা জীবনকাল সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি। ফলে পণ্ডিতদের মধ্যে আজও এই যুগাবতারের আবির্ভাবকাল নিয়ে কোন মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এ সম্পর্কে এখন প্রধান তিনটি মত হল—শঙ্করাচার্য ৬৮০ কিংবা ৬৮৬ অথবা ৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেন।

পাঁচ বছর বয়সে তাঁর উপনয়ন হয়। আর তারপরেই একদিন নদীতে স্নান করতে নেমে তিনি কুমীরের সামনে পড়ে যান। কিন্তু বালক শঙ্কর আশ্চর্য কৌশলে কুমীরের কবলমুক্ত হন।

কৈশোর বয়সেই শঙ্কর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি নর্মদার তীরে গোবিন্দপাদের কাছে দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তারপরে

তপস্যা করতে বদ্রীনাথ চলে যান এবং তপস্যায় সিদ্ধিলাভের পরে জ্যোতির্মঠ (জোশীমঠ) প্রতিষ্ঠা করেন।

এই মঠের অধ্যক্ষ নির্বাচনে আচার্য শঙ্কব অথর্ব বেদের ওপরে এক তর্কসভার আয়োজন করেছিলেন। কারণ হিমালয় হল ঔষধির অক্ষয় ভাণ্ডার আর অথর্ব বেদ হল আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের জনক। তাই তিনি প্রথম তিনটি বেদ বাদ দিয়ে চতুর্থ বেদেব ওপরে পরীক্ষা নিয়েছিলেন। দূরদর্শী শঙ্কবাচার্য নিশ্চয়ই চেয়েছিলেন যে, হিমালয়ের ঐ মঠটির অধ্যক্ষ শুধু দেবপূজাই করবেন না, সেই সঙ্গে ঔষধি নিয়ে গবেষণা করে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ কবে তুলবেন। পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তোটকাচার্য নামে জনৈক পণ্ডিত জ্যোতির্মঠেব প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন।

বদ্রীনাথ তখন বৌদ্ধদের অধিকারে। নারায়ণের ধ্যানমূর্তিকে বৌদ্ধমূর্তিরূপে প্রচাব কবে তাঁবা বদ্রীনাথকে বৌদ্ধতীর্থে রূপান্তরিত করেছিলেন। শঙ্করাচার্য সেখানে গিয়ে বৌদ্ধদের তর্কযুদ্ধে পরাজিত করলেন। বৌদ্ধরা তিব্বতে চলে গেলেন। শঙ্করাচার্য কেদার-বদ্রী ও গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীকে হিন্দুতীর্থ রূপে ঘোষণা করলেন। শুরু হয়ে গেল তীর্থযাত্রা। সে যাত্রা আজও চলছে, চিবকাল চলবে।

গিরিতীর্থ উদ্ধারের পরে আচার্য শঙ্কর কুমারিলের ভট্টপাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারপরে রওনা হলেন কাশ্মীব। কাশ্মীর তখন সরস্বতীর শ্রেষ্ঠ পীঠ। শঙ্করাচার্য সেখানে গিয়ে কাশ্মীরের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মদন মিশ্রকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত কবলেন। উদার মদন মিশ্র শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতমত প্রচারের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করলেন। তিনি শঙ্করের সঙ্গী হলেন। আচার্য শঙ্কর দ্বারকায় এসে সারদামঠ প্রতিষ্ঠা করে মদন মিশ্রকে প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন।

উত্তরে বদ্রীনাথে জ্যোতির্মঠ ও পশ্চিমে দ্বারকায় সারদামঠ প্রতিষ্ঠার পরে আচার্য শঙ্কর দক্ষিণে রামেশ্বরমে শৃঙ্গেরীমঠ ও পুবে পুরীতে গোবর্ধনমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রখ্যাত পণ্ডিত সুরেশ্বর ও পদ্মপাদকে সেই মঠ দুটির অধ্যক্ষ মনোনীত করলেন।

তারপরে শঙ্করাচার্য সন্ন্যাসীদের মধ্যে দশনামী তীর্থ ও আশ্রম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করে তাঁদের সবাইকে এই চার মঠের অধীনে আনলেন।

মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন। কেউ বলেন বদ্রীনাথ থেকে স্বয়ং শিব শঙ্করকে কৈলাসে নিয়ে যান। আবার কেউ বা বলেন ঈর্ষাপরায়ণ বৌদ্ধরা তাঁকে বদ্রীনাথ থেকে তিব্বতে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। আর এ অনুমানকে কোনমতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ মানা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে বদ্রীনাথ থেকে তিব্বতের দূরত্ব যেমন খুব বেশি নয়, তেমনি পথও মোটেই দুর্গম নয়।

বলা বাহুল্য, শঙ্কর-বিরোধীদের উদ্দেশ্য কিন্তু সিদ্ধ হয় নি। স্বল্পায়ু জীবনের কর্ম ও সাধনা দিয়ে শঙ্করাচার্য হিন্দুধর্মের যে শক্ত ভিত স্থাপন করে গিয়েছেন, আজও সনাতন ধর্ম সেখানে সগৌরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শঙ্কর শুধু মঠ প্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম প্রচার করেন নি, সেই সঙ্গে তিনি তাঁর অসংখ্য সাবলীল অথচ চিন্তাশীল রচনার দ্বারা হিন্দুর ধর্ম ও শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। তাঁর লিখিত ২৬৭ খানি পুঁথির নাম পাওয়া যায়। তবে পণ্ডিতগণ মনে করেন এগুলির অধিকাংশই পরবর্তীকালের শঙ্কর-শিষ্যদের রচনা। তাহলেও তিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, দশোপনিষদের ভাষ্য, গীতাভাষ্য এবং বিবেকচূড়ামণি সহ বহু স্তোত্র রচনা করে গিয়েছেন।

এর অধিকাংশ রচনাই আমার পক্ষে পাঠ করা সম্ভব হয় নি। তাহলেও আমি বলব শঙ্করাচার্য কেবল পণ্ডিত এবং দার্শনিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সুকবি। আর একটি মাত্র স্তোত্রই সহস্রাধিক বছর ধরে কোটি কোটি ভারতবাসীর অন্তরে তাঁকে কবির আসনে সমাসীন করে রেখেছে। সেটি তাঁর সেই অক্ষয় ও অব্যয় গঙ্গাস্তোত্র—

'দেবি সুরেশ্বরি ভগবতী গঙ্গে
ত্রিভূবন-তারিণী তরল-তরঙ্গে।
শঙ্কর-মৌলি-বিহারিণী বিমলে
মম মতিরাস্তাং তব পদ-কমলে ॥...'

শঙ্করাচার্য সর্বযুগের সর্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের অন্যতম। তিনিই অদ্বৈতবাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম প্রচারক। তাঁর অদ্বৈতবাদের মূল কথা—এক এবং অদ্বিতীয় নির্গুণ ব্রহ্মই (চৈতন্য বা আত্মা) একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। অজ্ঞানতাবশতঃ জীব তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়। জ্ঞানের উদয় হলে জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা প্রকাশের আর কোন বাধা থাকে না এবং এই অবস্থার নামই মুক্তি। কেবল জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞানতার অপসারণ অর্থাৎ মুক্তি সম্ভব।

"ভাই নামবে না টাঙ্গা থেকে? আমরা যে এসে গিয়েছি।"

দিদির ডাকে শঙ্করেব ভাবনা টুটে যায়, ফিরে আসি বাস্তবে। তাকিয়ে দেখি, টাঙ্গা দাঁড়িয়ে রয়েছে দ্বারকা স্টেশনের সামনে। তাড়াতাড়ি নেমে পড়ি। সহযাত্রীদের সঙ্গে এগিয়ে চলি গাড়িতে —আমাদের সচল-বাড়িতে।

গাড়িতে এসেই খাবার পাওয়া গেল, সেই সঙ্গে রণছোড়জীর প্রসাদ। সরকারদা সামন্তবাবু ও মাসিমা দ্বারকাধীশকে রাজভোগ দিয়েছেন। সত্যই রাজভোগ—ডাল ভাত লুচি ভাজা তরকারী ও মিঠাই। তিন-চারজন লোকের ভরপেট খাবার। ভালই হল, আজ প্রায় দু-সপ্তাহ বাদে মাসিমা চারটি পেট ভরা ডাল-ভাত খেতে পারবেন।

খাবার পরে কেউ শুয়ে পড়েছেন, কেউ তাসের আড্ডায় বসেছেন, কেউ বা মহাভারতের আসর বসার অপেক্ষায় রয়েছেন। আমি বসে বসে 'গোপী তালাও'-য়ের কথা ভাবছি—

কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যলীলা সংবরণের সংবাদ শুনে বিরহব্যাকুলা গোপিনীরা সেই তালাও বা কুন্ডের জলে দেহত্যাগ করেছিলেন। জায়গাটার দূরত্ব দ্বারকা থেকে মাত্র ২৪ কিলো-মিটারের মতো, কিন্তু যাতায়াতে বড়ই ঝামেলা। সারাদিনে মাত্র দু'খানি বাস—সকালে ও দুপুরে। দুটিই চলে গিয়েছে। ম্যানেজার জনৈক ট্রাক্-ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলেছিল। সে দু'শো টাকা পেলে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে ঘুরিয়ে আনতে রাজীও হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাত্র আটজন সঙ্গী পাওয়া গেল। তাঁরাও জন-প্রতি পঁচিশ টাকা খরচ করে গোপী-তালাও দর্শনে অক্ষম। ফলে দ্বারকা এসেও গোপী-তালাও দেখা হল না আমার।

সহসা ম্যানেজার এসে হাজির হয়। দ্বারকাধীশ মন্দিরের সেই ঘটনার পর থেকে সে আর আমার এত কাছে আসে নি। আমি তার দিকে তাকাই। সে বলে, "ঘোষদা! একবার একটু বাইরে আসবেন?"

"কোথায়?" জিজ্ঞেস করি।

সে উত্তর দেয়, "এই, প্লাটফর্মে।"

"কোন দরকার আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। চলুন না একবার।"

আর কথা না বাড়িয়ে ম্যানেজারের পেছনে গাড়ি থেকে নেমে আসি। ম্যানেজার কথা বলছে না বলে আমিও নীরব। নিঃশব্দে তার সঙ্গে হাঁটতে থাকি। স্টেশন-মাস্টারের অফিস ছাড়িয়ে প্লাটফর্মের অপরপ্রান্তে আসি।

হঠাৎ ম্যানেজার আমার একখানি হাত ধরে বলে ওঠে, "ঘোষদা! সত্যি বলছি ঘোষদা, আমি এখনও ভাবতে পারছি না, আপনি শঙ্কু মহারাজ···আমি ভাবতে পারছি না, যাঁর লেখা আমাব এত ভাল লাগে, তিনি এতদিন ধরে আমার সঙ্গে রয়েছেন! বিশ্বাস করুন, আজ দুপুরে আমি একদম খেতে পারি নি।" পাঁচুর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার কম্পন।

হাতখানি ছাড়িয়ে নিয়ে আমি ওর কাঁধে রাখি। স্নিগ্ধস্বরে বলি, "এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে আপনি অযথা এত ভাবছেন কেন ভাই! আমিও আপনারই মতো একজন চাকুরিজীবী অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ। আর লেখকরা সবাই মানুষ, তাঁরা কেউ স্বর্গের দেবতা নন।"

"না। মানে এতদিন, বলতে গেলে আপনাকে কোন যত্ন করি নি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ঘোষদা!" পাঁচু আবার আমার একখানি হাত নিজের দু-হাতের মুঠোয় তুলে নেয়।

আমি আবার বলি, "জানি না যত্ন বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? তবে কোন অযত্ন যে করেন নি, তা আমি হলফ করে বলতে পারি।"

গাড়িতে ফিরে এসে দেখি সরকারদার কৃষ্ণকথার আসর আরম্ভ হতে চলেছে। আমি নিঃশব্দে দিদির পাশে এসে বসি। সরকারদা শুরু করেন—

"গতকাল আমি আপনাদেব কাছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডবপক্ষ গ্রহণ পর্যন্ত বলেছি।"

আমরা মাথা নাড়ি। সরকারদা বলতে থাকেন, "তারপরে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে উল্লেখযোগ্যভাবে দেখতে পাই উপপ্লব্য নগরে পাণ্ডবদের কাছে, যখন ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে সঞ্জয় শান্তির প্রস্তাব নিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আপনারা জানেন দুর্যোধন ও কর্ণের বিরোধিতা উপেক্ষা করে ধৃতরাষ্ট্র দ্রুপদ-পুরোহিতকে সসম্মানে বিদায় দিয়েছিলেন এবং তারপরে তিনি শান্তিব প্রস্তাব দিয়ে সঞ্জয়কে পাণ্ডবদের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

"কথায় কথায় সঞ্জয় সেদিন যুধিষ্ঠিরকে বললেন—কৌরবরা যদি আপনাকে রাজ্য ফিরিয়ে না দেয়, তাহলেও আপনার পক্ষে যুদ্ধ করে রাজ্যলাভ করা উচিত হবে না। কারণ আপনি ধার্মিক, আপনার পক্ষে ক্ষমাই শ্রেয়, ভোগের ইচ্ছা সমীচীন নয়। যদি আপনার

স্বজনরা আপনাকে যুদ্ধের পরামর্শ দেন, তাহলে বরং আপনি তাঁদের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে নিজে সরে যান, তবু যুদ্ধ সমর্থন করে আপনি স্বর্গের পথ থেকে ভ্রষ্ট হবেন না।

"বলাবাহুল্য যুধিষ্ঠির সঞ্জয়ের পরামর্শ মানতে পারলেন না। তবু তিনি বললেন—মহাযশা বাসুদেব আমাদের দু-পক্ষেরই হিতার্থী, সে-ই বলুক, আমার কি করা কর্তব্য ?

"কৃষ্ণ তখন বললেন—আমি দু-পক্ষেরই শুভার্থী। আমিও শান্তি চাই। যুধিষ্ঠির তো তাঁর শান্তিপ্রিয়তা দেখিয়েছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর ছেলেরা লোভী, তারা চোর। যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়, তিনি নিজের রাজ্য উদ্ধার করতে চাইছেন। এতে তাঁর ধর্মলোপ হবে কেন, তিনি স্বর্গভ্রষ্ট হবেন কেন ?

"—পাণ্ডবদের ক্ষতি না করে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তবে তা আমার পক্ষেও পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হবে। কাজেই আমি নিজে একবার কৌরবসভায় যাব, নীতি ও ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী তাঁদের কিছু পরামর্শ দেব। জানি না তাঁরা তা বিবেচনা করবেন কিনা, জানি না দুর্যোধন আমার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করবে কিনা ? তাহলেও আমি যাব। সঞ্জয় তুমি শুধু ধৃতরাষ্ট্রকে বলো—পাণ্ডবরা যেমন শান্তিকামী, তেমনি তাঁরা যুদ্ধ করতেও সমর্থ।

"কৃষ্ণের বক্তব্য শেষ হবার পরে যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে বললেন—তুমি এখন যেতে পার। তুমি দুর্যোধনকে বলো, সে রাজা, তার অপরের রাজ্য অপহরণ করা উচিত নয়। তাকে বলো, আমরা শান্তি চাই ! সে যদি একটি প্রদেশ, নিদেন পক্ষে পাঁচটি গ্রাম—কুশস্থল বৃকস্থল মাকন্দী বারণাবত ও আরেকটি গ্রাম আমাদের দেয়, তাহলেই আমি যুদ্ধ পরিহার করতে প্রস্তুত আছি। সঞ্জয়, আমি সন্ধি অথব সংগ্রাম উভয়ের জন্যই প্রস্তুত, তুমি দুর্যোধনকে এই কথাটি ভাল করে বুঝিয়ে দিও।

"সঞ্জয় চলে যাবার পরে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন—এখন তুমিই

আমাদের ত্রাণকর্তা। লুব্ধ ধৃতরাষ্ট্র আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে না দিয়েই শান্তি চাইছেন। আমি মাত্র পাঁচখানি গ্রাম চেয়েছি, মনে হচ্ছে দুর্যোধন তাও আমাকে দেবে না। আমরা যেমন কুলক্ষয় চাই না, তেমনি পৈতৃক সম্পত্তিও ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই। আর তা ত্যাগ করলে আমি আমার মা ও পরিজনদের প্রতিপালনই বা করব কি ভাবে! মাধব! এখন তুমিই বল, আমাদের কি করা উচিত? কি ভাবে আমি স্বার্থ ও ধর্ম দুই রক্ষা করতে পারি? তোমার চেয়ে আপন আমাদের আর কে আছে বল?

"কৃষ্ণ বললেন—মহারাজ! আপনাদের দু-পক্ষের মঙ্গলের জন্যই আমি কৌরবসভায় যাব। আপনার স্বার্থ হানি না করে আমি সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করব। তবে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতির ভরসায় দুর্যোধন নিজেকে প্রবল মনে করছে। কাজেই নরম কথায় কোন কাজ হবে না। আমি তাই সবার সামনে আপনার গুণ ও দুর্যোধনের দোষের কথা বলব, তাকে তিরস্কার করব। তাহলেও সে সন্ধি করবে বলে মনে হচ্ছে না। আপনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন।

"তারপরে দিন-ক্ষণ দেখে কার্তিকমাসের এক সুন্দর সকালে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুর রওনা হলেন। রওনা হবার আগে তাঁর নির্দেশে সারথি দারুককে শঙ্খ চক্র গদা ও তূণী প্রভৃতি সমস্ত দিব্যাস্ত্র রথে তুলে নিতে বললেন। কারণ শত্রুকে কখনও অবজ্ঞা করা উচিত নয়। শুধু তাই নয়, তিনি সাত্যকিকেও সঙ্গে নিলেন।

"এদিকে কৃষ্ণ আসছেন শুনে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য পুত্রদের আদেশ দিলেন। বললেন—আমি তাঁকে অশ্বসহ ষোলটি স্বর্ণভূষিত রথ, আটটি মদস্রাবী হাতি, একশ' কুমারী ও রূপসী দাসী, একশ'জন দাস, কম্বল মৃগচর্ম ও বিমলমণি প্রভৃতি উপহার দেব। দুর্যোধন-সহ আমার সব পুত্র ও পৌত্ররা তাঁকে সংবর্ধনা জানাবে। সালংকারা বারাঙ্গনাগণ ও ঘোমটাহীনা মেয়েরা তাঁকে বরণ করবে।

"সেইভাবেই সেদিন হস্তিনাপুরে কৃষ্ণকে সংবর্ধনা জানানো হল। কিন্তু কৃষ্ণ সবার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকারের পরেই বিদুরের বাড়িতে চলে গেলেন। কুন্তীদেবীর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে পাণ্ডবদের কুশল-সংবাদ দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে বললেন।

"তিনি সেদিন বহু অনুরোধেও দুর্যোধনের আতিথ্য গ্রহণ করলেন না। স্পষ্টবক্তা কৃষ্ণ তাঁকে বললেন—দুরভিসন্ধির জন্য তোমার অন্ন দূষিত, তা আমার গ্রহণীয় নয়। আমি কেবল বিদুরের অন্ন গ্রহণ করতে পারি।

"রাতে বিদুর তাঁকে বললেন—কেশব, এখানে তোমার আসা উচিত হয় নি। দুর্যোধন অধার্মিক ক্রোধী দুর্বিনীত ও মূর্খ। কৌরব-সভায় সবাই তোমার শত্রু, তুমি কি করে সেখানে যাবে?

"কৃষ্ণ সবিনয়ে বললেন—আপনি প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ। আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমি সব জেনেও এখানে এসেছি। আমি কুরু-পাণ্ডবের মাঝে শান্তি স্থাপনের জন্য একবার শেষ চেষ্টা করব। নইলে লোকে বলবে আমি উভয়ের মিত্র নই। দুর্যোধন যদি আমার কথা না শোনে, তবে সে কালের কবলে পড়বে।

"পরদিন সকালে কৃষ্ণ কৌরবসভায় এলেন। সবাই আসন গ্রহণ করার পরে সুবক্তা কৃষ্ণ সুগম্ভীর স্বরে ধৃতরাষ্ট্রকে বলতে থাকলেন—ভরতনন্দন! যাতে কুরু-পাণ্ডবের সন্ধি হয়, বীরকুলের বিনাশ না হয়, আমি তারই জন্য আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছি। সর্বশ্রেষ্ঠ রাজবংশের সন্তান হয়েও আপনার ছেলেরা অশিষ্ট, মর্যাদাজ্ঞানশূন্য এবং লোভী। এরা ধর্ম ও অর্থ পরিহার করে নিজেদের সবচেয়ে আপনজনের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করছেন। আপনি ইচ্ছা করলেই এ যুদ্ধ বন্ধ হতে পারে। আপনি ছেলেদের শাসন করুন, সন্ধির জন্য যত্নবান হোন। সন্ধি হলে সবারই মঙ্গল। পাণ্ডবরা আপনার সহায় হলে আপনি ইন্দ্রেরও অজেয় হবেন। আর যুদ্ধ হলে অযথাই অসংখ্য প্রাণ নষ্ট হবে। পাণ্ডব ও কৌরব যারাই মারা যাক্, আপনি দুঃখ

পাবেন। আপনি তো পাণ্ডবদেরও পিতৃতুল্য। তারা আপনাকে বলেছে—আপনার আদেশে তারা বারো বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাস করেছে কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নি। আপনি তাদেব পিতা, এবারে আপনি প্রতিজ্ঞা পালন করুন। তাদের প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়ে দিন। আপনি কুরু-পাণ্ডবদের সৎপথে আনুন, নিজেও সৎপথে থাকুন। আর পাণ্ডবরা এই সভার সভাসদদের বলেছে —এঁরা সবাই ধর্মজ্ঞ। সুতরাং এঁবা যেন অধর্মের সহায় না হন। যে সভায় অধর্ম ধর্মকে এবং অসত্য সত্যকে নষ্ট করে, সে সভা বিনষ্ট হয়।

"একবার কৃষ্ণ একটু থামলেন। তারপরে তিনি সভাসদদের লক্ষ্য করে প্রশ্ন রাখলেন—এবারে আপনারাই বলুন, আমার বক্তব্য ধর্মসংগত এবং অর্থকর কিনা ?

"কৃষ্ণ নীরব হলেন। উপস্থিত রাজারা মনে মনে তাঁর বক্তব্য সমর্থন করলেও দুর্যোধনের ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহসী হলেন না। তাঁরা নীরব রইলেন।

"মৃদু হেসে কৃষ্ণ তখন আবার ধৃতরাষ্ট্রকে লক্ষ্য কবে বলতে শুরু করলেন—মহারাজ ! আমি আপনার কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, আপনি ক্ষত্রিয়দের মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত করুন। দয়া করে স্নেহান্ধ হবেন না। নিঃস্বার্থ হয়ে ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ বলুন। আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন, মহারাজা যুধিষ্ঠির অজাতশত্রু। তা সত্বেও তাঁকে জতুগৃহে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল, শকুনি কপট দ্যূতে তাঁব সর্বস্ব হরণ করেছে। প্রকাশ্য রাজসভায় নিজের স্ত্রীকে বিবসনা করতে দেখেও তিনি ধৈর্যচ্যুত হন নি। সেই সত্যাশ্রয়ী ধর্মাত্মার সঙ্গে আপনি অধর্মাচরণ করবেন না।

"অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—মহারাজ। আমার বক্তব্য শেষ করার আগে একটি কথা আপনাকে জানাতে চাই—

পাণ্ডবরা যেমন আপনার সেবা করতে প্রস্তুত, তেমনি যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। তারা কি করবে, তা আপনিই স্থির করুন।

"সভাসদ এবং রাজন্যবর্গ নীরব থাকলেও নীরব রইলেন না উপস্থিত ঋষিগণ। কৃষ্ণ তাঁর বক্তব্য শেষ করার পরেই পরশুরাম মুখ খুললেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে পুরাকালের রাজা দম্ভোদ্‌ভব এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ তপস্বী নর ও নারায়ণের কাহিনী বললেন। বললেন, সেই ক্ষুৎপিপাসা ও শীতাতপে শীর্ণ নিরস্ত্র দুই ঋষি কেমন করে শক্তিমদে মত্ত সসৈন্য রাজা দম্ভোদ্‌ভবের দম্ভ চূর্ণ করলেন।

"কাহিনী শেষ করে পরশুরাম ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন—পুরাকালের সেই দুই যোগ-তপস্বী নর ও নারায়ণই একালে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং আপনার ছেলেদের পক্ষে পাণ্ডবদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। আপনি দয়া করে যুদ্ধে মত দেবেন না।

"পরশুরামের পরে মহর্ষি কণ্ব সুমুখ ও গরুড়ের উপাখ্যান বলে দুর্যোধনকে পরামর্শ দিলেন—বৎস, যতদিন তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হচ্ছ, ততদিনই তুমি জীবিত থাকবে। বিরোধ ত্যাগ কর। বাসুদেবকে আশ্রয় করে নিজের কুল রক্ষা কর।

"কণ্বের উপদেশ শেষ হবার পরে নারদ দুর্যোধনকে বিশ্বামিত্র, গালব, যযাতি ও মাধবীর গল্প বললেন। বললেন—অভিমানের ফলে যযাতি স্বর্গচ্যুত হয়েছিলেন আর অতিশয় নির্বন্ধের জন্য গালবও দুঃখ পেয়েছিলেন। তাই তোমাকে বলি, তুমি অভিমান ক্রোধ ও হিংসা ত্যাগ কর। পাণ্ডবরা তোমার ভাই, তুমি তাদের সঙ্গে সন্ধি কর।

"নারদ থামতেই ধৃতরাষ্ট্র বললেন—কৃষ্ণ তুমি যা বলেছো এবং ঋষিরা যা বললেন, সবই ধর্মসংগত এবং ন্যায্য। কিন্তু বৎস, আমি পরাধীন। আমার ছেলেরা আমার কথা শোনে না। তারা গান্ধারী, বিদুর এবং ভীষ্মদেবের কথাও শোনে না। তুমি বরং আরেকবার দুর্যোধনকে একটু বুঝিয়ে বল।

"কৃষ্ণ তখন মধুরকণ্ঠে দুর্যোধনকে বললেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি মহাপ্রাজ্ঞ বংশে জন্মগ্রহণ করেছো, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ ও সর্বগুণান্বিত। তোমার জ্ঞাতি এবং মিত্রগণ সবাই সন্ধি চান। তোমার সব সৈন্য এবং ভীষ্ম দ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতি সকলে মিলেও ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যে পেরে উঠবে না, বিরাটনগরে তুমি একবার তার প্রমাণ পেয়েছো। এবারে আমি তার সঙ্গে থাকব। সুতরাং যুদ্ধ বাধিয়ে কৌরবকুলকে বিনষ্ট করো না। পাণ্ডবরা বলেছে, তারা তোমাকে যুবরাজ এবং ধৃতরাষ্ট্রকে মহারাজের পদে বরণ করবে। তুমি তাদের অর্ধেক রাজ্য দিয়ে রাজলক্ষ্মী লাভ কর।

"বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে দুর্যোধন উত্তর দিলেন—পাণ্ডবরা দূরের কথা, দেবতারাও ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণকে পরাজিত করতে পাববেন না। আমি বেঁচে থাকতে পাণ্ডবরা রাজ্যের অর্ধাংশ পাবে না। আমি যখন নাবালক ছিলাম, তখন আমার বাবা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমি তা পালন করতে বাধ্য নই। রাজ্যের অর্ধাংশ কিংবা পাঁচখানি গ্রাম তো দূরের কথা একটা সরু ছুঁচের আগায় যতটুকু মাটি ওঠে, তাও আমি পাণ্ডবদের দেব না।

"—এই তো তোমার শেষ কথা? কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন।

"—হ্যাঁ।

"—এবারে তাহলে আমাকে বিদায় দাও।

"—না। দুর্যোধন উত্তর দিলেন—তুমি আর তোমার বন্ধুদের কাছে ফিরে যেতে পারবে না।

"—মানে!

"—খুব সোজা। আমি তোমাকে বন্দী করলাম।

"কৃষ্ণ কিন্তু নির্বিকার। তিনি একটু হেসে দুর্যোধনকে বললেন —দুর্যোধন, তুমি মোহান্ধ। তুমি ভেবেছো, আমি একা। তাই তুমি আমাকে বন্দী করতে চাইছো। কিন্তু এই দেখো, পঞ্চ-পাণ্ডব অন্ধক বৃষ্ণি আদিত্য রুদ্র ও বসুগণ এবং মহর্ষিরা সবাই আমার সঙ্গে

রয়েছেন। এই বলে তিনি অট্টহাসিতে দশদিক প্রকম্পিত করে তুললেন। আর সেই কম্পনের মাঝে সবাই দেখতে পেলেন, তাঁর ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষে রুদ্র ও মুখে অগ্নি এবং অন্যান্য অঙ্গ থেকে ইন্দ্রাদি দেবগণ পঞ্চ-পাণ্ডব ও বলরাম প্রভৃতি যাদবগণ আবির্ভূত হচ্ছেন।

"কৃষ্ণের এই ঘোর মূর্তি দেখে সভার প্রায় সবাই সভয়ে চোখ বুজলেন, কেবল ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর সঞ্জয় ও ঋষিরা তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। কারণ তিনি তাঁদের দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন। আর দেখতে পেলেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। জনার্দন তাঁকেও দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন।

"দেবতা গন্ধর্ব ও ঋষিদের অনুরোধে কৃষ্ণ পূর্ব-রূপ গ্রহণ করলেন। তারপরে সাত্যকি ও বিদুরের হাত ধরে কৌরবসভা থেকে বেরিয়ে এলেন। প্রথমে তিনি কুন্তীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব সংবাদ দিলেন, তারপরে কর্ণকে পাণ্ডবপক্ষে আনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কর্ণ সম্মত হলেন না। তিনি বললেন—সব কিছু জেনেও তুমি কেন আমাকে ভোলাতে চাইছো? আমি জানি পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন, দুর্যোধন দুঃশাসন শকুনি আর আমি তার উপলক্ষ্য। আমি স্বপ্ন দেখেছি, যুধিষ্ঠির তোমার প্রদত্ত রক্তাক্ত পৃথিবী গ্রাস করছে।"

একবার থামলের সরকারদা। তারপরে আবার বললেন, "আপনারা জানেন, কুন্তীদেবীও কর্ণকে দলে আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টাও ফলবতী হয় নি।"

"হ্যাঁ।" দাদা বলেন, "কর্ণ-কুন্তী সংবাদ।"

সরকারদা কিছু বলতে পারার আগেই উমাদি আবৃত্তি শুরু করেন—

'মাতঃ, করিয়ো না ভয়।
কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
.....যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।

জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডবসন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে।
জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন, গৃহহীন। আজিও তেমনি
আমারে নির্মমচিত্তে তেয়াগো, জননী,
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব-'পরে।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে,
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই॥'

॥ নয় ॥

বিকেল পাঁচটায় আবার টাঙ্গায় সওয়ার হতে হল। এবারে কিন্তু টাঙ্গা চলল ভিন্ন পথে। এ. সি. সি.-র কারখানার পাশ দিয়ে। কর্মচারী কলোনী ছাড়িয়ে সমুদ্রের ধারে। ছোট শহর। সুতরাং সময় বেশি লাগল না।

একটি প্রশস্ত বাঁধানো পথের পাশে টাঙ্গা থামল। পাণ্ডাজী বললেন, "এই পথটি ওখা চলে গিয়েছে।"

"তাহলে মোটরে করেও বেট-দ্বারকা যাওয়া যায়?" অমিয়বাবু জিজ্ঞেস করেন।

পাণ্ডাজী জবাব দেন, "বেট-দ্বারকা নয়, ওখা। বেট-দ্বারকা একটা দ্বীপ। কাজেই সেখানে যেতে হলে ওখা থেকে আপনাকে নৌকা কিংবা লঞ্চে চড়তেই হবে।"

"তা লঞ্চ পেলে নৌকোয় চড়ব কেন?"

"বেশ তো, তাই চড়বেন, এখন এগিয়ে চলুন।" ম্যানেজার মাঝখান থেকে অমিয়বাবুকে বলে।

"কোথায়?" অমিয়বাবু প্রশ্ন করেন।

"ঐ যে সামনে, রুক্মিণীদেবীর মন্দিরে।" ম্যানেজার ইসারা করে।

তাকিয়ে দেখি খানিকটা দূরে, সাগরের বালুকাবেলায় প্রায় জলের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে মন্দির। একটি নয়, দুটি মন্দির—একটি ছোট, একটি বড়। চারিদিকে দেওয়াল ঘেরা। জলের ধারে বলেই বোধহয় নির্মাতারা মন্দিরের ভিত এত উঁচু করেছেন।

পশ্চিমমুখী মন্দির অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে রুক্মিণী মন্দিরটি। সেদিকেই মন্দিরের প্রধান তোরণ। আমরা মন্দিরের পেছনদিকে টাঙ্গা থেকে নেমে বালিময় বেলাভূমির ওপর দিয়ে মন্দিরে চলেছি। পাণ্ডাজী ইসারায় দ্বারকাধীশ মন্দির দেখিয়ে

দিলেন। বললেন—রুক্মিণী ও দ্বারকাধীশের দূরত্ব দেড় মাইলের মতো।

দক্ষিণদিকেও ছোট একটি দরজা রয়েছে দেখছি। সেটি দিয়েই অর্থাৎ মন্দিরের বাঁ-পাশ দিয়ে আমরা মন্দির-চত্বরে প্রবেশ করি। তারপরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি ওপরে।

একই গড়নের দুটি মন্দির—একটি বড়, একটি ছোট। বড়টি ডানদিকে—রুক্মিণী মন্দির, ছোটটি বাঁদিকে—মহাবীর মন্দির। মহাবীর মানে জৈন-তীর্থঙ্কর নয়, রামভক্ত বীর হনুমান। তাঁর সঙ্গে রুক্মিণীর কি সম্পর্ক জানা নেই আমার। তাহলেও কলির দ্বারকায় যখন দ্বাপরের রুক্মিণী মন্দিরে ত্রেতার হনুমানজী হাজির হয়েছেন, তখন আমরা তাঁকে সশ্রদ্ধচিত্তে দর্শন করব না কেন?

হনুমানজীকে দর্শন করে উঠে আসি শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী রুক্মিণী দেবীর মন্দিরে।

মাঝারি আকারের গোল নাট্-মন্দির পেরিয়ে গর্ভ-মন্দির। ভেতরে পাথরের বেদীর ওপরে সাদা সিংহাসনে শ্বেত-পাথরের দণ্ডায়মানা রুক্মিণীর চতুর্ভুজা মূর্তি। হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম। অর্থাৎ মর্ত্যের কৃষ্ণপ্রিয়া স্বর্গের বিষ্ণুপ্রিয়া হয়েছেন

পাণ্ডারা বলেছেন—তিনি নাকি স্বামীর ওপর অভিমান করেই চলে এসেছেন এখানে। এবং তিনি তাঁর এই রূপ-পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে ভক্তদের বোঝাতে চেয়েছেন—কৃষ্ণের মতো স্বামী পেয়েও দেখো, আমি সুখী হই নি। শেষ পর্যন্ত আমাকে বিষ্ণুর শরণ নিতে হয়েছে। অতএব তোমরাও স্বামী এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের মায়ায় অন্ধ না হয়ে, শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হও।

বলাবাহুল্য, অনিবার্য কারণেই পাণ্ডারা বলেন নি যে, রুক্মিণী ও লক্ষ্মী যেমন অভিন্না, তেমনি অভিন্ন কৃষ্ণ এবং বিষ্ণু। স্বর্গের লক্ষ্মী-নারায়ণ মর্ত্যে এসে রুক্মিণী ও কৃষ্ণ হয়েছেন।

রুক্মিণী-মাকে প্রণাম করে আমরা নাট-মন্দিরের মাঝখানে এসে

দাঁড়াই। চেয়ে চেয়ে চারিদিক দেখি। কারুকার্যহীন সাধারণ মন্দির, কেবল দেওয়ালে কয়েকখানি ছবি টাঙ্গানো রয়েছে। রুক্মিণীর বিভিন্ন লীলার ছবি—তাঁর দুর্বাসাপূজন, শাপমোচন, তপস্বীজীবন, শ্রীচরণগঙ্গা প্রাপ্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ।

একজন স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ ব্রাহ্মণ কাছে আসেন। ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলেন, "আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন, বিশ্রাম করুন। পিপাসা পেলে জলপান করুন।"

"জল! জল খাওয়াতে পারেন নাকি ঠাকুরমশায়?" ছোট ঠাকুরমা জলের নাম শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠেছেন।

"কেন পারব না মা!" পূজারী সবিনয়ে নিবেদন করেন, "আপনাদের সেবা করবার জন্যই তো আমরা এখানে রয়েছি। মন্দিরের পেছনে চলে যান, সেখানে ঠাণ্ডা জল রয়েছে।"

এমনিতেই দ্বারকায় জলাভাব। তার ওপরে এ মন্দিরটি লোকালয়ের বাইরে, সমুদ্রের ধারে। এঁরা এত জল পান কোথায়? প্রশ্নটা না করে পারি না।

পূজারী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে উত্তর দেন, "আর বলেন কেন বাবা! দু'মাইল দূর থেকে জল বয়ে আনতে হয়। শুধু জলের জন্যই দৈনিক দশ থেকে পনেরো টাকা খরচ হয়। তাহলেও তো না আনিয়ে পারি না। আপনারা শ্রান্ত হয়ে এখানে আসেন। পিপাসার সময় যদি একটু জলও না দিতে পারি?

"তা তো বটেই।" উকিলবাবু ধুয়ো ধরেন।

পূজারী বলেন, "আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।"

মন্দিরের মেঝেতে বসে পড়ি সবাই। পূজারীও আমাদের পাশে বসেন।

অমিয়বাবু বলেন, "এদিকটায় তো লোকালয় দেখলাম না?"

"না বাবা! কয়েক বছর আগেও এদিকটা জঙ্গল ছিল। ওখার পাকারাস্তা হওয়ায় খানিকটা পরিষ্কার হয়েছে। আগে দ্বারকাধীশ

মন্দির থেকে এই পর্যন্ত শুধু একটি পায়েহাঁটা কাঁচারাস্তা ছিল। সন্ধ্যের পরে কেউ বড় একটা এদিকে আসতেন না। তখনও আমরা এই দেবীস্থানকে যক্ষের মতো আগলে রেখেছি। নিয়ামত মায়ের সেবা-পূজা করেছি। কিন্তু আর বোধহয় পারলাম না।"

"কেন ?" সামন্তবাবু প্রশ্ন করেন।

পূজারী উত্তর দেন, "যা দিনকাল পড়েছে, সেবা-পূজা চালানো যাচ্ছে না। দৈনিক অন্তত পঞ্চাশটি টাকা দরকার, অথচ এখানে যাত্রী-সংখ্যা খুবই কম। যাঁরা আসেন, তাঁরাও তেমন কিছু একটা দিতে পারেন না। কারণ দ্বারকাধীশ মন্দিরেই তাঁরা সর্বস্বান্ত হয়ে যান।" একটু থেমে পূজারী আবার বলেন, "তাই বলছিলাম, আপনারা অনেকে একসঙ্গে এসেছেন। আপনারা যদি সবাই মিলে এই মাতৃ-মন্দিরের অন্তত দুটি দিনের ব্যয়ভার বহন করেন, তাহলে আমরা বড়ই উপকৃত হব।"

পূজারী চুপ করেন। আমরাও শব্দহীন।

সহসা সামন্তবাবু নীরবতা ভঙ্গ করেন। বলেন, "এক কাজ করুন। আমি একদিনের খরচ দিচ্ছি, আপনারা সবাই মিলে আরেক দিনের খরচ অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা তুলে দিন। আসুন, আমরা ঠাকুরজীকে অন্তত দুটি দিনের জন্য নিশ্চিন্ত করে যাই।"

"মা আপনাদের মঙ্গল করবেন!" পূজারী সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলে ওঠেন।

পাণ্ডাজী চাঁদা সংগ্রহে লেগে যান। বলা বাহুল্য পঞ্চাশ টাকা সংগ্রহ করতে তাঁকে কোন বেগ পেতে হয় না।

টাকা দেবার পরে সামন্তবাবু পূজারীকে বলেন, "এবারে একটু মা-য়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন ঠাকুরজী! পুণ্যতীর্থে বসে পুণ্যকাহিনী শোনা যাক্।"

"ঠিক কথা কইছেন দাদা!" বড়-ঠাকুরমা উচ্ছ্বসিত স্বরে সামন্ত-বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করেন।

"কোন্ কাহিনী বলব বলুন ?"

"কেন ? শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী-হরণের কথা কয়েন না !" মেজ-ঠাকুরমা সঙ্গে সঙ্গে ফরমাশ করেন।

"বেশ, বলছি।" পূজারী ঠিক হয়ে বসেন।

সামন্তবাবুর দুই ছেলে ও বিউটি পূজারীর দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে যায়। আমরাও কর্ণময় হই। পূজারী শুরু করেন—

"বিদর্ভ দেশের রাজা ভীষ্মক। তার পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে। বড়ছেলের নাম রুক্মী আর মেয়ের নাম রুক্মিণী। তিনি অসাধারণ সুন্দরী ও অতিশয় বুদ্ধিমতী। শ্রীকৃষ্ণের যশোগাথা শুনে তিনি মনে মনে তাঁকেই পতিরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন।

"কিন্তু দাদা রুক্মী কৃষ্ণকে ভালচোখে দেখতেন না। তিনি চেদিরাজ দমঘোষের ছেলে শিশুপালের সঙ্গে বোনের বিয়ে ঠিক করলেন। বিয়ের দিন পর্যন্ত স্থির হয়ে গেল।

"নিরুপায় হয়ে রুক্মিণী তখন কৃষ্ণকে একখানি চিঠি লিখলেন। জনৈক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে দিয়ে সেই চিঠি তিনি দ্বারকাধীশের কাছে পাঠালেন।

"দ্বারকানাথ পরম সমাদরে সেই ব্রাহ্মণকে বরণ করলেন। তার-পরে জিজ্ঞেস করলেন—আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন বলুন ?

"ব্রাহ্মণ তাঁকে রুক্মিণীর চিঠি দেখালেন। কৃষ্ণ মুখে নির্বিকার ভাব দেখালেও মনে মনে খুবই পুলকিত হয়ে উঠলেন। কারণ রুক্মিণীর রূপ-যৌবনের কথা তাঁরও অজানা ছিল না। বরং তাঁর অবচেতন মনে রুক্মিণীকে পাবার একটা প্রবল বাসনা ছিল। তাহলেও তিনি নির্বিকার কণ্ঠেই ব্রাহ্মণকে বললেন—বেশ তো, আপনিই পড়ুন না চিঠিখানা।

"ব্রাহ্মণ চিঠি পড়তে আরম্ভ করেন। কৃষ্ণের কাছে লেখা রুক্মিণীর চিঠি—প্রেমপত্র। সমগ্র শাস্ত্রে এমন আত্মনিবেদনের মধুর দলিল আর নেই। রুক্মিণী লিখেছেন—

'হে ভুবনসুন্দর! আমি তোমার মনোহর রূপের কথা শুনেছি। হে অচ্যুত! আমি তোমার অনন্ত গুণের কথা শুনেছি। লজ্জাহীনার মতই তোমাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, তোমার যশোগাথা আমার যৌবনতপ্ত দেহের তাপজ্বালা নিবারণ করেছে। এজন্য তুমি নিশ্চয়ই আমাকে দোষ দেবে না। কারণ এ জগতে এমন কোন নারী নেই যে তোমার মতো নয়নাভিরাম পুরুষকে পতিত্বে বরণ না করতে চায়'।"

সহসা থেমে গেলেন পূজারী।

আমরা তার মুখের দিকে তাকাই।

তিনি বলেন, "এর পরের কয়েকটা কথা বড়ই সুন্দর। আপনারা তাই ভাগবতকারের ভাষায় শুনে নিন একবার।" তিনি সুর করে বলতে থাকেন—

"তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়া—
মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো! বিধেহি।
মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্—
গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ॥"

"অর্থটা এট্টু কইয়া দ্যান্ ঠাকুরমশায়। আমরা সমস্কৃত জানি

' পূজারী থামতেই বড়-ঠাকুরমা প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন।

মৃদু হেসে পূজারী বলেন, "বলছি মা, বলছি।"

'করেন।" ছোট-ঠাকুরমা অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে অনুমতি দান করেন।

পূজারী বলতে থাকেন, "রুক্মিণী কৃষ্ণকে লিখেছেন—হে সর্বব্যাপী, হে সর্বসাক্ষী। আমি তোমাতেই আত্মনিবেদন করেছি। তুমিই আমার প্রাণপতি। হে স্বামি। তুমি এখানে এসে আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর। হে কমললোচন। তুমি বীর, আমি তোমার! তুমি সিংহ, শিশুপাল শৃগাল। সিংহের ভোগ্যবস্তু যেন শৃগাল স্পর্শ না করতে পারে।

"আরও অনেক কথা সেদিন রুক্মিণী লিখেছিলেন কৃষ্ণকে। তিনি

লিখেছিলেন—আমি যদি জন্ম-জন্মান্তরে কোনদিন শ্রীহরির আরাধনা করে থাকি, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই আসবে। তুমি এসো! আমার পাণিগ্রহণ কর। দমঘোষের ছেলে যেন আমাকে ছুঁতে না পারে।

"হে অজিত! পরশুদিন আমার বিয়ে। তুমি পত্রপাঠ গোপনে এখানে চলে এসো। আমাকে গ্রহণ কর। জানি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, সেই সঙ্গে এও জানি—সে-যুদ্ধে তোমার জয় সুনিশ্চিত। তুমি বীরত্বের কনেপণ দিয়ে আমাকে লাভ কর, রাক্ষসমতে আমাকে বিয়ে কর।

"হয়তো জিজ্ঞেস করবে—অন্তঃপুর থেকে কিভাবে তুমি আমাকে হরণ করবে? ভয় নেই, বিয়ের দিন রাজপথেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে আমার। কুলপ্রথা অনুযায়ী সেদিন আমি অম্বিকার মন্দিরে যাব। মন্দির থেকে ফেরার পথে তুমি আমাকে হরণ করে নিও।

"তুমি ব্রহ্মা ও শিবের আরাধ্য। তোমার পক্ষে অসাধ্য কিছুই নয়। তা সত্ত্বেও আমি যদি তোমার করুণালাভে বঞ্চিতা হই, তবে আমি আত্মঘাতিনী হব। তোমার ধ্যান করতে করতে দেহত্যাগ করব, যাতে অন্তত শতজন্ম পরেও একদিন তোমাকে আমি মনের মতো করে কাছে পাই।"..

পূজারীর কথা আর কানে আসছে না আমার। মনে পড়ছে মহাকবি মধুসূদনের বীরাঙ্গনা-কাব্যের তৃতীয় সর্গের কথা। সর্গটির নাম 'রুক্মিণী পত্রিকা'। শেষ অনুচ্ছেদটিতে রুক্মিণী যেখানে শ্রীকৃষ্ণকে লিখেছিলেন—

'আসি উদ্ধারহ মোরে, ধনুর্ধর তুমি,
মুরারি! নাশিলা কংসে, শুনিয়াছে দাসী,
কংসজিত; মধু নামে দৈত্য-কুল-রথী,
বধিলা, মধুসূদন, হেলায় তাহারে!
কে বর্ণিবে গুণ তব, গুণনিধি তুমি?

কালরূপে শিশুপাল আসিছে সত্বরে ,
আইস তাহার অগ্রে। প্রবেশি এ দেশে,
হব মোরে। হরে লয়ে দেহ তাঁর পদে,
হরিলা এ মনঃ যিনি নিশার স্বপনে।'

পূজারী ঠিকই বলেছেন, এমন অভিনব পত্র আমাদের শাস্ত্রে আর নেই বলেই সম্ভবতঃ মধুসূদন পত্রখানিকে তাঁর অমরকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের ভাবনা থাক্, শ্রীমধুসূদনের কথাই শোনা যাক্। পূজারী বলে চলেছেন—

"ব্রাহ্মণের পত্রপাঠ শেষ হল। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তবৎসল মদনমোহন উঠে দাঁড়ালেন। তিনি সারথি দারুককে রথ রের করার আদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণকে বললেন —আপনিও চলুন আমার সঙ্গে।

"মা, বাবা ও দাদা বলদেবের অনুমতি নিয়ে শ্রীহরি রওনা হলেন বিদর্ভের পথে। কিন্তু তিনি চলে যাবার পরেই বলরামের মনে পড়ল কথাটা। শিশুপাল নিশ্চয়ই তাঁর সব সাকরেদদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছে সেখানে। বিশেষ করে জরাসন্ধ তো উপস্থিত থাকবেই। সুতরাং যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং একা কৃষ্ণের পক্ষে এঁটে ওঠা শক্ত হবে। তাই বলদেবও তাঁর চতুরঙ্গবাহিনী নিয়ে কৃষ্ণের পেছনে বিদর্ভ দেশে রওনা হলেন।

'এদিকে ব্রাহ্মণের দেরি দেখে রুক্মিণী অধীর হয়ে উঠলেন। তবে কি প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রেমপত্র ছিঁড়ে ফেলেছেন? তার আত্মদান কি বৃথা হল? আর তাই যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে যে আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কোন গতি নেই।

"এই সময় সহসা তাঁর বামাঙ্গ স্পন্দিত হল। রুক্মিণী চমকে উঠলেন। আর সে চমক ভাঙবার আগেই তিনি দেখতে পেলেন সহাস্য মুখে ব্রাহ্মণ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ব্রাহ্মণ তাঁকে সুসংবাদ জানাতেই রুক্মিণী আনন্দে দিশেহারা হয়ে উঠলেন। কৃতজ্ঞ প্রেমিকা ব্রাহ্মণের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

"সারা বিদর্ভ দেশ তখন উৎসবের সাজে সেজে উঠেছে। পুত্র শিশুপালকে নিয়ে দমঘোষ বিদর্ভে এসেছেন। শোভাযাত্রা সহকারে রাজপথ দিয়ে চলেছেন। সঙ্গে বরযাত্রী শাল্ব, জরাসন্ধ ও দন্তবক্র প্রভৃতি। পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে বিদর্ভের নারী-পুরুষ তাঁদের সংবর্ধনা জানাচ্ছেন। শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে ভীষ্মক-রাজ-প্রাসাদের দিকে।

"এমন সময় গরুড়ধ্বজ রথে চড়ে শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভে পৌঁছলেন। সবাই ভাবলেন তিনিও বরযাত্রী এসেছেন। কারণ শিশুপাল তাঁর পিসতুতো ভাই। পুরনারীরা অবশ্য না বলে পারলেন না—আহা! দ্বারকানাথের সঙ্গে আমাদের রাজকন্যের বিয়ে হলে বড়ই ভাল হত, দুটিতে চমৎকার মানাতো।···দুয়েকজন তো সবাইকে শুনিয়েই বলে ফেললেন—আমাদের সমস্ত পুণ্যের বিনিময়েও যদি রাসবিহারী রুক্মিণীকে গ্রহণ করেন, তাহলেও আমরা ধন্য হব। বলা বাহুল্য, অন্তর্যামী কৃষ্ণ সবই শুনতে পেলেন। কিন্তু তিনি নীরবে এগিয়ে চললেন। তবে তাঁর হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন বিদর্ভের নারী-পুরুষরা আশ্বস্ত হয়েছিলেন বৈকি।

"ইতিমধ্যে রাজা ভীষ্মক রাজপ্রাসাদে প্রয়োজনীয় মঙ্গলাচরণ শেষ করে রুক্মিণীকে অম্বিকা-মন্দিরে যেতে বললেন। প্রহরী ও সখীদের সঙ্গে রুক্মিণী বেরিয়ে এলেন প্রাসাদ থেকে, হৃদয়ে গোবিন্দ-পাদপদ্ম ধ্যান করতে করতে তিনি এগিয়ে চললেন অম্বিকা-মন্দিরের পথে। পথেই শিশুপাল ও তাঁর সহযাত্রীদের সঙ্গে দেখা হল তাঁর। ততক্ষণে বরযাত্রীদের শোভাযাত্রা থেমে গিয়েছে। রাজা ও রাজপুত্ররা অপলক নয়নে রমণীয়া রুক্মিণীর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁরা মদনবাণে জর্জরিত হলেন। রাজন্যবর্গ শিশুপালের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হলেন।

"কিন্তু রুক্মিণী তাঁদের দিকে না তাকিয়ে কৃষ্ণের ধ্যানে তদ্গত হয়ে এগিয়ে চললেন। তিনি অম্বিকা-মন্দিরে প্রবেশ করলেন। এখানে রুক্মিণীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ভাগবতকার বলেছেন—ভগবান বিষ্ণুর

মায়াশক্তির মতো রুক্মিণীর সৌন্দর্য। তাঁর কটিদেশ সুন্দর। তিনি পীনপয়োধরা। দু'কানের দুটি কুণ্ডল তাঁর মুখখানিকে আরও সুন্দর করে তুলেছিল। একছড়া রত্নময় চন্দ্রহার তাঁর সুগঠিত নিতম্বকে আরও রমণীয় কবে তুলেছিল। তিনি হরিণী-নয়না ও কেশবতী। তাঁর কালো কেশের ভয়ে যেন কাজলপরা চোখদুটি সর্বদা সশঙ্কিত। তাঁকে দেখলে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীবেরও মোহ সৃষ্টি হয়। তাঁর কোমল পা-দুখানির পুণ্য-স্পর্শ পেয়ে পথের ধূলি ধন্য হয়ে উঠেছিল, দীপ্তিমান নূপুরের গানে বিদর্ভের বাতাস উতলা-আকুল হয়ে উঠেছিল। তিনি কলহংসীর মতো এগিয়ে চলেছিলেন।

"মন্দিরে প্রবেশ করে রুক্মিণী তাঁব ইষ্টদেবীর সামনে দাঁড়িয়ে ব ায়মনোবাক্যে কামনা করলেন—

'নমস্তে তাম্বিকেঽভীক্ষ্ণং স্বসন্তানযুতাং শিবম্।
ভূয়াৎ পতির্মে ভগবান্ কৃষ্ণস্তদনুমোদতাম্' ॥"

এবারে আর ঠাকুরমা অর্থ জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলেন না। কাবণ তিনি কিছু বলতে পারার আগেই পূজারী আবার বলতে শুরু কবলেন, "রুক্মিণী বললেন—হে অম্বিকা! গণেশাদি দেবগণের মঙ্গল-স্বরূপিণী জননী, আমি তোমাকে বার বাব নমস্কার করি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি পতিত্বে বরণ করতে চাই, তুমি অনুমোদন কর।

"সখীদের হাত ধরে রুক্মিণী বেরিয়ে এলেন মন্দিব থেকে। তেমনি নূপুরকলিত ছন্দে তিনি এগিয়ে চললেন। কিন্তু এবারে আর নতমস্তকে নয়, এবারে তিনি ঘোমটা তুলে সলজ্জ দৃষ্টিতে পথের পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা রাজা ও রাজপুত্রদের দিকে তাকাচ্ছেন মাঝে মাঝে। বীরবৃন্দ আরও বেশি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ভাবলেন—রুক্মিণী আমার প্রতি আসক্তা। অথচ তাঁর পটোলচেরা চোখদুটি তখন কৃষ্ণকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

."অবশেষে তিনি দেখতে পেলেন দ্বারকানাথকে। দুজনের চোখে দুজনের চোখ পড়ল—শুভদৃষ্টি হল।

"শ্রীকৃষ্ণ রথ থেকে নেমে এগিয়ে এলেন রুক্মিণীর দিকে। রুক্মিণীর দেহরক্ষী এবং উপস্থিত রাজাবা কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে দু'হাতে কোলে তুলে নিলেন। তারপরে ঝড়ের বেগে ফিরে এলেন রথে। দারুক প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে চলল গরুড়ধ্বজ। রুক্মিণী পরম নিশ্চিন্তে গোবিন্দের বুকে মুখ লুকালেন।

"গরুড়ধ্বজ অদৃশ্য হবার পরে রুক্মী ও শিশুপাল বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। সম্বিৎ ফিরে এলো রুক্মিণীর রক্ষীবাহিনী এবং অন্যান্য রাজাদের। চিৎকারে চারিদিক ফাটিয়ে তাঁরা গরুড়ধ্বজের পেছনে ছুটলেন। চিৎকার করে কৃষ্ণকে ক্রমাগত যুদ্ধে আহ্বান করতে থাকলেন।

"দারুককে রথ থামাতে বললেন বাসুদেব। রুক্মিণী অবাক হলেন। তাকিয়ে দেখলেন জরাসন্ধ, শিশুপাল, শাল্ব ও রুক্মী প্রভৃতি সসৈন্যে ধেয়ে আসছেন। তিনি সভয়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকালেন। কোমল কণ্ঠে কৃষ্ণ আশ্বাস দিলেন—মাস্ম ভৈঃ! ভয় নেই।

রুক্মিণী নির্ভয় হলেন।

"শুরু হল যুদ্ধ। ভয়ানক যুদ্ধ। একদিকে একা কৃষ্ণ। অপরদিকে হাজার হাজার যোদ্ধা।

কিন্তু বেশিক্ষণ কৃষ্ণকে একা যুদ্ধ করতে হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সসৈন্যে বলরাম সেখানে হাজির হলেন। শত্রুরা সুবিধা করতে পারলেন না। তাঁরা পরাজিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীকে বন্দী করলেন। রুক্মিণী কৃষ্ণের কাছে দাদার প্রাণভিক্ষা করলেন। রুক্মী ছিলেন অতিশয় কৃষ্ণ-বিদ্বেষী। কাজেই কৃষ্ণ তাঁকে হত্যা না করলেও একেবারে ক্ষমা করলেন না। তিনি তলোয়ার দিয়ে রুক্মীর চুল কেটে দিয়ে তাঁকে রথের চাকার সঙ্গে বেঁধে রাখলেন।

"শত্রুরা পালিয়ে যাবার পরে বিজয়ী বলরাম এলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। রুক্মীর প্রতি খারাপ ব্যবহার করার জন্যে তিনি ভাইকে

তিরস্কার করলেন। তিনি সসম্মানে রুক্মীকে মুক্ত করে দিলেন। তাঁর দাদার সঙ্গে কৃষ্ণ এমন খারাপ ব্যবহার করার জন্য তিনি রুক্মিণীকেও সান্ত্বনা দান করলেন। তারপরে কৃষ্ণ ও রুক্মিণীকে নিয়ে সগৌরবে বলরাম দ্বারকায় ফিরে এলেন।

"অবশেষে এক শুভদিনে শুভলগ্নে শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হল—লক্ষ্মী-নারায়ণের মিলন হল। সেদিন দ্বারকা উৎসব-নগরী। সর্বত্র আলো আর ফুলের ছড়াছড়ি। দ্বারকানাথের বিয়েতে দ্বারকার নর-নারী সেদিন দিনের কাজ ও রাতের ঘুম বিসর্জন দিয়ে আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছিলেন। আকাশের তারা, বনের পাখী আর সাগরের ঢেউ পর্যন্ত সেই আনন্দ-যজ্ঞের সরিক হয়েছিল। বিয়েটা অবশ্য রাক্ষস-মতেই হয়েছে, কারণ কৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করে এনেছিলেন।"

থামলেন পূজারী। আমরা উঠে দাঁড়াতে চাই। সময় কম। আরও বহু দর্শন বাকি রয়েছে।

কিন্তু পূজারী ইসারায় আমাদের উঠতে নিষেধ করলেন। গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, "আপনারা সকলেই জানেন শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ, রুক্মিণী লক্ষ্মীদেবী। কাজেই আপনাদের মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে—তাঁদের মিলনকে কেন্দ্র করে আবার এমন মহোৎসবের কি প্রয়োজন ছিল?"

আমরা পূজারীর দিকে তাকাই, কিন্তু কোন কথা বলি না। একটু বাদে তিনি নিজেই আবার বলেন, "ভক্তবৃন্দ! আমি বলব প্রয়োজন ছিল। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ চিরমিলনে মিলিত, কারণ সেটি নিত্য-লোক। মর্ত্যলোকের সঙ্গে সে মিলনের কোন সম্পর্ক নেই। মানুষের মঙ্গলের জন্য লক্ষ্মীনারায়ণ মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মর্ত্যলীলায় তাঁদের মানুষের মতই আচরণ করতে হয়েছে। আর বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্যের সঙ্গে মর্ত্যের মাধুর্য যুক্ত হবার জন্যই কৃষ্ণলীলা এমন মনোহর, এত জনপ্রিয়।"

"আচ্ছা, ঠাকুরজী! আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?" পূজারী থামতেই সাহাবাবু জিজ্ঞেস করেন। কাজেই বসে থাকতে হয় আমাদের।

পূজারী বলেন, "বেশ, বলুন কি কথা?"

"এই মন্দিরে অন্যান্য ছবির সঙ্গে একখানি ছবি দেখলাম—দুর্বাসা-পূজন। ওটির তাৎপর্য তো বুঝতে পারলাম না। দুর্বাসা তো বনবাসের সময় পঞ্চ-পাণ্ডবের অতিথি হয়েছিলেন একবার। কৃষ্ণ-রুক্মিণী আবার কবে তাঁর সেবা করলেন?"

"করেছিলেন।" একটু হেসে পূজারী বলেন, "মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ১৫৯ অধ্যায়ে আপনারা এ কাহিনী পাবেন।"

"একটু বলুন না!" সাহাবাবু অনুরোধ করেন।

পূজারী বলতে থাকেন, "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে শরশয্যায় শুয়ে মহাজ্ঞানী ভীষ্ম পাণ্ডবদের যে-সব অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন, তা নিয়েই মহাভারতের অনুশাসন পর্ব।"

সরকারদা মাথা নাড়েন। পূজারী বলে চলেন, "একদিন যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞেস করলেন—পিতামহ! কোন্ ফল এবং উন্নতির আশায় আপনি ব্রাহ্মণসেবা করেন, এবারে তাই বলুন!

"ভীষ্মদেব কৃষ্ণকে দেখিয়ে বললেন—এই মহামতি বাসুদেব তোমার কাছে সেকথা বলবেন। কারণ ইনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। ইনি শুভ ও অশুভ এবং অচিন্ত্যনীয়।

"তখন কৃষ্ণ তাঁদের কাছে দুর্বাসা-পূজনের কাহিনী বললেন।..."

"ভণিতা না কইরা কাহিনীটা কি, তাই কইয়া ফ্যালেন।" বড়-ঠাকুরমা ধৈর্যহীনা।

আমরা নির্বাক্। পূজারী বড়-ঠাকুরমার বক্তব্য বুঝতে না পেরেই বলতে থাকেন, "শ্রীকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, একবার দুর্বাসা নগর ও গ্রামের পথে ঘুরে ঘুরে বলতে থাকলেন—আমি দুর্বাসা। আমি শ্রান্ত ক্ষুধার্ত। তোমরা কে আমাকে আশ্রয় ও খাদ্য দেবে!

"—মুনি ঋষি বিশেষ করে ব্রাহ্মণকে আতিথ্যদান করা পবম সৌভাগ্যের। তবু কেউ তাঁকে ভয়ে আশ্রয় দিতে চাইছেন না দেখে, আমি তখন তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গেলাম। আমার বাড়িতে বসে তিনি কোনদিন সামান্য কিছু মুখে দিতেন, কোনদিন বা কয়েক হাজাব মানুষেব খাবার খেয়ে ফেলতেন, কখনও হাসতেন, কখনও বা কাঁদতেন। একদিন তিনি তাঁব শয়নকক্ষেব শয্যাদ্রব্য ও সুন্দবী সেবিকাদেব ভস্ম কবে বাইরে বেবিয়ে এলেন। এসেই আমাকে বললেন—আমার খুব পবমান্ন খেতে ইচ্ছে কবছে। এখুনি আমাকে গবম মিষ্টান্ন খাওয়াও।

"—আমি আগেব থেকে তাঁব মনের কথা জানতে পেরে মিষ্টান্ন বান্না কবতে বলেছিলাম। কাজেই তৎক্ষণাৎ তাঁব সামনে গরম পায়েস এনে দিলাম। তিনি তার থেকে খানিকটা খেয়ে নিয়ে থালাখানি ঠেলে দিলেন আমার দিকে। কর্কশকণ্ঠে আদেশ দিলেন, বাসুদেব! এই মিষ্টান্ন তোমার সারা গায়ে মাখো।

"—আমি তখুনি সেই গবম মিষ্টান্ন আমাব গায়ে ও মাথায় মেখে ফললাম। শুধু পায়েব তলায় মাখতে পাবলাম না। এই সময রুক্মিণী সেখানে এসে উপস্থিত হল। মহর্ষি সেই এঁটো গরম পায়েস তাব গায়েও মেখে দিলেন তারপরে আমার বথে উঠে রুক্মিণীকে বললেন, আমাকে টেনে নিয়ে চলো। রুক্মিণী ঘোড়াব মতো রথ টানতে থাকল। তিনিও আমাব সামনেই ঘোড়ার মতো রুক্মিণীকে চাবুক মারতে শুরু কবে দিলেন। আমি চুপ কবে বইলাম।

"—কিছুক্ষণ বাদে রুক্মিণী আর তাঁকে বইতে পারল না। দুর্বাসা বেগে রথ থেকে নেমে পড়লেন। নোংরা পথ দিয়ে ছুটতে আরম্ভ কবলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। আর বার বার বলতে থাকলাম, ভগবান! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

"—প্রসন্ন হলেন। অবশেষে মহর্ষি দুর্বাসা দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমি কাছে যাবার পরে বলবেন, বাসুদেব! তুমি জিতেন্দ্রিয়। তুমি সম্পূর্ণভাবে ক্রোধকে জয় করেছো। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন

হয়েছি। অন্ন যেমন দেবতা ও মানুষের প্রিয়, তেমনি তুমিও সবার প্রিয়পাত্র হবে। তুমি গায়ে ও মাথায় পায়েস মেখেছো, কাজেই তোমাকে কেউ অস্ত্রবিদ্ধ করতে পারবে না। আমার এই উচ্ছিষ্ট পায়েস আজীবন তোমার বর্মের কাজ করবে। তবে তুমি পায়ের তলায় পায়েস না মেখে ভুল করলে। কেউ সেখানে শরনিক্ষেপ করলে, তোমার বিপদ ঘটবে।*

"--তারপরে দুর্বাসা মুনি রুক্মিণীকে বললেন, তুমিও ইহলোকে অশেষ যশ ও কীর্তি অর্জন করবে। জরা, ব্যাধি ও বিবর্ণতা তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তুমি পবিত্র গন্ধ-বিশিষ্টা হয়ে তোমার পতির প্রিয়তম সেবিকা ও সখী হবে। ষোল হাজার স্ত্রীর মধ্যে তোমাকেই তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসবেন।

"গল্প শেষ করে কৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে বললেন--আপনি আমার যেসব গুণের কথা বলেছেন সবই সত্য। কিন্তু ব্রাহ্মণসেবার ফলেই আমি এইসব গুণের অধিকারী হয়েছি।"

* মৌষলপর্বে জরা ব্যাধ মৃগভ্রমে শ্রীকৃষ্ণের পায়ের তলায় বাণ মেরেছিল বলেই তিনি বাণবিদ্ধ হয়েছিলেন।

দশ

রুক্মিণী-মন্দিব থেকে শঙ্খবে পথ ধবে মাইলখানেক এসে আবাব টাঙ্গা থেকে নামতে হল। পথেব পাশে ছোট একটি তোবণ দেখিযে পাণ্ডাজী বলেন, "ভদ্রকালী-মায়েব মন্দির।"

তোবণ পেবিয়ে ভেতবে আসি। পাথবেব বেদিব ওপবে ভদ্রকালীব মুখমণ্ডল। শুধুই মুখখানি, শবীবেব অন্য কোন অংশ নেই। কিন্তু মায়েব সেই বদনমণ্ডলে পবম প্রশান্তি। তিনি ত্রিনয়নী—অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। মহাকালেব প্রণয়নী মহাদেবী আমাদেব অভয দান কবছেন। আমবা তাঁকে প্রণাম কবি।

তাঁবই কথা ভাবতে ভাবতে বেবিযে আসি মন্দিব থেকে। ভদ্রকালী কালীমা-য়ের আবেক রূপ। কালীব উগ্র ও শান্ত দুই রূপেব কথাই বিভিন্ন পুবাণ ও তন্ত্রগ্রন্থে পাওযা যায। দেবী-মাহাত্ম্য, ভাবিষ্যপুবাণ ও দেবীপুবাণ প্রভৃতিতে মহাকালী উগ্ররূপা। কিন্তু বিষ্ণুধর্মোত্তবে বর্ণিত ভদ্রকালীব রূপ শান্ত ও সুন্দব।

সেই শান্ত ও সুন্দব অভয়দায়িনী দেবীকে দর্শন কবেই আমবা প্রশান্তচিত্তে বেরিয়ে এলাম মন্দিব থেকে। পাণ্ডাজী বলেন, "এই মন্দিরটি ভাবতেব একান্নপীঠেব অন্যতম।"

কথাটি আমাব সাবা শবীবে একটা শিহবণ বইযে দেয। কোথায কলকাতা আব কোথায দ্বারকা। অথচ উভয়েই সতীপীঠ—একই মা-যেব অংশ। মা-ভগবতী তো আমাব ভাবতমাতাবই আবেক রূপ আব ধর্মেব অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত আমাদের এই জন্মভূমি যে চিরকালের পুণ্যতীর্থ-ভারত।

ভদ্রকালীর মন্দিব থেকে মাইলখানেক এসে সিদ্ধেশ্বর-মহাদেবেব মন্দির। পথের পাশে খানিকটা খোলা জায়গা। তারই ঠিক

মাঝখানে একটি সুবিশাল বটগাছ। মন্দিরটিকে ছায়াশীতল ও রমণীয় করে রেখেছে।

বটতলার বাঁয়ে মন্দিরদ্বার। আমরা ভেতরে আসি। প্রথমেই নাট-মন্দির—শ্বেতপাথরেব মেঝে, ঠিক মাঝখানে কালোপাথবের নন্দীমূর্তি।

নাট-মন্দিরের পরেই গর্ভ-মন্দির। দবজার ওপবে রামেশ্বরমেব ছবি— রাম লক্ষ্মণ ও হনুমান শিবপূজা করছেন। খানিকটা দূরে, একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে, হরপার্বতী ও গণেশ পুজো দেখছেন।

গর্ভ-মন্দিরের মেঝেও শ্বেতপাথরে বাঁধানো, কিন্তু নাট-মন্দিরের মেঝে থেকে খানিকটা নিচু। ঠিক মধ্যস্থলে লুক্কায়িত শিবলিঙ্গ পাশেই পেতলের সাপ—নাগরাজ ফণা তুলে শিবেব মাথাটিকে ঢেকে বেখেছেন। মন্দিবেব সিলিং থেকে ঝোলানো শেকলের সঙ্গে একটি কলসী ঝুলছে। তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝবছে মহাদেবেব মাথায়।

পেছনের দেওয়ালের সঙ্গে একটি ছোটখাটো পাবতী-মূর্তি আর পাশের দেওয়ালে রয়েছেন গঙ্গা-মূর্তি। আমবা সশ্রদ্ধ চিত্তে সবাইকে প্রণাম করি।

পাণ্ডাজীর পেছনে বেরিয়ে আসি পথে। আমাদেব টাঙ্গাগুলো সারি বেধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু পাণ্ডাজী টাঙ্গায় উঠতে দেন না। বলেন—রাস্তা পেরিয়েই গান্ধীঘাট। দর্শন কবে একবারে টাঙ্গায় উঠবেন।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। টাঙ্গায় চড়া এবং নামা দুটিই কঠিন কাজ। তার চেয়ে খানিকটা হাঁটা ঢের ভাল। আমরা হেঁটে চলি।

বেশিদূর হাঁটতে হয় না। বাঁক ফিরতেই সমুদ্রকে দেখতে পাই। ব্যস, আর যায় কোথায়, বিউটি এবং তার দু-ভাই, মানে সামন্তবাবুর দুই ছেলে দে ছুট!

আমরা সাগরতীরে আসি—শান্ত সাগব। সিমেণ্ট-বাঁধানো

গোলাকার ঘাট। মহাত্মাজীর মহাপ্রয়াণের পরে এখানে তাঁব চিতাভস্ম বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল।

ঘাটের ওপরে শ্বেতপাথরেব বেশ উঁচু বেদিব ওপবে নীলপাথবেব গান্ধীমূর্তি। চারিদিকে রেলিং-ঘেবা। তাহলেও ভেতরে যেতে অসুবিধে নেই কোন। এবং মনে হচ্ছে সেই বীবপুঙ্গববা প্রাযই বাপুজীব পদতলে গিয়ে হাজির হয়। নইলে মহাত্মা গান্ধীব মমবমূর্তির বেদীতে 'Bobby' ও 'Pakeejah' প্রভৃতি লেখা থাকবে কেন?

গান্ধী স্মৃতিবক্ষা সমিতি এই মূর্তিটিব বক্ষণাবেক্ষণ কববাব জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন, জানা নেই আমাব। তবে সে ব্যবস্থা যা-ই হযে থাক্, মূর্তিটিকে যে নিযমিত পবিষ্কাব কবা হয না, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। সমিতিব সদস্যবা খবব না দিযে একবাব এখানে এলেই আমার কথাব সত্যতা উপলব্ধি কবতে পাববেন।

গান্ধীঘাটে দাঁড়িয়ে উত্তবে দেখতে পাচ্ছি দ্বাবকাব লাইট-হাউস আব দক্ষিণে দ্বারকানাথেব মন্দিব।

বিউটি ভাইদেব নিয়ে একেবাবে বেলাভূমিতে নেমে গিযেছে। সজদি এবং বৌদিও দেখছি সিঁড়ি বেযে নিচে নামছেন। তাদেবও বোধহয় বিউটির মতো ছেলে-মানুষী কবাব বাসনা হযেছে। আব তাদেবই বা দোষ দিযে কি হবে? সত্তব বছবেব দাদাও যে নিচে নামছেন।

আমিও নেমে আসি নিচে, সাগব সৈকতে। বিউটিদের ছবি নিই। ছবি নিই সাগব ও তাব বাতিঘবেব। ছবি নিই দ্বাবকাধীশ মন্দিব ও গান্ধীঘাটেব।

গান্ধীঘাট থেকে গোবর্ধনজী, দামোদরজী, মীবাবাঈ ও নবসিংহ মেহতার মন্দিব দর্শন করে আমরা আবার দ্বারকাধীশ মন্দিরে এলাম। গোধূলি ঘনিয়ে এসেছে। একটু বাদেই শুরু হবে সন্ধ্যাবতি। আমবা সেই আরতি দেখতেই এসেছি।

টাঙ্গা থেকে নামতেই মেয়েটি ছুটে এসে আমাব একখানি হাত

ধরে : সেই বারো বছরের কিশোরীটি—সকালে যে আমার কপালে চন্দন-তিলক পরিয়ে দিয়েছিল, যাকে আমি একটি সিকি দেবার পরে আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠেছিল।

সকালে সে বলেছিল-- বাবুজি, সন্ধ্যার সময় আরতি দেখতে এসো। দেখবে কেমন সুন্দর আরতি। আমিও আসব। আবার তাহলে দেখা হবে তোমার সঙ্গে। আমি আমার বোনদের নিয়ে আসব বাবুজি।

তাই এসেছে। ছোট ছোট তিনটি বোন। তারাও তাদের দিদির মতই সুন্দরী। যেমন ফুটফুটে রঙ, তেমনি নাক মুখ চোখ। স্বাস্থ্যও খারাপ নয়।

সকালেই মেয়েটি বলেছে আমাকে—ওর মা নেই, বাবার খুব অসুখ। তাই চন্দন-তিলকের পরিবর্তে পুণ্যার্থীরা তাকে যা দেন, তা দিয়েই ওদের সংসার চলে। কিন্তু আর কতদিন পুণ্যার্থীরা ওকে চন্দনের বিনিময়ে পয়সা দেবেন ? বড়জোর চার-পাঁচ বছর। তারপরে আর কেউ তাকে এভাবে পয়সা দেবে না। তাদের দাবী বাড়বে, তারা ওর দেহটিকে দখল করতে চাইবে। অথচ পেটের দায়ে সেদিনও পথে বেরুতে হবে ওকে। সেদিন দেহের বিনিময়ে ওকে পেটের ক্ষুধা মেটাতে হবে।

ঠাকুর, তোমার আপন দেশে কেন এই অবিচার ? হে পুরাণপুরুষ ! তুমি আরেকবার আবির্ভূত হও। সমস্ত অন্যায় ও অবিচারকে দূর করে তোমার এই প্রিয় পৃথিবীকে আবার মানুষের পৃথিবীতে পরিণত করো।

সন্ধ্যারতি দর্শন করে আমরা নেমে আসি দ্বারকাধীশ মন্দির থেকে। বিদায় নিই রণছোড়জীর কাছ থেকে। জানি না আর কোনদিন আমার দ্বারকায় আসার সুযোগ হবে কিনা ? কিন্তু না হলেও তোমার মনোহর মূর্তি আমার মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে থাকবে ! দ্বারকা আজ থেকে আমার মন-দ্বারকা হয়ে রইল।

টাঙ্গায় উঠে দাদা পাণ্ডাজীকে প্রশ্ন করেন, "আমরা কি এখন গাড়িতে ফিরে যাচ্ছি ?"

"না। এখন আমরা তোতাদ্রি মঠে যাচ্ছি, সেখান থেকে গাড়িতে ফিরব।"

"তোতাদ্রি মঠ আবার কোথায় ? সেখানে কি দরকার ?"

"স্টেশনের কাছেই, বড় রাস্তার ওপরে। দরকার মানে, সেটি বাঙালীদের মঠ ও ধর্মশালা। বাঙালী যাত্রীরা সবাই একবার যান সেখানে। তাছাড়া আজ ভাগবত-পাঠের দিন। ভালই লাগবে আপনাদের।"

দাদা আর কোন আপত্তি করেন না। টাঙ্গা ছুটে চলেছে মন-দ্বারকার পথে। দাদা বোধকরি ভাগবতের কথা ভাবছেন মনে মনে। আমি কিন্তু ভেবে চলেছি নিজের কথা, আমার জন্মভূমি বরিশাল আর এই দ্বারকার কথা। কোথায় বরিশাল আর কোথায় দ্বারকা ?

বঙ্গ-বিভাগ আমার বহু ক্ষতি করেছিল। আমার সুন্দর ও সরল জীবনটাকে কুৎসিত ও জটিল করে তুলেছিল। তাহলেও বঙ্গ-বিভাগ আমার এবং আমার মতো লক্ষ লক্ষ পূর্ব-পাকিস্তানের বাস্তুহারাকে বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে একাত্ম করে দিয়েছে। আমরা পূর্ববঙ্গের মানুষরা বড়ই ঘরকুনো ছিলাম। কাজেই বঙ্গ-বিভাগ না হলে আমি লেখক হতাম কিনা জানি না, কিন্তু পর্যটক যে হতে পারতাম না, তা হলফ্ করে বলতে পারি। তাই আজ আমার বার বার মনে হচ্ছে, কোথাকার মানুষ আমি কোথায় এসেছি ? কোথায় বঙ্গোপসাগর আর কোথায় কচ্ছোপসাগর ? কোথায় বরিশাল আর কোথায় দ্বারকা ?

ভূতাত্ত্বিকরা বলেছেন—গাঙ্গেয়-বদ্বীপ ভারতের সবচেয়ে নতুন মাটি, আর গুজরাত ভারতের সর্বপ্রাচীন ভূখণ্ডের অন্তর্গত। গাঙ্গেয় উপত্যকায় মনুষ্য-সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের পর অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ২৩০০ অব্দের পরে। আর নর্মদা-উপত্যকায় মনুষ্য

বসবাস শুরু হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দেরও আগে। গুজরাত ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম পীঠস্থানগুলির অন্যতম।

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে যুগে যুগে দলে দলে মানুষ ভারতে এসেছে। কেউ এসেছে লুট করতে, কেউ বা সাম্রাজ্য বিস্তার করতে। তারা প্রত্যেকেই গুজরাতে তাদের কিছু চিহ্ন রেখেছে। কেউ এখানকার শিল্প ও সংস্কৃতি ও বাণিজ্যে নিজেদের অবদান রেখেছে, কেউ বা ধ্বংসের বন্যায় সারা গুজরাতকে ভাসিয়ে দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুজরাতের স্থান সুপ্রাচীন। গ্রীক ও রোমান সভ্যতার যুগ থেকেই গুজরাতের সঙ্গে ভূমধ্য সাগরের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পরে স্থানীয় রাজারা গুজরাত শাসন করতে থাকেন এবং সৌরাষ্ট্র অর্থাৎ উপদ্বীপটি রাজপুতদের অধিকারে আসে। তারপরে পাঠান ও মোগলরা গুজরাতের অধীশ্বর হন।

প্রাচীন গুজরাতের প্রাচীনতম অধিবাসীরা হল—ভীল ও গোন্দ্ প্রভৃতি উপজাতীয়রা এবং গির অরণ্যের সিংহরা। ভারতে আর কোথাও সিংহ নেই। দুঃখের কথা, আদি অধিবাসীদের মতো সিংহও ক্রমেই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে গুজরাত থেকে।

মুসলমানদের পরে গুজরাত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। ব্রিটিশরা সারা গুজরাতে ২০২টি দেশীয় রাজ্যের পত্তন দেন। ভারত স্বাধীন হবার পরে জুনাগড়ের নবাব ছাড়া, অন্য সব দেশীয় রাজারা সৌরাষ্ট্র যুক্ত-রাজ্য নাম দিয়ে গুজরাতে যোগদান করেন। জুনাগড়ের নবাবের মনে ছিল তিনি পাকিস্তানে যোগ দেবেন। কিন্তু ভারত সরকার তাঁর সে আশা পূর্ণ করতে দেননি।

এখনও গুজরাতে জৈন জনসংখ্যা রীতিমত উল্লেখযোগ্য। আর তাই অধিকাংশ গুজরাতী নিরামিষভোজী। সম্রাট অশোকের সময় থেকে ৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে বল্লভী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম গুজরাতে বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল।

সবরমতী নদীর তীর থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার দূরে গান্ধীনগরে গুজরাতের নতুন রাজধানী তৈরি করা হয়েছে। উপদ্বীপের অধিবাসীরা সারারাজ্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং বৈচিত্র্যময় অধিবাসী। তারা স্নেহশীল এবং অতিথিবৎসলও বটে।

"ভাই, কি ভাবছো ?"

দিদির প্রশ্নে বাস্তবে ফিরে আসি। আমরা দ্বারকাধীশ মন্দিরে সন্ধ্যারতি দর্শনের পরে তোতাদ্রি মঠে যাচ্ছি। সেখানে খানিকক্ষণ ভাগবত-পাঠ শুনে গাড়িতে ফিরব। আজ রাতেই আমরা দ্বারকাব কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। কাল বেট-দ্বারকা দর্শন করব।

টাঙ্গা ছুটে চলেছে দ্বারকার পথ ধরে। আমি টাঙ্গায় বসে ভাবছিলাম দ্বারকা ও গুজরাতের কথা, আমার নিজের কথা। দিদির ডাকে সেই ভাবনার অবসান হয়েছে।

দিদি আবার বললেন, "আচ্ছা ভাই, তখন কৃষ্ণকথার আসরে সরকারদা কর্ণ-কুন্তী সংবাদের কাহিনী বললেন। কিন্তু সে কাহিনীটা তো মহাভারতে নেই !"

"আপনি বোধহয় কাশীদাসী মহাভারতের কথা বলছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"কাশীরাম দাস সংস্কৃত মহাভারতের সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ করে-ছিলেন। তিনি তাঁর অনুবাদে মূল-মহাভারতের বহু কাহিনী বাদ দিয়েছেন। কিন্তু মূল-মহাভারতে এ কাহিনীটি রয়েছে।"

"মূল-মহাভারত মানে সংস্কৃত মহাভারতে ?"

"সংস্কৃতে তো বটেই। তাছাড়া হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের বাংলা অনুবাদেও আছে। এমন কি রাজশেখর বসুর সংক্ষিপ্ত গদ্যানুবাদেও রয়েছে।"

"আচ্ছা আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করব ?"

"বেশ, করুন।"

"রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্ণ-কুন্তী সংবাদে লিখেছেন—পুণ্যজাহ্নবীর তীরে

কর্ণ যখন বন্দনায় রত ছিলেন, তখন কুন্তীদেবী তাঁর কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁকে পাণ্ডবপক্ষে আনবার চেষ্টা করতে এসেছিলেন। কিন্তু ঘটনাটা তো হস্তিনাপুরের। সেখানে গঙ্গা কোথায়, সেখানে তো যমুনা!"

"রবীন্দ্রনাথ মূল-মহাভারতকেই অনুসরণ করেছেন। মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বের ১৩৫ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে আছে—কুন্তীদেবী ভাল করে কর্তব্য স্থির করার আশার ওপরে ভরসা রেখে কাজ সম্পূর্ণ করবার জন্য ভাগীরথীর দিকে যেতে থাকলেন। মহাভারতকারের ভাষায়—

'ইতি কুন্তী বিনিশ্চিত্য কার্যনিশ্চয়মুত্তমম্।
কার্যার্থমভিনিশ্চিত্য যযৌ ভাগীরথীং প্রতি॥"

"তাহলে মহাভারতকার এতবড় একটা ভুল করলেন কেন?"

"কি ভুল?"

"এই যে যমুনার জায়গায় গঙ্গা লিখেছেন!"

"গঙ্গা নয়, ভাগীরথী।" আমি দিদির ভুল ধরিয়ে দিই।

দিদি বলেন, "ঐ একই কথা।"

"না।" আমি বলি, "গাড়োয়ালে ভাগীরথী গঙ্গার একটি উপনদী আর বাংলায় শাখানদী। ভাগীরথী কখনই গঙ্গা নয়। গোমুখীর ভাগীরথী দেবপ্রয়াগে বদ্রীনাথের অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হবার পরে মিলিতধারার নাম হয়েছে গঙ্গা। আবার বাংলায় এসে গিরিয়ায় সেই গঙ্গা দ্বিধাবিভক্ত হবার পরে ধারা দুটির নাম হয়েছে ভাগীরথী ও পদ্মা।

"গঙ্গা তো শুধু সাধারণ একটি নদী নয়, গঙ্গা উত্তর ও পূর্ব-ভারতের প্রায় সমস্ত নদীর মিলিতধারা। আপনারা জানেন প্রয়াগে যমুনা গঙ্গায় বিলীন হয়েছে। সুতরাং যমুনাকে গঙ্গার একটি উপনদী বলা যেতে পারে। আর এই উপনদীকে যে সেকালে ভাগীরথী বলা হোত না, এমন কোন প্রমাণ নেই আমাদের হাতে।"

জানি না, দিদি আমার যুক্তি মেনে নিতে পারলেন কিনা! কিন্তু

তিনি আর কোন প্রশ্ন করবার সুযোগ পেলেন না। টাঙ্গা নিশ্চল হয়েছে। আমরা তোতাদ্রি মঠে পৌঁছে গিয়েছি।

পথের পাশেই তোতাদ্রি মঠ। সকালে স্টেশন থেকে মন্দিরে যাবার সময় আমরা এ পথ দিয়েই গিয়েছি। কেউ বলে দেয় নি বলে বুঝতে পারি নি যে, এটাই তোতাদ্রি মঠ। তখন দিনের আলোয় দেখতে পারি নি। এখন রাতের অন্ধকারে চেয়ে চেয়ে দেখি।

টাঙ্গা থেকে নেমে পাণ্ডাজীর পেছনে মঠে প্রবেশ করি। বিরাট এলাকা জুড়ে মঠ। একটি নয়, কয়েকখানি বাড়ি। কোনটি সাধুদেব জন্য, কোনটি যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট অর্থাৎ ধর্মশালা। আবার কোনটিতে মন্দির। মাঝে মাঝেই বাগান—শুধু ফুলের নয়, ফল আর সবজির বাগানও আছে। আর আছে কয়েকটি বড় বড় গাছ। ভারী শান্ত সুন্দব ও স্নিগ্ধ পরিবেশ। আপসোস হচ্ছে দিনে আসি নি বলে। খাওয়ার পরে দুপুরের যে সময়টা গাড়িতে বসে কাটিয়েছি, সেই সময়ে অনায়াসে এই বমণীয় আশ্রমটিকে ভাল করে দেখে নেওয়া যেত!

আমরা নাট-মন্দিরে আসি। পাণ্ডাজী ঠিকই বলেছেন সত্যই ভাগবত-পাঠের আসর বসেছে। জনৈক সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী পাঠ করছেন। যে যেখানে পারলাম, বসে পড়লাম। পাঠক বলে চলেছেন—

"সমাগত সুধীবৃন্দ, এখন আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিরাশী অধ্যায় পাঠ করব। এই অধ্যায়ে ভাগবতকার কুরুক্ষেত্রের পুণ্যভূমিতে রাধা-কৃষ্ণের পুনর্মিলনের কাহিনী কীর্তন করেছেন। সেকালে মানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগেই স্যমন্তপঞ্চক বা কুরুক্ষেত্র একটি সর্বভারতীয় তীর্থ। তাই সেবারে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু পুণ্যার্থী নর-নারী কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিলেন। উপস্থিত হয়েছিলেন যাদব কৌরব পাণ্ডব এবং গোপ-গোপীরা।"

"সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে গিয়েছে, শেষ হয়েছে পুণ্যস্নান। পুণ্যার্থীরা

পুলকিত অন্তরে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করছেন। এই সময় ধীরে ধীরে নন্দরাজ ও যশোদা যাদবদের কাছে এলেন। তাঁদের পেছনে অন্যান্য গোপ-গোপীরা। তাঁদের দেখতে পেয়ে প্রত্যেক যাদব আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বসুদেব এগিয়ে এসে নন্দরাজকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

"কৃষ্ণ-বলরামও নন্দ-যশোদাকে দেখতে পেলেন। মুহূর্তে তাঁদের মনে ব্রজভাবের উদয় হল।

"কৃষ্ণ বলে উঠলেন—বাবা!

"বলরাম বললেন—মা!

"আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হলেন তাঁরা। ছুটে এসে নন্দ-যশোদার পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লেন।

"নন্দ-যশোদা রাম-কৃষ্ণকে বুকে তুলে নিলেন। সবার চোখে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হতে থাকল। সবাই শব্দহীন ও নিশ্চল। অথচ তাঁদের বুকের ভেতরে তখন বহু বছরের না-বলা কত কথাই না জমা হয়ে ছিল।

"কিছুক্ষণ পরে বলরাম দেখতে পেলেন একটু দূরে ব্রজবধূরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উৎকণ্ঠিতা। তাঁদের দেখে বলদেব বুঝতে পারলেন যে, এখুনি যদি কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে মিলিত না হন, তাহলে তাঁদের প্রাণপাখী অন্তর-খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে যাবে। 'মহোৎকণ্ঠাস্ফুটৎ হৃদয়াঃ প্রাণান্ জহতীরিব।'

"এই অবস্থা দেখে বিদগ্ধচূড়ামণি বলদেব বাবার কোল ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ধীরপদক্ষেপে সেখান থেকে চলে গেলেন।

"দাদার চলে যাবার শব্দ পেয়ে গোপালও মায়ের কোল থেকে মুখ তুললেন। দেখতে পেলেন গোপীদের। তাঁদের বিরহবিধুরা মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হল রাসবিহারীর। অতি সন্তর্পণে প্রেমাতুরা জননী যশোদার কোল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

কাছেই এক নির্জন স্থানে মদনমোহন মিলিত হলেন ব্রজবালাদের সঙ্গে।

"সেই সময় গোপীদের মনেব অবস্থা বোঝাতে গিয়ে ভাগবত-বক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামীও দিশেহাবা হয়ে পড়েছেন। শুধু বলেছেন, গোপীদের কৃষ্ণানুরাগ ও কৃষ্ণবিরহবেদনা অতুলনীয়।

"যাই হোক গোপীজনবল্লভকে এতকাল পবে কাছে পেয়ে গোপীরা তাঁদের নয়নের মণিকে দু'চোখ দিয়ে আকর্ষণ করতে থাকলেন। বৃন্দাবনচন্দ্রের দু-চোখের দুয়াব দিয়েই তাঁবা তাঁব হৃদয়ে প্রবেশ করে তাঁকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করলেন। প্রগাঢ আলিঙ্গনের ফলে তাঁবা কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সম্পূর্ণ কৃষ্ণভাব প্রাপ্ত হলেন। আর তারপবেই তাঁবা আনন্দ-মূর্চ্ছা লাভ কবলেন।

"বাসবিহারী তখন বিভূতিশক্তি প্রকাশ কবে একই সময়ে এক-সঙ্গে সমস্ত গোপীকে একইভাবে আলিঙ্গন করলেন। আলিঙ্গনেব গাঢতায় গোপীদের মূর্চ্ছা দূব হল।

"কৃষ্ণ তখন সহাস্যে সখীদের জিজ্ঞেস করলেন—আশাকরি তোমাদেব বিরহজ্বালা জুড়িয়েছে। তাবপবে অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদেব সান্ত্বনা দিতে শুরু করলেন। বললেন—এতদিন তোমাদেব কাছে না আসার জন্য তোমবা নিশ্চয়ই আমার ওপরে অভিমান কবেছো। কিন্তু বিশ্বাস করো বৃহত্তব কর্তব্য সাধনের জন্যই সেদিন আমাকে বৃন্দাবন ছেড়ে মথুবায় চলে যেতে হয়েছে আর ঐ একই কারণে আমি মথুরা ছেড়ে দ্বারকায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছি।

"—জানি না তোমরা বিশ্বাস করবে কিনা? কিন্তু না করলেও আমাকে বলতে হবে। কর্তব্যেব প্রয়োজনে আমি দীর্ঘকাল তোমাদের কাছে আসতে পারি নি কিন্তু এর মধ্যে একটি দিনের জন্যও আমি তোমাদের ভুলে যাই নি। অন্তরের অন্তস্থলে যে আরেকটি অন্তর আছে, তোমরা আমার সেই অন্তরের অন্তরতম স্থানে চিরকালের আসন পেতে রেখেছো। আমি তোমাদের ভুলে যাব কেমন

করে? তাহলেও আমি এখুনি তোমাদের সঙ্গে ব্রজে ফিরে যেতে পারব না।

"—কেন? সঙ্গে সঙ্গে সখীরা সমস্বরে প্রশ্ন করলেন। তোমার তো কংসবধ শেষ হয়েছে।

"মৃদু হেসে কৃষ্ণ উত্তর করলেন—কংস তো একজন নয়, জরাসন্ধ শিশুপাল দন্তবক্র প্রভৃতি প্রত্যেকেই এক-একজন কংস। তবে এদের নির্মূল করতে আমার সময় খুব বেশি লাগবে না। আর তারপরেই আমি বৃন্দাবনে ফিরে যাবো, ফিরে যাবো তোমাদের কাছে।

"গোপীরা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই স্তোকবাক্যে মোটেই তুষ্ট হলেন না। তাঁরা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলতে থাকলেন—তা তো বটেই! এই সুদীর্ঘ-কাল সর্বদা তুমি আমাদের স্মরণ করেছো, আমাদের বিরহে তোমার হৃদয় বারবার বিদীর্ণ হয়ে গেছে। কারণ তুমি মহাপ্রেমিক। আর আমরা? আমাদের অন্তরে কি তোমার মতো প্রেম আছে? আমরা একবারও তোমাকে মনে করি নি। আমরা তোমাকে ভুলে সুখের সাগরে ডুবেছিলাম।

"কৃষ্ণ কিছুক্ষণ কোন কথা বললেন না। তারপরে স্নিগ্ধস্বরে বললেন—সখী! তোমরা আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করো না। কারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ অথবা বিয়োগ, বিরহ কিংবা মিলন মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। সবই সৃষ্টিকর্তার অদৃশ্য হাতের কাজ—'নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি সঃ।'

"সখীরা আরও রেগে গেলেন। তাঁরা চীৎকার করে বলে উঠলেন, ওহে বাগ্মীশিরোমণি! যে ভগবান্‌কে তুমি সমস্ত বিরহ ও মিলনের নিয়ন্তা বলতে চাইছ, আমরা বলি, তুমিই সেই ভগবান্। সুতরাং সব দোষ তোমার।

"একটু ভেবে নিয়ে কৃষ্ণ বললেন—বেশ, তোমাদের কথাই মেনে নিলাম। আমিই ভগবান্। কিন্তু ভগবান্ তো পূর্ণ স্বাধীন, কারও

অধীন নন। অথচ আমি অধীন ভগবান্। আমি তোমাদের স্নেহাধীন কারণ তোমরা আমার ভক্ত। আমার বিরহে তোমাদের ভক্তি আরও বেড়ে গিয়েছে। এবং এই বর্ধিত মহাপ্রেমের ফলে তোমরা সর্বাতি-শায়ীরূপে আমাকে প্রাপ্ত হবে। আমিও পরম প্রেমধন লাভ করে ধন্য হব।"

একবার একটু থেমে পাঠক আবার বলতে থাকলেন, — "সমাগত সুধীবৃন্দ! আপনারা জানেন যে, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় এই পরম প্রেমধন প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামা বলেছেন,

'তোমাদের যে প্রেমগুণ, করে আমা আকর্ষণ,
আনিবে আমায় দিন দশ বিশে।
পুনঃ আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ তোমা সনে,
বিলাসিব রজনী দিবসে॥'

"কৃষ্ণ তারপরে ব্রজবধূদের বললেন—আরেকটি কথা। আমি যদি ভগবান্ হই, তাহলে তো আমার সঙ্গে তোমাদের কখনও বিরহ হতে পারে না। সর্বময় ভগবানের সঙ্গে কারও বিরহ হয় না। নিতান্ত অবিবেকবশতঃই তোমাদের মনে হচ্ছে যে, আমার সঙ্গে তোমাদের বিরহ রয়েছে। কাজেই তোমাদের এই অবিবেক ধ্বংস করবার জন্য কয়েকটি উপদেশ দিচ্ছি।

"বলা বাহুল্য শ্রীকৃষ্ণের সেই উপদেশে কোন কাজই হল না। বরং গোপীরা তাঁকে বললেন—আমরা সংসারকূপে পতিতা নই, আমরা তোমার বিরহ-সমুদ্রে নিমজ্জিতা। তোমার জন্য আমরা স্বামী ও সংসার ছেড়েছি। তোমাকে পাবার কামনারূপ তিমি আমাদের গ্রাস করতে চাইছে। হে নিষ্ঠুর, যাবার আগে বলে যাও আমরা কেমন করে বাঁচবো?

"কৃষ্ণকে নিরুত্তর দেখে ব্রজবালারা আবার বললেন—হয় তুমি ব্রজে এসে আমাদের বাঁচাও, নয়তো তুমি আমাদের সবাইকে মেরে

দ্বারকা চলে যাও। দয়া করে কেবল দুঃখ সইবার জন্য আমাদের বাঁচিয়ে রেখো না,

'কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি,
কেন জিয়াও দুঃখ সহাইবারে।'

"—হয়তো তুমি বলবে, এই তো আমরা তোমাকে পেয়েছি। না। এ পাওয়ায় আমাদের বিরহজ্বালা দূর হচ্ছে না। কারণ

'তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভয়।'

"—হে নিষ্ঠুর! তুমি একবার অন্তত আমাদের অবস্থাটি বিবেচনা কর। আমরা ব্রজবাসী, আমরা যে কিছুতেই বৃন্দাবন ছাড়তে পারি না। তুমি তো জানো,

'অন্যের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে মনে এক করি মানি।'

"—আবার আমরা তোমাকেও ছাড়তে পারি না। আমাদের অবস্থা এখন,

'ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায়।'

"—বলে দাও। হে ব্রজমাধব, একবার বলে দাও, আমাদের এখন কি উপায় হবে? হয়তো তুমি জিজ্ঞেস করবে, ব্রজের জন্য আমাদের এ আকুলতা কেন? তার উত্তরে আমরা বলব,

'রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্যগহন।
কাহাঁ গোপবেশ কাহাঁ নির্জন বৃন্দাবন॥
সেইভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥'

"—তোমার বেণু-গীতিতে গীতিময় বৃন্দাবনই আমাদের কাম্য। সে বৃন্দাবন না পেলেই আমাদের মরণ।

'ব্রজ আমার জীবন, তাহা তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন।'

"—তুমি তো জান, তোমার জন্যই বৃন্দাবন আমাদের এত প্রিয়। তুমি কেমন করে সেই বৃন্দাবনকে ভুলে গেলে ?

'বৃন্দাবন গোবর্ধন, যমুনা পুলিন বন,
সেই কুঞ্জ রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজের জনগণ, পিতামাতা বন্ধুগণ,
বড় চিত্তে কেমনে পাসরিলা॥'

"—তুমি মধু-বৃন্দাবনের অনন্ত সম্পদ, তুমি ব্রজধামের প্রাণধন, তুমি একবার ব্রজে চলো, ব্রজবাসীকে বাঁচাও,

'তুমি ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন,
তুমি সকল ব্রজের সম্পদ।
কৃপাদ্রি তোমাব মন, আসি জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় কবাহ নিজপদ।'

"রাধাবাণী ও সখীদের কথায় কৃষ্ণের রাসরজনীর কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন তিনি গোপিনীদের বলেছিলেন—আমি তোমাদের কাছে ঋণী। সে কথাটি যে কতবড় সত্য, কৃষ্ণ তা আজ বুঝতে পারলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ব্রজনারীদের বিরহ-সাগরে ডুবিয়ে রেখে বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গিয়ে তিনি শুধু তাঁর ঋণের বোঝা বাড়িয়েছেন। বৈষ্ণব-কবি তৎকালীন কৃষ্ণের মানসিকতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

'শুনিয়া রাধিকা বাণী, ব্রজ প্রেম মনে জানি,
ভাবে ব্যাকুলিত দেহ মন।
ব্রজলোক প্রেম শুনি, আপনাকে "ঋণী" মানি,
করে কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন॥'[১]

"শ্যামসুন্দর তখন শ্রীরাধিকা ও সখীদের বললেন—

'ব্রজবাসী যতজন, মাতাপিতা সখাগণ,
সব মোর হয় প্রাণসম।
তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন॥'

"—তোমাদের ভালবাসায় আমি বশীভূত। আমি আমার নই, আমি তোমাদেরই। তোমাদের সঙ্গে আমার এই সুদীর্ঘ বিরহ নিতান্তই দুর্দৈব। কিন্তু দুর্দৈবের ওপর তো কারও হাত নেই! তাই আমার পক্ষে এই বিরহকে মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

'তোমা সবার প্রেম রসে, আমাকে করিলে বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমা সবা ছাড়াইয়া, আমা দূর দেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দৈব প্রবল॥'

"—রাধে, এই প্রসঙ্গে তোমাকে আরও কয়েকটি কথা বলব। তুমি 'অকৈতব' প্রেমের কথা শুনেছো। অকৈতব শব্দের অর্থ নির্দোষ। যে প্রেমে কোন কপটতা নেই, কোন স্বার্থগন্ধ এবং সুখানুসন্ধান নেই, আছে শুধু পরস্পরের জন্য পরস্পরের সুখকামনা, তাই অকৈতব প্রেম। অকৈতব প্রেমে কখনও বিরহ হতে পারে না। কারণ সেই প্রেমের প্রেমিকারা বিরহের সময় নিজের কথা না ভেবে প্রিয়জনের কথা ভাবে। ভাবে যে, আমার এই অবস্থার কথা সে যদি জানতে পারে, তাহলে সে আর বাঁচবে না। তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। এই বিরহজ্বালাকে মিলন-মালায় রূপান্তরিত করতে হবে।

"তাছাড়া অকৈতব প্রেমের প্রেমিক-প্রেমিকারা তো উভয়ে উভয়কে প্রাণ-মন সমর্পণ করেছে। অপরকে সমর্পিত প্রাণ সে কেমন করে নাশ করবে? সুতরাং তাদের আত্মহত্যা করার অধিকারও নেই।"

একবার থামলেন পাঠক। সামনে রাখা জলের গ্লাস থেকে এক

ঢোক জল খেয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, "সুধীবৃন্দ, শ্রীকৃষ্ণের সেই বক্তব্যকে জনৈক বৈষ্ণব-কবি বড় সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

'সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান সেই পতি,
বিয়োগ যে বাঞ্ছে প্রিয় হ'তে।
না গণে আপন দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে॥'

"শ্রীকৃষ্ণ তারপরে শ্রীরাধিকাকে বললেন—এতক্ষণ তোমাকে আমি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক-প্রেমিকার কথা বললাম। এবারে আমার কথা শোন!

"—আমি জানতাম, আমার বিরহে তুমি দিন-রাত দগ্ধ হচ্ছ, তুমি মরণোন্মুখ হয়ে আছো। পাছে তুমি আমার বিরহজ্বালায় প্রাণত্যাগ করো, তাই আমি প্রতিদিন নারায়ণের কাছে, তোমার প্রাণভিক্ষা করতাম।

"—অবশেষে নারায়ণ আমাকে এমন শক্তি দান করলেন যে, প্রতিদিন তোমার কাছে এসে তোমাকে দেখতাম, বহুক্ষণ ধরে তোমার সঙ্গে প্রেমক্রীড়া করতাম। ফলে আমাদের দুজনেরই বিরহতাপ প্রশমিত হত।

"—তুমি কিন্তু আমার এই আসা-যাওয়া টের পেতে না। কারণ যোগমায়া দেবী তোমাকে তা বুঝতে দিতেন না। ফলে তুমি সেই প্রেমক্রীড়াকে তোমার মনের সহজাত আনন্দ বলে ধরে নিতে।

"কৃষ্ণের এই কথাকেও বৈষ্ণব-কবি বড় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন,

'রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তাঁর শক্ত্যে আমি নিতি নিতি।
তোমা সনে ক্রীড়া করি, পুনঃ যাই, যদুপুরী,
তাহা তুমি মান মোর স্ফূর্তি॥'

"কৃষ্ণ সেদিন রাধারাণীকে আরও অনেক কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—আমার প্রতি তোমার যে প্রবল প্রেম, সেই প্রেমবলে আমি তোমারই, শুধু তোমারই। আবার তোমার সেই প্রেমধনকে আমিও পরম সম্পদ বলে মনে করি। সুতরাং আমাদের প্রেমও অকৈতব প্রেম। এ প্রেমের ক্ষয় নেই।

"—আমার বিশ্বাস, যে প্রেম প্রতিদিন অপ্রকটভাবে আমাকে তোমার কাছে আকর্ষণ করেছে, অদূর ভবিষ্যতে সেই প্রেম প্রকট-ভাবেও আমাকে তোমার কাছে নিয়ে আসবে। আমরা আবার মধু-বৃন্দাবনে মিলিত হব।

'মোর ভাগ্যে মো বিষয়, তোমার যে প্রেম হয়,
সেই প্রেম পরম প্রবল।
লুকাইয়া আমা আনে, সঙ্গ করায়া, তোমা সনে,
প্রকটেই আনিবে সত্বর॥'

"রাধারমণ নীরব হলেন। তাঁর দু-চোখের কোল বেয়ে প্রেমগঙ্গা প্রবাহিত হতে থাকল। আনন্দাশ্রুর প্রবাহে রাধারাণীও বাক্যহীনা। দুজনের তখন একই অবস্থা। ভক্তকবির ভাষায়—'লোরে দুঁহু দেখিতে না পায়।'

॥ এগারো ॥

গতকাল রাত সাড়ে ন'টায় ট্রেন ছেড়েছে দ্বারকা থেকে। দূরত্ব কম বলেই বোধহয় কাল আমাদের দ্বারকা মেল-য়ের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। পথে মিঠাপুর নামে একটি মাত্র স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। মিঠাপুর বেশ সমৃদ্ধ জায়গা। সেখানে বিড়লাদের একটি ক্যামিক্যাল্‌স ফ্যাক্টরী রয়েছে। আর আছে মিঠে জল। মিঠাপুরের মিঠে জল ওখাবাসীদের তৃষ্ণা মিটায়। সীমাহীন সাগর-সৈকতে অবস্থিত হয়েও ওখা তার অধিবাসীদের তেষ্টা মেটাতে পারে না। রেলযোগে ওখার পানীয় জল আসে মিঠাপুর থেকে।

কালরাতে তোতাদ্রি মঠে ভাগবত-পাঠ শুনে গাড়িতে আসার কিছুক্ষণ পরেই গাড়ি ছেড়েছে দ্বারকা থেকে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা গন্তব্যস্থল ওখায় পৌঁছে গিয়েছি। শুধু আমাদের নয়, দ্বারকা মেল-য়েরও গন্তব্যস্থল ওখা। দ্বারকার নামে ট্রেনটির নাম কিন্তু তার যাত্রাপথ শেষ হয় দ্বারকা ছাড়িয়ে ওখায় এসে। আমরা কাল ওখা এসেছি, আজ বেট-দ্বারকা দর্শন করব বলে।

গুজরাতী ভাষায় বেট (Vet/Bait/Beyt) শব্দের অর্থ দ্বীপ। অর্থাৎ বেট-দ্বারকা মানে দ্বীপ-দ্বারকা। আমরা আজ সেই দ্বীপতীর্থ দর্শন করব।

অনেকে একে ভেট-দ্বারকাও বলেন। ভেট মানে দুই বন্ধুতে দেখা সাক্ষাৎ। কিংবা সাক্ষাতের পরে দেওয়া সওগাত বা উপঢৌকন। কথিত আছে ওখানেই বাল্যবন্ধু শ্রীদাম ওরফে সুদামা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি কৃষ্ণের জন্য একমুঠো চিঁড়ে ভেট নিয়ে এসেছিলেন।

রেলপথে দ্বারকা থেকে ওখার দূরত্ব ৩০·৫ কিলোমিটার; মোটরপথে ৩২ কিঃ মিঃ। বম্বে থেকে জলপথেও ওখা আসা

যায়। প্রতি সপ্তাহে সিন্ধিয়া কোম্পানীর একখানি জাহাজ যাওয়া-আসা করে।

ওখা কাথিওয়াড় উপদ্বীপের উত্তরতম প্রান্তে অবস্থিত, কচ্ছ উপসাগরের তীরে পশ্চিম-ভারতের একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। বন্দরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে জনপদ। আয়তন ৪·৩৯ বর্গ কিঃ মিঃ। ১৯০৮টি বাড়িতে ১০,৬৮৭ জন স্থায়ী বাসিন্দা নিয়ে বর্তমান বন্দর-নগরী ওখা।

প্রাতরাশ সেরে সকাল সওয়া আটটা নাগাদ গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। আমরা দ্বারকা দর্শন সেরে বেট-দ্বারকায় যাচ্ছি—সবাই তাই যান।

রেল-লাইন পেরিয়ে বাঁধানো পথ ধরে এগিয়ে চললাম। বাঁদিকে বন্দর কর্তৃপক্ষের দেওয়াল-ঘেরা সুরক্ষিত এলাকা। সামনে সাগর—সীমাহীন সাগর। পুরী কিংবা দীঘার মতো বিক্ষুব্ধ বারিধি নয়, শান্ত ও সুনীল বারীশ। অথচ শুনেছি সমুদ্র এখানে খুবই গভীর। তাই বারোমাস বড় বড় জাহাজ সোজাসুজি জেটিতে এসে ভিড়তে পারে।

বন্দর কর্তৃপক্ষের সংকীর্ণ বাঁধানো পথটি এসে প্রশস্ত রাজপথের সঙ্গে মিলিত হল। পথটি অনেকটা বাঁধের মতো। বাঁদিকে বেলাভূমি, ডানদিকে সারি সারি সুদৃশ্য বাংলো। প্রত্যেক বাংলোর সামনে বাগান। রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে যাত্রীবাহী বাস ও অন্যান্য যানবাহন যাতায়াত করছে। আমরা সমুদ্রতীর ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি।

রেল-স্টেশন্ থেকে প্রায় এক কিলোমিটার এসে স্টীমার-স্টেশন্। একটি বেশ বড় জেটি, যাত্রীদের জন্য মাঝারি বিশ্রামাগার ও ছোট টিকিটঘর নিয়ে স্টেশন্। আমরা টিকিট কেটে লঞ্চে নেমে এলাম। ওখা থেকে বেট-দ্বারকা ৫ কিলোমিটার। ভাড়া ৬০ পয়সা।

লঞ্চ না বলে একে বড় মোটরবোট বলাই উচিত হবে। চারি-পাশে উঁচু বসবার জায়গা। মেয়েরা বিশেষ করে বৃদ্ধারা বসতে

চাইছেন না। তাঁদের বক্তব্য লঞ্চ চললেই তাঁবা জলে পড়ে যাবেন এবং একবাব জলে পড়ে গেলে আব বাঁচবেন না। অনেক বলে-কয়ে তাঁদের ভয় ভাঙানো গেল।

সকাল ন'টায় লঞ্চ ছাড়ল। শান্ত সমুদ্রেব বুক চিরে সোজা পুবে এগিয়ে চললাম। বহু পালতোলা নৌকো নিশ্চিন্তে যাতায়াত করছে। দেখে ভীত সহযাত্রিণীবা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলেন।

ওখা বন্দবেব জাহাজঘাট দেখা যাচ্ছে এখন। বেশ কয়েকখানি বড় বড় জাহাজ নোঙব কবে আছে। মাল খালাস ও বোঝাই করার কাজ চলেছে।

অনেকটা এগিয়ে এসেছি, সামনে বেট-দ্বাবকাকে দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সবুজ-স্বপ্নেব দেশ। আব পেছনে ওখাকে দেখাচ্ছে একখানি পটে-আঁকা ছবিব মতো। দ্বাবকা ও মিঠাপুবকেও দেখতে পাচ্ছি দক্ষিণে। কিন্তু দ্বাবকা কিংবা ওখাব কথা আব নয়, বেট-দ্বারকার কথাই ভাবা যাক্। আমবা যে এখন সেখানেই চলেছি।

২২°২৮´ উত্তব অক্ষবেখা এবং ৬৯°৮´ পূব দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই দ্বীপতীর্থ। জনপ্রিয নাম শঙ্খোদ্ধাব-বেট। মূল ভূখণ্ড বা ওখামণ্ডলের ৫ কি. মি. দক্ষিণে কচ্ছ উপসাগবেব একটি বালি ও প্রস্তবময় সংকীর্ণ দ্বীপ। আকাবটি অবিকল শঙ্খেব মতো। এখানে প্রচুব শঙ্খ পাওয়া যায়। নিযমিত বপ্তানি হয়। আগে উড়িষ্যায় পর্যন্ত চালান যেত।

শাঁখেব মতো দেখতে বলেই কিন্তু এ দ্বীপেব নাম শঙ্খোদ্ধার-বেট নয়। কথিত আছে, বিষ্ণুর সাহায্যে মহাদেব এখানে শঙ্খচূড় দৈত্যকে সংহার কবেছিলেন এবং এখানেই নাবায়ণ শঙ্খচূড়েব স্ত্রী তুলসীদেবীর সতীত্বনাশ কবে তাঁকে গুল্মে রূপান্তবিত কবেন। আব তাই বেট-দ্বারকাব অপব নাম বমণ-দ্বীপ। জানি না শ্রীমদ্ভাগবতেব কালীয়দমন লীলায় বর্ণিত বমণক-দ্বীপের সঙ্গে বেট-দ্বাবকাব কোন সম্পর্ক আছে কিনা !*

* লেখকের 'মধু-বৃন্দাবনে' (ব্রজপর্ব) দ্রষ্টব্য

আরও একটি নাম আছে বেট-দ্বারকার—সানজানা। য়ুরোপীয় বণিকরা যখন প্রথম এদিকে আসেন, তখন সানজানা নামে জনৈক জলদস্যু এখানে রাজত্ব করত। তাই তাঁরা এ দ্বীপের নাম রেখে-ছিলেন সানজানা।

মাত্র মিনিট পঁচিশ পরেই আমাদের সমুদ্রযাত্রা শেষ হল। লঞ্চ নোঙর করল বেট-দ্বারকার জেটিঘাটে। এখান থেকেই বাড়ি-ঘর দেখা যাচ্ছে। শুনেছি ৬৫৮টি বাড়িতে ৬৬৭টি পরিবার বাস করেন এই দ্বীপে। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ৩,৬৭১ জন। পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি, ১৮৭২ জন। দ্বীপের আয়তন ১১·৫ বর্গ কি. মি.। গড়ে বছরে প্রায় লক্ষাধিক তীর্থযাত্রী এখানে আসেন, আমি তাঁদেরই একজন।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিষ্ণুর শঙ্খোদ্ধার-লীলার কোন সম্পর্ক আছে বলে জানা নেই আমার। তাহলেও জন্মাষ্টমী বেট-দ্বারকার বৃহত্তম বাৎসরিক উৎসব। তখন এখানে বেশ বড় মেলা হয়। কারণ স্থানীয় অধিবাসীরা মনে করেন এটাই শ্রীকৃষ্ণেব আসল দ্বারকা।

জেটির বাইরে আসার সময় ৩০ পয়সা করে তীর্থযাত্রী-শুল্ক দিতে হল। এটা স্থানীয় পঞ্চায়েতের আয়। তার মানে কেবলমাত্র তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকেই তাঁরা বছরে হাজার তিরিশ টাকা আয় করে থাকেন।

জেটি পেরিয়ে পথে এলাম—সংকীর্ণ ও চড়াই পথ। খানিকটা সামনে গিয়ে মূল-পথে মিশেছে। সে পথটি সমতল। কয়েক মিনিট পদচারণার পরে আমরা সারি বেঁধে সেই পথে উঠে এলাম। পথের দু-পাশেই বাড়ি-ঘর আর দোকান-পাট। অধিকাংশই মনোহারী দোকান। খেলনা থেকে পুজোর উপকরণ পর্যন্ত সবই পাওয়া যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, আমার কলকাতাবাসী সহযাত্রিণীরা অনেকেই প্রলুব্ধ হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁদের মনোবাসনা পূর্ণ হল না। ম্যানেজার কড়া নির্দেশ দিল—কেনাকাটা এখন নয়, ফেরার পথে।

বাঁদিকে এগিয়ে চলি। সামান্য খানিকটা হেঁটেই একটি তোরণ। এখান থেকেই বোধকরি মন্দির-এলাকা শুরু হল। কয়েক পা এগিয়ে আবার একটি তোরণ। তারপরেই ডানদিকে মন্দির। প্রথমে পুরনো, পরে নতুন মন্দির। পুরনো মন্দিরটি জরাজীর্ণ, এখন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

অনেকে বলেন, শঙ্খচূড়ের মৃত্যুর পরে সত্যযুগে নির্মিত হয়েছিল ঐ মন্দিরটি। আমার কিন্তু মন্দিরের গড়ন ও অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এটি কলিযুগে নির্মিত। মন্দিরটির বর্তমান অবস্থাও এই সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করছে। আর শঙ্খচূড়ের কাহিনী কিছুতেই সত্যযুগের হতে পারে না। কারণ সেটি কৃষ্ণলালার পরে অনুষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

পুরাতাত্ত্বিকরা অবশ্য অন্য কথা বলেন। তাঁদের মতে, বিষ্ণুর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত বেট-দ্বারকার আদি-নারায়ণ মন্দিরটি সম্ভবতঃ কোন বৌদ্ধস্তূপের ওপরে নির্মিত। রাজস্থানী ইতিহাসের জনক কর্ণেল টড্* ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে এখানে এসেছিলেন। তিনি এখানে অনেক বুদ্ধমূর্তি দর্শন করেছেন। মাত্র কয়েক বছর আগেও সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী এখানকার পাঠাগার থেকে একটি প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি বোম্বাই নিয়ে গিয়েছেন। তাছাড়া পুরাতাত্ত্বিকরা এখানে প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের আরও বহু নিদর্শন পেয়েছেন।

তবে এই দ্বীপে যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই বৈদিক দেব-দেবী পূজার প্রচলন ছিল, তারও অসংখ্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে।

একখানি পাথরে খোদিত একটি অপূর্ব-সুন্দর প্রাচীন নব-মাতৃকা অথবা নব-গ্রহ মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। শুনেছি সেটি এই মন্দিরের কোন দেওয়ালেই স্থাপিত করা হয়েছে। মূর্তিটি নাকি ইতিহাস ও পুরাতাত্ত্বিক গবেষকদের কাছে এক মূল্যবান সংগ্রহ।

বেট-দ্বারকায় প্রাপ্ত সবচেয়ে প্রাচীন মূর্তিটিও লক্ষ্মী-নারায়ণের।

* লেখকের 'রাজভূমি-রাজস্থান' দ্রষ্টব্য।

মহাকাল এখনও সেই মূর্তিটিকে নষ্ট করে ফেলতে পারে নি। এমনকি নারায়ণের শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম পর্যন্ত পরিষ্কার বোঝা যায়। সেই মূর্তিটি নিয়েও বিশদ গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ পণ্ডিতরা মনে করছেন, সেটির সাহায্যে এই দ্বীপের প্রাচীন ধর্মীয় ইতিহাসের অবলুপ্ত অধ্যায়কে উদ্ধার করা সম্ভব।

একটি বড় দরজা পেরিয়ে আমরা নতুন মন্দির প্রবেশ করি। দারোয়ান ছুটে আসে আমার কাছে। কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই সে ছোঁ-মেরে আমার কাঁধ থেকে ক্যামেরাটি নিয়ে নেয়। বলে, ফেরার সময় ফেরত নিয়ে যাবেন।

ভারতের অধিকাংশ বড় :মন্দিরেই ক্যামেরার প্রতি এই অশ্রদ্ধা দেখতে পেয়েছি। বিগ্রহ তো দূরের কথা, নাট-মন্দিরের ভেতরে পর্যন্ত ছবি তুলতে দেওয়া হয় না। কেন তা আজও বুঝে উঠতে পারলাম না। কারণ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে দেখেছি, তাঁরা যুক্তিতর্কের ধার ধারেন না। জিদের বশেই তাঁরা এই অর্থহীন নিয়মটি চালু রাখতে বদ্ধপরিকর।

দারোয়ানের হাতে ক্যামেরাটি সমর্পণ করে নিঃশব্দে নাট-মন্দিরের মাঝখানে এসে দাঁড়াই। মন্দির তো নয়, একটি ছোট দুর্গ। বাইরের দিকে একটিমাত্র দরজা। তিনদিকেই উঁচু এবং মজবুত দেওয়াল। মন্দির মোটেই প্রাচীন নয়। মাত্র ১৮৫ বছর আগে কচ্ছের তৎকালীন রাও এই মন্দিরটি নির্মাণ করে দিয়েছেন। তখন মুসলমান রাজত্বকাল শেষ হয়ে গিয়েছে তবু এ মন্দিরকে যথাসাধ্য সুরক্ষিত করে তোলা হয়েছে।

নাট-মন্দিরটি বেশ প্রশস্ত। মেঝেতে মূল্যবান টাইল্‌স। তবে দেওয়ালে কোন কারুকার্য দেখতে পাচ্ছি না। স্তম্ভগুলি কাঠের তৈরি। প্রাচীন মন্দিরটির গড়নও নাকি এমনি ছিল।

মন্দিরের ঠিক মাঝখানে গেরুয়া পরিহিত বারোজন তরুণ ব্রহ্মচারী সমবেতকণ্ঠে কীর্তন করছেন। একটু দূরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে

জনৈক ভক্ত একক-ভজন গাইছেন। সুন্দর একটি উৎসবের পরিবেশ রচিত হয়েছে।

কিছুক্ষণ গান শুনে আমরা দর্শন শুরু করি। নাট-মন্দিরের দু-ধারে পাশাপাশি তিনটি করে ছ'টি ছোট মন্দির রয়েছে। প্রথমেই দরজার দু-পাশে রাধারাণী ও রুক্মিণীদেবীর মন্দির। নির্মাতারা বোধ করি মন্দিরের জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ও দ্বারকালীলার মাঝে মিলন ঘটাবার চেষ্টা করেছেন।

ব্রজেশ্বরী ও দ্বারকেশ্বরীকে প্রণাম করে আমরা অন্যান্য মন্দিরগুলি দর্শন করি—দ্বারকানাথ সত্যভামা জাম্ববতী ও দেবকী-মায়ের মন্দির। বলরাম প্রদ্যুম্ন গরুড় অম্বিকা বেণীমাধব এবং পুরুষোত্তম ভগবানেরও মূর্তি রয়েছে এখানে। আমরা তাঁদের প্রণাম করি।

মন্দিরগুলো ছোট হলেও সুসজ্জিত। প্রত্যেকটি মন্দিরের দরজা রুপোর পাতে মোড়া। তার ওপরে সুন্দর কারুকার্য। দরজার সামনে খানিকটা জায়গা রেলিং দিয়ে ঘেরা। মেয়েরা ঢুকতে পারে সেই অংশে। আমাদের বাইরে দাঁড়িয়ে দর্শন করতে হল।

এই ছোট মন্দির ছ'টি ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দের মুসলমান আক্রমণের পরে প্রথম নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু ১৮৫৮-৫৯ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ বাহিনী কর্ণেল ডনোভ্যানের নেতৃত্বে সেগুলি ধ্বংস করে ফেলে। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এমন নজীর খুব বেশি নেই। যাই হোক্, অনুতপ্ত ব্রিটিশ শাসকেরা সে বছরই বরোদার গায়কোয়াড়কে আবার মন্দিরগুলি পুনর্নির্মাণের অনুমতি দেন।

ব্রহ্মচারীদের কীর্তন শেষ হয়ে গেল। তাঁরা চলে গেলেন মন্দির থেকে। ভক্তের ভজন শেষ হয় নি। কিন্তু আমরা তাঁর পাশে আর না দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে নাট-মন্দিরের দেওয়ালে টাঙানো রঙীন ছবিগুলো দেখতে থাকি। ভরতের পাদুকা-পূজন, গরুড়ের দেহত্যাগ, মা-যশোদার গো-দোহন, রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে উপদেশ দান ও বিশ্বরূপ-দর্শন প্রভৃতির ছবি রয়েছে এখানে।

দর্শন সেরে নাট-মন্দির থেকে গর্ভ-মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলি। কয়েক পা এগিয়েই মন্দির—শঙ্খনারায়ণের মন্দির। মন্দিরের গড়ন অনেকটা দ্বারকার মন্দিরের মতো, তবে আকারে অনেক ছোট।

এখন দর্শন বন্ধ, দরজার সামনে পর্দা ঝুলছে। জনৈক ব্রহ্মচারী জানালেন, "একটু বাদেই দর্শন শুরু হবে। আপনারা ততক্ষণে নারায়ণের গদি ঘুরে আসুন।"

সহযাত্রী অমিয়বাবু প্রশ্ন করেন, "কোথায় গদি ?"

"এই তো পাশেই।" ব্রহ্মচারী ইশারায় দেখিয়ে দেন।

ষোড়শী সহযাত্রিণী বিউটি জিজ্ঞেস করে, "শঙ্খনারায়ণ দৈনিক ক'বার দর্শন দান করেন ?"

"চারবার। সকাল সাড়ে সাতটা ও সাড়ে ন'টায় এবং বেলা বারোটা ও বিকেল পাঁচটায়। সন্ধ্যে আটটায় মন্দির বন্ধ হয়ে যায়।"

বিউটি কলেজে পড়া আধুনিকা। সুতরাং সে ঘড়ি দেখে পাল্টা প্রশ্ন করে, "সাড়ে ন'টা তো বেজে গিয়েছে, এখনও দর্শন শুরু হয় নি কেন ?"

ব্রহ্মচারী লজ্জা পান। সবিনয়ে বলেন, "এখুনি শুরু হবে। আপনারা ততক্ষণে গদিটা একবার ঘুরে আসুন।"

গর্ভ-মন্দিরের পাশেই মন্দির কর্তৃপক্ষের গদি বা অফিস। মাঝারি আকারের একখানি ঘর। একপাশে একটা লোহার সিন্দুক ও কিছু খাতাপত্র, আরেক পাশে একখানি খাটিয়া। খাটিয়ার দিকের দেওয়ালে কয়েকখানি কৃষ্ণলীলার রঙীন ছবি, তার মধ্যে কৃষ্ণ-সুদামার ছবিখানি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

বারো

জনৈক স্বাস্থ্যবান ও সুদর্শন প্রৌঢ় খাটিয়াব ওপরে আধশোয়া হয়ে ছিলেন। ব্রহ্মচাবী সবিনয়ে বললেন, "মন্দিরেব অধ্যক্ষ।"

আমরা ভেতরে ঢুকে দু-হাত তুলে তাঁকে নমস্কার করি। তাড়াতাড়ি উঠে বসে ভদ্রলোক বলে ওঠেন, "নমস্কার! বসুন, বসুন।"

আমরা আপত্তি না কবে বসে পড়ি।

অধ্যক্ষ ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে বলতে শুরু করেন, "এই যে বেট-দ্বাবকায় আপনারা আজ এসেছেন এটাই আসল দ্বারকা—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা, মহাভারত এবং পুরাণের দ্বারকা। আপনারা বহুদূর থেকে তীর্থদর্শনে এসেছেন, আপনারা সকলেই ভক্ত –কৃষ্ণভক্ত। আপনারা জানেন, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চাশ অধ্যায়ের উনপঞ্চাশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুবা নির্মাণের কাহিনী বলা হয়েছে—

'ইতি সম্মন্ত্র্য ভগবান্ দুর্গং দ্বাদশযোজনম্।
অন্তঃসমুদ্রে নগবং কৃৎস্নাদ্ভুতমচীকরৎ॥'

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মন্ত্রণা করে সমুদ্রের ভেতরে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত এক দুর্গ এবং সেই দুর্গের মধ্যে এক আশ্চর্য নগর নির্মাণ কবলেন।

"অথচ আপনারা যে দ্বারকা দেখে এসেছেন সে দ্বারকার এক-দিকে সমুদ্র, সে দ্বারকা সাগরের ভেতরে নয়। আর দেখুন, আমাদের এই বেট-দ্বারকার চারিদিকেই সমুদ্র। সুতরাং এই হচ্ছে আসল দ্বারকা। এখানেই ছিল শ্রীকৃষ্ণের রাজপুবী, এখানেই শ্রীকৃষ্ণ বাল্যবন্ধু সুদামার সেবা করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের আশি ও একাশি অধ্যায়ে ভগবদনুগ্রহে ব্রাহ্মণেব সমৃদ্ধি-লাভের সে কাহিনী বলা হয়েছে।"

থামলেন অধ্যক্ষ। এতক্ষণে কৃষ্ণ-সুদামা ছবিখানি টাঙিয়ে রাখবার কারণ বুঝতে পারি। কিন্তু আমরা কেউ কিছু বলতে পারার আগেই সহযাত্রী বড়-ঠাকুরমা বিশুদ্ধ বাঙ্গাল ভাষায় প্রশ্ন রাখলেন, "গল্পটা এট্টু কয়েন না ঠাকুরমশায়!"

অধ্যক্ষ ফরমাশটা বুঝতে না পেরে অসহায় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকান। আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিতেই তিনি সহাস্যে আবার বলতে থাকেন, "আপনারা জানেন কংসবধের পরে কৃষ্ণ ও বলরাম সান্দীপনি মুনির কাছে বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন। তখন শ্রীদাম বা সুদামা নামে একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালক ছিলেন তাঁদের সহপাঠী। লেখাপড়া শিখে শ্রীদাম বেদজ্ঞ হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন জিতেন্দ্রিয় ও বিষয়াসক্তিশূন্য। ফলে তাঁর দারিদ্র্য ঘোচে নি। কৃষ্ণ যখন পরম ঐশ্বর্যশালী ও যশস্বী হয়ে দ্বারকায় রাজত্ব করছেন, সুদামার তখন দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন জোটানো দায়।

"সুদামার ব্রাহ্মণী সুরূপা রোজই ভাত কলমীশাক ও তেতুল-পাতার অম্বল রেঁধে স্বামী ও ছেলের পাতে দেন। স্বামী নিঃশব্দে খেয়ে ওঠেন। কিন্তু একদিন শিশুপুত্র বেণু বলে বসল— আমি রোজ রোজ এ খাবার খেতে পারব না। আমি আজ পায়েস খাব।

"সুদামা গর্জে উঠলেন। সুরূপাকে বললেন—দেখ, তোমার এই ছেলের জ্বালায় আমি দেশান্তরী হব।

"সুরূপা স্বামীকে বললেন—আহা! দুধের শিশু বৈ তো নয়, একটা আবদার করেছে। আমি সই-য়ের কাছ থেকে চাল দুধ ও মিষ্টি চেয়ে এনে ওকে একটু মিষ্টান্ন করে দিচ্ছি।

"—এমন আবদার ভাল নয়। সুদামা বললেন -ও আমাকে নির্ঘাৎ দেশান্তরী করে ছাড়বে। তুমি দেখে নিও।

"পায়েস খেয়ে বেণু ঘুমিয়ে পড়ার পরে সুরূপা স্বামীকে বললেন —তুমি বলছিলে না দেশান্তরী হবে। তা একবার দ্বারকায় যাও না। যদুপতির সঙ্গে এক টোলে পড়েছো। তিনি এখন দ্বারকার রাজা।

শুনেছি তাঁব কাছে যে যা চায়, তাই পায়। আমাদের জন্যে নয়, বেণুর জন্য কিছু চেয়ে আনো। তাকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

"—কিন্তু দ্বারকা যে বহুদূর!

"—তা হোক্ গে। কত লোকই তে যাচ্ছে সেখানে

"—বেণুকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে কি?

"—কটা দিন যেমন করে পারি, কাটিয়ে দেব।

"—এতদিন পরে যাচ্ছি, সখার জন্য তো কিছু নিয়ে যেতে হয়।

"সুরূপা পরদিন সকালে প্রতিবেশীর কাছ থেকে চারমুঠো চিঁড়ে চেয়ে এনে সুদামার কোঁচড়ে বেঁধে দিলেন। বেণুকে কাঁধে নিয়ে ব্রাহ্মণ দ্বারকার পথে যাত্রা করলেন।

"পথে তাঁর মহাবিপদ হল। একটা বানব বেণুকে চুরি করে নিয়ে গেল। তিনদিন অনাহারে দেবালয়ে ধর্ণা দিয়েও ছেলেকে ফিবে পে· ন না। ভাবলেন—কার জন্য দ্বারকায় যাওয়া? তবু যাই। দ্বাবকাধীশেব কাছে নাকি যে যা চায়, তাই পায়। দেখি যদি বেণুকে ফিরে পাই!

"সুদামা দ্বারকায় এলেন। রাজপ্রাসাদ অর্থাৎ এই মন্দিরের সামনে আসতেই দ্বারকাধীশ ছুটে গিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। জিজ্ঞেস করলেন—সখা, ভাল আছো তো?

"—হ্যাঁ। সুদামা উত্তর দিলেন। ভক্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিজের দারিদ্র্য ও পুত্র-হবণেব কথা বলতে পারলেন না ভগবানকে।

"শ্রীকৃষ্ণ শৈশব-সখাকে পরম-সমাদবে ভেতরে নিয়ে এলেন। তিনি পা ধুইয়ে সুদামাকে অভ্যর্থনা-কক্ষে এনে বসালেন। তাঁকে অর্ঘ্যদান করলেন। মণিমুক্তা-খচিত সুবর্ণময় প্রাসাদের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য দেখে সুদামা অস্বাস্তি বোধ করতে থাকলেন, তিনি ঘামতে আরম্ভ করলেন। আর ঠিক তখুনি রুক্মিণী এলেন সেখানে। সুদামাকে প্রণাম করে বললেন—সখা, পায়ের ধুলো দিন।

"কোনমতে সামলে নিয়ে সুদামা সহাস্যে বললেন—পাব কোথায় ? সবই যে আমার সখা ধুইয়ে দিয়েছে।

"রুক্মিণী বললেন—এবার তাহলে খেতে চলুন।

"সুদামা খেতে বসলেন। কেশব তাঁর পাশে বসে রইলেন। রুক্মিণী নিজে পরিবেশন করলেন। এত যত্ন করে সুদামাকে কেউ কোনদিন খাওয়ায় নি, এমন সুস্বাদু খাবারও তিনি খান নি কোনদিন।

"খাবার পরে সুদামা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিশ্রামকক্ষে এলেন। সহসা কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে—সখা, সখী আমার জন্য কি উপহার পাঠিয়েছে ?

"সুদামা মুশকিলে পড়লেন। এই ঐশ্বর্যের মধ্যে তিনি সেই চিঁড়ে বার করেন কেমন করে ? তিনি চুপ করে রইলেন।

"কৃষ্ণ বললেন—নিশ্চয়ই কিছু এনেছো। বলেই অন্তর্যামী কৃষ্ণ সুদামার কোঁচড় থেকে সেই চিঁড়ে কেড়ে নিলেন। একমুঠো মুখের ভেতর চালান করে দিয়ে পরমানন্দে চিবুতে থাকলেন। লজ্জিত বদনে সুদামা নীরবে বসে রইলেন।

"খাওয়া শেষ হলে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—সখা, তুমি এমন ভোজ্য লুকিয়ে রেখেছিলে ! জীবনে আর দু-দিন এমন অমৃত আস্বাদন করেছি —একদিন বিদুরের ঘরে খুদ, আরেকদিন পাঞ্চালীর উচ্ছিষ্ট শাকান্ন। এই বলে কৃষ্ণ আবার যেই আরেকমুঠো চিঁড়ে মুখে দিতে যাবেন, অমনি রুক্মিণী ছুটে এসে তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন—প্রভু, তুমি একমুঠো গ্রহণ করার পরেই আমি শুদ্ধ ব্রাহ্মণের পায়ে বিকিয়ে গিয়েছি। আর তোমার কি আছে যে তুমি আরেকমুঠো খেতে যাচ্ছো ?

"কৃষ্ণ হেসে সুদামাকে বললেন—সখা, এবার শুয়ে পড়।

"কিন্তু সেই দুগ্ধ-ফেন-নিভ সুকোমল শয্যায় গা এলিয়ে দিয়েই সুদামার মনে হল তিনি তলিয়ে যাচ্ছেন। আর তারপরেই শ্রীকৃষ্ণ এবং রুক্মিণী তাঁর পা টিপতে শুরু করে দিলেন।

"ঘুম ভাঙ্গার পরে সুদামা দেখলেন, লক্ষ্মী-নারায়ণ তাঁর সামনে

করজোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর বেণুর কথা মনে পড়ল। তিনি কৃষ্ণকে সব খুলে বললেন। কৃষ্ণ উত্তর দিলেন—বেণুকে চাও, পাবে। কিন্তু আসল ছেড়ে নকল কেন? স্বপ্ন নিয়ে আর ভুলে থেকো না। এই বিশ্ব-সংসার স্বপ্ন, কেবল আমিই সত্য। আমাকে জানো, বন্ধন ঘুচে যাবে।

"বিস্মিত ব্রাহ্মণ বললেন—বেণু স্বপ্ন? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!

"—পারবে না। কৃষ্ণ উত্তব দিলেন—সমাধি না হলে একথা বুঝতে পারা যায় না। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখার সময় মনে হয়, সব সত্য। কিন্তু চোখ মেললেই স্বপ্ন মিলিয়ে যায়। আবার তেমনি সংসার-স্বপ্ন চোখ বুজলে মিলিয়ে যায়। জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলন কর, দেখবে সব স্বপ্ন—সব মায়া।

"সব স্বপ্ন, সব মায়া—এই কথা ভাবতে ভাবতে সুদামা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। সুরূপার পরামর্শমতো নিজের দারিদ্র্যের কথা তিনি কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারলেন না কৃষ্ণকে, কোন সাহায্যই চাইতে পারলেন না দ্বারকানাথের কাছে।

"কিন্তু তিনি তো অন্তর্যামী। কাজেই সুদামা ঘরে ফিরে সবিস্ময়ে দেখতে পেলেন, তাঁর ভাঙা কুটিরের জায়গায় এক সুবিশাল প্রাসাদ। ধন-রত্ন দাস-দাসী কোন কিছুরই অভাব নেই। সবচেয়ে বিস্ময়কর, বেণুকে কোলে নিয়ে সুরূপা সহাস্যবদনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেই প্রাসাদের সামনে। তিনি সুদামাকে সাদর সংবর্ধনা জানাচ্ছেন।

"সুদামা ভাবলেন—প্রভু যা বলেছেন, তাই ঠিক। সব স্বপ্ন, সব মায়া।"

অধ্যক্ষ থামতেই ছোট-ঠাকুরমা জিজ্ঞেস করেন, "সেই সুদামাপুরী কোথায় ছিল ঠাকুরমশায়?"

"পোরবন্দরে। সমুদ্রের তীর দিয়ে হেঁটে গেলে সোজা পথে ওখা থেকে দূরত্ব বেশি নয়, কিন্তু রেলে যেতে হলে অনেকটা ঘুরে যেতে হয়।"

একবার থামলেন অধ্যক্ষ। কিন্তু আমরা কেউ কিছু বলতে পারার আগেই তিনি অবার শুরু করেন, "ভক্তবৃন্দ! আপনারা বহুদূর থেকে এই পরম পবিত্র তীর্থে আগমন করেছেন। অনেক টাকা খরচ করে আপনাদের এখানে আসতে হয়েছে। ফিরে যেতেও বহু টাকা খরচ হবে। হয়তো আপনাদের হাতে উদ্বৃত্ত খুব সামান্যই আছে। তাহলেও আমি আপনাদের অনুরোধ করব, আপনারা পুজো না দিয়ে এই পবিত্র তীর্থ ত্যাগ করবেন না। ১·২৫ পয়সা থেকে শুরু করে ১০১·০০ টাকার পর্যন্ত পুজো হয় এখানে।

"আমি একটা একশ' এক টাকার পুজো দিতে চাই।" অধ্যক্ষজী কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার পাশ থেকে সামন্তবাবু হিন্দীতে বলে উঠলেন।

সবাইকে তাঁর দিকে তাকাতে দেখেই বোধ করি জবাবদিহির স্বরে সামন্তবাবু সবিনয়ে বাংলায় বলেন, "ভগবান যখন দিয়েছেন আমাকে, তখন তাঁর উদ্দেশে নিবেদন করব না কেন? তাছাড়া জীবনে আর তো কোনদিন আসাও হবে না এই পুণ্যতীর্থে।"

সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই সাধ্যমত পুজোর টাকা জমা দিলেন। আর তারপরে অতর্কিতে ঘণ্টাধ্বনি মূর্ত হয়ে উঠল। অধ্যক্ষ জানালেন, "দর্শন শুরু হয়ে গেছে। আপনারা মন্দিরে চলে যান। ওখানে বসেই প্রসাদ পেয়ে যাবেন।"

আমরা প্রায় ছুটে আসি মন্দিরে। সমবেত ভক্তবৃন্দের পেছনে এসে দাঁড়াই। সর্ব ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা সত্যসুন্দর শঙ্খনারায়ণকে অপলক নয়নে দর্শন করি।

গর্ভ-মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে শ্বেতপাথরের বেদীর ওপরে সোনালী সিংহাসন।[৯] তারই ভেতরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শঙ্খনারায়ণ—কষ্টি-পাথরের দণ্ডায়মান অপরূপ বিগ্রহ। তাঁর সর্বাঙ্গে রত্নালঙ্কার, মাথায় সোনার মুকুট। মূর্তিটি অবিকল রণছোড়জীর মতো। দ্বারকার পাণ্ডারা বলেন, স্থানীয়রা এটি দ্বারকা থেকে অপহরণ করে

হয়নি ছ। এটি দ্বারকাধীশ মন্দিরের দ্বিতীয় বিগ্রহ। সে যা-ই হয়ে হ, আমি সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম করি।

—শ্রীশ্রীদ্বারকানাথ জীউ কি···

—জয়!

—ভগবান শ্রীশ্রীশঙ্খনারায়ণ জীউ কি···

—জয়!

জয়ধ্বনি শেষ হবার আগেই শুরু হয় আরতি—ভোগারতি।

আমি দু-চোখ ভরে অপরূপ আরতি দর্শন করছি আর মনে মনে ভেবে চলেছি সেই অবিস্মরণীয় কাহিনী—শঙ্খোদ্ধারের পুণ্যকথা—

সে কাহিনীর নায়কও সুদামা—আরেক সুদামা। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে বলা হয়েছে সুদামা নামে জনৈক গোপ রাধারাণীর অভিশাপে দৈত্যবংশে জন্ম নিলেন। তাঁর নাম হল শঙ্খচূড়। তিনি তপস্যা করে বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে তুষ্ট করলেন।

সন্তুষ্ট বিষ্ণু তাঁকে একটি কবচ দান করে বললেন—এই কবচ সঙ্গে থাকলে তুমি অবধ্য।

তপোমুগ্ধ শিব শঙ্খচূড়কে বর দিলেন—যতদিন তোমার স্ত্রী সতী থাকবে, ততদিন তুমি অজেয় এবং অমর রইবে।

এদিকে তুলসী নামে রাধারাণীর এক সখী ছিলেন। রাধা একদিন তাঁকে রাধারমণের সঙ্গে সঙ্গমরতা দেখতে পেয়ে অভিশাপ দিলেন—তুই মানবযোনি প্রাপ্ত হ'।

গোপীনাথ তখন অভিশপ্তা তুলসীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—রাধার শাপ মিথ্যে হবার নয়, কিন্তু তুমি মানবযোনি প্রাপ্ত হয়েও আমাকে লাভ করবে।

তারপরে এক কার্তিকী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে তুলসী ধর্মধ্বজ রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর মায়ের নাম মাধবী।

যৌবনপ্রাপ্তির পরে তুলসী এক গভীর বনে গিয়ে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে স্থির থাকতে না পেরে ছুটে এলেন

তপস্বিনীর সামনে। বললেন—আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হ বল, তুমি কি বর চাও ?

তুলসী উত্তর দিলেন—আমি গোলোকের গোপিনী, আমি কৃষ্ণ-বিরহিনী। পূর্বজন্মে আমি একদিন গোপীনাথের সঙ্গে সঙ্গমকালে তৃপ্ত হবার আগেই মূর্ছিত হয়ে পড়ি। দুর্ভাগ্য আমার, তখুনি রাসেশ্বরী সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তারই অভিশাপে আমি আজ মর্ত্যের মানবী। কিন্তু গোবিন্দ-সঙ্গম আমার আজও অসম্পূর্ণ, আমি এখনও কৃষ্ণপ্রেমে অতৃপ্ত। অথচ তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন--আমি তাঁকে লাভ করব। আপনি আমাকে বর দিন, আমি যেন নারায়ণকে পতিরূপে পাই। সেইসঙ্গে আপনি আমার রাধাভীতি মোচন করুন।

—তথাস্তু ! ব্রহ্মা তুলসীকে বরদান করলেন। বললেন—তুমি রাধার মতো সুভগা হবে।

কিছুকাল পরে তুলসীর সঙ্গে শঙ্খচূড়ের বিয়ে হল। স্বর্গের রাণী হয়ে তিনি বেশ সুখেই ছিলেন। কিন্তু গোবিন্দের চরণে যিনি তাঁর প্রাণ-মন সমর্পণ করেছেন, পার্থিব সুখ-সম্পদ তো তাঁর জন্য নয়।

স্বর্গচ্যুত দেবতারা ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে নিয়ে বিষ্ণুর সামনে হাজির হলেন। সব শুনে বিষ্ণু তাঁদের আশ্বস্ত করে বললেন—শঙ্খচূড়ের শাপমুক্ত হবার সময় সমাগত। তারপরে ভগবান মহাদেবের হাতে একটি শূল দিয়ে তাঁকে বললেন--আপনি এই শূলের সাহায্যে শঙ্খচূড়কে সংহার করুন।

—কিন্তু আপনার মঙ্গল-কবচ তার গলায় রয়েছে, সে যে অবধ্য !

মৃদু হেসে নারায়ণ অভয় দিলেন—আমি যথাসময়ে সে কবচ নিয়ে নেব, আপনারা শঙ্খচূড়ের সঙ্গে সংগ্রাম শুরু করে দিন।

তবু দেবতারা সেখান থেকে চলে গেলেন না। ভগবান জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে তাকালেন। বাধ্য হয়ে ব্রহ্মাকে কথা বলতে

হয়। তিনি বলেন—এদিকে যে মহাদেব আবার শঙ্খচূড়কে এক বিচিত্র বর দিয়ে বসে আছেন।

—জানি। অন্তর্যামী ভগবান আবার একটু হাসেন। বলেন —মহাদেব শঙ্খচূড়কে বর দিয়েছেন, তার স্ত্রী তুলসীর সতীত্বনাশ না হলে শঙ্খচূড়ের মৃত্যু হবে না, এই তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মহাদেব মাথা নাড়েন।

ভগবান তখন দেবতাদের আবার অভয় দান করেন—সে ব্যবস্থাও আমি করছি। আপনারা যুদ্ধযাত্রা করুন।

নারায়ণ তারপরে প্রথম ব্রাহ্মণের রূপ নিয়ে শঙ্খচূড়ের কাছে গিয়ে তাঁর মঙ্গল-কবচ নিয়ে এলেন। তারপরে শঙ্খচূড় যখন দেবতাদের সঙ্গে সংগ্রামে ব্যস্ত, তখন তিনি তাঁর রূপ ধারণ করে তুলসীর সতীত্ব নাশ করলেন। মহাদেব শঙ্খচূড়কে বধ করতে সমর্থ হলেন।

যথাসময়ে তুলসীর কাছে স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ পৌঁছল। তুলসী নারায়ণের ছলনা বুঝতে পারলেন। তিনি তাঁর আচরণে ক্ষুব্ধ হলেন, তিনি তো এভাবে তাঁকে লাভ করতে চান নি। তাই অভিমানী সতী তাঁকে অভিশাপ দিলেন—হে লম্পট, এই কপটতার জন্য তুমি পাষাণে পরিণত হও। তারপরে পতিহারা রমণী তাঁর পতিহন্তার পায়ে পড়েই কাঁদতে থাকলেন।

ভগবান তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—তোমার কামনা পূর্ণ হোক্। তুমি দেহত্যাগ করে আমার কাছে লক্ষ্মীর মত প্রিয়া হবে। তোমার এই মরদেহ হোক্ গণ্ডকীর অমরধারা আর কেশগুচ্ছ অক্ষয় তুলসীগুল্ম। আমিও পরিণত হব নারায়ণ-শিলায়। তোমাকে ছাড়া কেউ কখনও আমার পূজা করতে পারবে না।

সেই থেকে তুলসী নারায়ণ-শিলার সঙ্গিনী হয়ে আছেন। আর এই বেট-দ্বারকার মাটিতেই সেদিন ভগবান ভক্তের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। আমরা আজ সেই পুণ্যতীর্থ দর্শন করে ধন্য হলাম।

তেরো

বেট-দ্বারকা পুণ্যতীর্থ। সুতরাং এখানে স্নান করলে, পুণ্যার্জন হয়। সহযাত্রীরা অনেকেই সেই শুভকর্মটি সুসম্পন্ন করতে ম্যানেজারের সঙ্গে কোথায় যেন চলে গেলেন। আমি মন্দির থেকে বেরিয়ে কয়েকধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি বাজারে। ছোট বাজার। বাঁধানো পথের দু-পাশে সারি-সারি দোকান। মুদি মনোহারী দশকর্মা খেলনা ও খাবারের দোকান। দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি।

বছর বারো বয়সের একটি ছেলে সামনে এসে বলে, "নমস্তে মহারাজ।"

প্রতিনমস্কার করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাই। সে জিজ্ঞেস করে, "শঙ্খনারায়ণ মন্দির দর্শন করতে যাবেন?"

"দর্শন করেছি।" সহাস্যে বলি।

"কোথায়?" ছেলেটি প্রশ্ন করে।

আমি ইশারায় ওপরের মন্দির দেখিয়ে দিই।

এবারে সে একটু হাসে। বলে, "ও তো রণছোড়জীর মন্দির—দ্বারকাধীশ মন্দির। শঙ্খনারায়ণের মন্দির এখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে। সেখানে শঙ্খচূড় তালাও আছে। চলুন না, দেখিয়ে আনছি। বেশিক্ষণ লাগবে না।"

মনে হচ্ছে ছেলেটি ঠিকই বলছে। জাতীয় গ্রন্থাগারের গুজরাতী বিভাগের সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রী কে. ডি. জাসানি আমাকে একখানি বইয়ে শঙ্খনারায়ণ মন্দিরের ছবি দেখিয়েছিলেন, তার সঙ্গে এ মন্দিরের কোন মিল খুঁজে পাই নি। তাহলেও ম্যানেজারকে না বলে অচেনা জায়গায় একাকী এই অপরিচিত ছেলেটির সঙ্গে যাওয়া

উচিত হবে না। ম্যানেজার যে স্নানার্থীদের নিয়ে গিয়েছেন। কখন ফিরে আসবে জানি না। সে আসার পরে আর হয়তো সময় থাকবে না।

না, শঙ্খনারায়ণ দেখছি খুবই দয়াময়। বাণেশ্বর মন্দির থেকে নেমে আসছে বাজারে। তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করি কথাটা। সেও সমর্থন করে ছেলেটিকে। বলে, "যান না, ঘুরে আসুন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসবেন। আমি ম্যানেজার-বাবুকে বলে দেব।"

দ্বিধাহীনচিত্তে এগিয়ে চলি ছেলেটির সঙ্গে। চলতে চলতে জিজ্ঞেস করি তাকে, "তোমার নাম কি ?"

"যশবন্ত্ ।"

"কোন্ ক্লাসে পড় ?"

যশবন্ত্ নিরুত্তর। সে নীরবে হেঁটে চলেছে। মনে হচ্ছে একটু লজ্জা পেয়েছে। তাড়াতাড়ি বলি, "তুমি বুঝি পড়াশুনা কর না ?"

মুখ তোলে যশবন্ত্। মৃদুকণ্ঠে উত্তব দেয়, "বাড়িতে বাবার কাছে পড়ি। স্কুলের মাইনে দিতে না পারায় নাম কেটে দিয়েছে। ক্লাস সিক্স-য়ে পড়তাম।"

"তোমার বাবা কি করেন ?"

"রাজকোটের একটা কারখানায় কাজ করতেন। গতবছর ধর্মঘট হবার পরে চাকরি গেছে। অনেক চেষ্টা করেও আর চাকরি পান নি।"

"তোমরা ক' ভাই-বোন ?"

"চার। দিদি, তারপরে আমি। আমার পরে দু-বোন।"

"দিদির বিয়ে হয়েছে ?"

"না। সে আমার থেকে মোটে তিন বছরের বড়।"

"তোমাদের তো এখানেই বাড়ি ?"

"হ্যাঁ।"

"জায়গা-জমি আছে ?"

"খুবই সামান্য। বছরে মাস তিনেকের খাবার হয়।"

"বাকি ন' মাস চলে কেমন করে ?"

ছেলেটি চুপ করে রইল। সম্ভবতঃ প্রশ্নটার উত্তর তার জানা থাকলেও বলার মতো নয়।

সেই একই কাহিনী—আসাম থেকে গুজরাত। দূরত্ব যতই হোক্, প্রাকৃতিক পার্থক্য যতই থাক্, সাধারণ মানুষের অবস্থা অপরিবর্তিত। অশিক্ষা আর অস্বাস্থ্য, কর্মাভাব আর উপবাস আজও ভারতের জনজীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপ।

আর কোন প্রশ্ন করি না। নীরবে তার সঙ্গে হেঁটে চলি। আমি পুণ্যার্থী। পুণ্যতীর্থ শঙ্খনারায়ণের মন্দির দর্শন করতে চলেছি। বহুদূর থেকে অনেক টাকা খরচ করে আমি এই পুণ্যতীর্থে এসেছি। আমার কি এই সব সামান্য ব্যাপারে এত বিচলিত হওয়া সাজে ? আমি তাই তীর্থের পথে এগিয়ে চলি।

ইতিমধ্যে বাজার ছাড়িয়ে এসেছি। বাজারের পরে পথের ধারে বাড়ি-ঘর। একটু বাদে তাও শেষ হয়ে গেল। শুরু হল খেতখামার। সুবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে পথ।

বাঁধানো পথ শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। মেঠো পথ দিয়ে চলেছি এগিয়ে—ধূলিময় সংকীর্ণ গ্রাম্যপথ।

পথের ডান পাশে বেশ বড় একটি দিঘি। জল নেই। দিঘির গর্ভে একটি ইঁদারা। কয়েকটি মেয়ে কলসী মাথায় দিঘির ঘাট বেয়ে নামছে—ইঁদারায় জল আনতে যাচ্ছে।

দিঘির পারে জগন্নাথদেবের মন্দির—নতুন মন্দির। এর সঙ্গে বেট-দ্বারকার প্রাচীনত্বের কোন সম্পর্ক নেই। তাহলেও দর্শন করি। দর্শন শেষে যশবন্তের সঙ্গে এগিয়ে চলি।

বেশিদূর এগোতে হয় না। একটা বাঁক ফিরেই সামনে সামান্য দূরে মন্দিরচূড়া দেখতে পাই। মন্দিরশীর্ষে পতাকা উড়ছে

যশবন্ত্ দু-হাত জড়ো করে নমস্কার করে। জানায়, "শঙ্খনারায়ণের মন্দির।"

প্রণাম করে এগিয়ে চলি। কয়েক পা হেঁটে মন্দির-তোরণের সামনে আসি। এ মন্দিরটিও পথের ডানদিকে। তোরণের গায়ে লেখা—'শঙ্খনারায়ণ মন্দির। বেট।'

আমরা ভেতরে প্রবেশ করি। পাথর-বাঁধানো অঙ্গনের বাঁপাশে মন্দির। জাতীয় গ্রন্থাগারে দেখা ছবির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে উঠে আসি। রুপোর পাতে মোড়া মন্দিরদ্বার। ওপরে লেখা—'শ্রীশঙ্খনারায়ণ। জয় কৃষ্ণ।'

যিনি শঙ্খনারায়ণ, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু উভয়ের লীলা বিভিন্ন যুগের। সুতরাং শঙ্খনারায়ণ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের বিজয়বার্তা উৎকীর্ণ করবার কোন আপাত কারণ নেই। তাহলেও মন্দির কর্তৃপক্ষকে এর জন্য কোন দোষ দিতে পারছি না। কারণ কৃষ্ণ কেবল নারায়ণ নন, তিনি নর-নারায়ণ। তিনি শুধু মানুষরূপী ভগবান নন, ভগবানরূপী মানুষ। তিনি ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক, ভারতীয় জীবনধারার উৎস।

তাই শঙ্খোদ্ধার বেট-য়ের এই শঙ্খনারায়ণ মন্দিরে পূজারীরা কৃষ্ণ-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্বেতপাথরের বেদির ওপরে স্থাপিত সুসজ্জিত সিংহাসনে সবুজ কাপড় পরানো দণ্ডায়মান কৃষ্ণমূর্তি। আমরা প্রণাম করি।

খুদে পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে। অনতি-দূরে একটি ছোট বাড়ি দেখিয়ে যশবন্ত্ বলে, "ধর্মশালা। জয়শালমেরের মহারাজা ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে এই ধর্মশালাটি নির্মাণ করে দিয়েছেন।"

"১৫৯৫?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

"জী।"

তার মানে চারশ' বছর আগেও রাজস্থানের সঙ্গে বেট-দ্বারকার একটা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সে সম্পর্কে

যশবন্তকে কোন প্রশ্ন করা বৃথা। তাই নীরবে তার সঙ্গে পথ চলতে থাকি।

আমরা মন্দিরের পেছনে আসি। চারিদিকে বাঁধানো মাঝারি আকারের একটি দিঘি। জল প্রায় নেই বললেই চলে।

যশবন্ত্ জানায়, "এটাই শঙ্খচূড় তালাও। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে দামাজী রাও গায়কোয়াড় এটি খনন করিয়ে দেন। শুনেছি ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে এর সংস্কারসাধন করা হয়েছে।"

যশবন্তের সঙ্গে ফিরে আসি দ্বারকাধীশের মন্দিরে। এবারে বিদায় নিতে হবে ওর কাছ থেকে। জিজ্ঞেস করি, "কত দিতে হবে তোমাকে?"

সে চুপ করে থাকে।

আবার জিজ্ঞেস করি, "যাঁদের এমন দর্শন করাতে নিয়ে যাও, তাঁরা কত করে দেন?"

"যাঁর যা খুশি।" যশবন্ত্ কথা বলে এতক্ষণে, "কেউ পঞ্চাশ পয়সা দেন, আবার কেউ দু-তিন টাকাও দেন।"

পকেট থেকে তিনটি টাকা বের করে হাতে দিই। ওর মুখখানিতে হাসি ফোটে। সকৃতজ্ঞ স্বরে আমার কিশোর পথ-প্রদর্শক বলে, "আমি তাহলে এখন আসি?"

"কোথায় যাবে?"

"বাড়ি।"

"কেন? এখনও তো যাত্রী আসার সময় শেষ হয় নি?"

"এক কিলো আটা আর কয়েকটা আলু কিনে মাকে দিয়ে আবার ফিরে আসব। মানে ঘরে একদম আটা নেই কিনা। সকাল থেকে খাওয়াও হয় নি কিছু।"

আর কিছু বলতে পারি না তাকে। সেও নীরবে নমস্কার করে আমাকে। তারপরে ধীর পদক্ষেপে নেমে যায় বাজারে, যেখানে ওর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল, যেখানে আটা এবং আলু কিনতে পাওয়া যায়।

ম্যানেজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, "শঙ্খচূড় তালাও দেখে এলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"এবারে চলুন ফেরা যাক্।"

"ওঁরা সবাই কোথায় ?"

"ঘাটের দিকে এগিয়ে গেছে।"

"চলুন তাহলে।" আমি ম্যানেজারের সঙ্গে পথ চলা শুরু করি।

ম্যানেজার বলে, "শঙ্খচূড় তালাও-য়ের চারপাশের পাঁচিলটা লক্ষ্য করেছেন।"

"হ্যাঁ। ভারী সুন্দর!"

"শুধু সুন্দর নয়, সেই সঙ্গে ওটি অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় পূর্তবিদ্যার, মানে 'Engineering skill in art of massonary'-য়ের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।"

আমরা সেই সংকীর্ণ পথটি দিয়ে জেটির দিকে নেমে চলেছি। সহযাত্রীদের দেখতে পাচ্ছি সামনে। অনেকেই দোকানে-দোকানে কেনা-কাটায় ব্যস্ত। ম্যানেজার তাঁদের তাড়া লাগিয়ে এগিয়ে চলে। আমাকে বলে, "ব্রিটিশ অধিকারের আগে এই দ্বীপ বেশ কিছুকাল জলদস্যু ওয়াঘের সর্দারের অধীন ছিল। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশরা এই দ্বীপ আক্রমণ করে। সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে ওয়াঘেররা যে-সব কামান ব্যবহার করেছিলেন, তার একটি কিছুকাল আগে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। সেটি এখন এই দ্বীপের একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শনরূপে সমাদৃত।

"ব্রিটিশরা কিন্তু খুব সহজে এ দ্বীপ অধিকার করতে পারে নি। Edward Tancuerav Willzume এবং Captain M'Cormac নামে তাদের দুজন সেনাধ্যক্ষ সেই অভিযানে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এখানে তাঁদের কবর রয়েছে।"

আমরা লঞ্চঘাটে পৌঁছই। একটি কিশোর ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করে, "আপনারা সবাই এসে গিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ। লঞ্চ কোথায় ?" ম্যানেজার জিজ্ঞেস করে।

"ওপারে।" ছেলেটি উত্তর দেয়।

ম্যানেজার বলে, "এপারে আসতে বলো।"

মাথা নাড়ে ছেলেটি। ভাবি নিশ্চয় ফোন কিংবা ওয়ারলেস-য়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

কিন্তু না। ছেলেটি তাঁর কাঁধের থলি থেকে একখানি আরশি বের করে রোদে নাড়তে লাগল। নাড়াবার অবশ্য একটা বিশেষ ধরন আছে। প্রতিফলিত আলোকরশ্মিটা চারিদিকে ঘুরছে। রাতে বিমানবন্দরে কিংবা সাগরের বাতিঘরে যেমন আলোর নিশানা দেওয়া হয়, তেমনি আলোর নিশানা দিয়ে ওপারের লঞ্চকে এপারে ডাকা হচ্ছে। বিমানবন্দর কিংবা বাতিঘরে সেই নিশানার জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে আর এখানে নি-খরচায় নিশানা হয়ে যাচ্ছে। চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা।

হাঁটতে হাঁটতে জেটির প্রান্তে এসে দাঁড়াই। কয়েকখানি নৌকো নোঙর করে আছে—পাল তোলা ডিঙ্গি নৌকো। মাঝি-মাল্লারা ক্রমাগত যাত্রীদের ডাকাডাকি করছে। বোঝাতে চাইছে লঞ্চের চেয়ে নৌকো ভাল। দেখে-শুনে হাওয়া খেয়ে ধীরে-সুস্থে ওপারে পৌঁছন যায়। ভাড়াও কম—লঞ্চে তিরিশ পয়সা আর নৌকোয় বিশ। কিন্তু খুবই কম যাত্রী তাদের সে বক্তৃতায় বিমোহিত হচ্ছেন। এটি গতির যুগ, বেগের যুগ। এ যুগে সময় সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু।

দু'খানি লঞ্চ পাল্লা দিয়ে ছুটে আসছে। দেখতে বেশ লাগছে। সামন্তবাবুর ছেলেরা হাততালি দিচ্ছে। বিউটিও বেশ মজা পেয়েছে। আমার মনে পড়ছে মেয়েটার কথা—শ্রীর কথা। আজকের এই সমুদ্রযাত্রা তার খুবই ভাল লাগত। জানি না সে এখন কেমন

আছে! মেহসানা ছাড়ার পরে আর তার কোন খবর পাই নি। দ্বারকাধীশের কৃপায় যদি সে ভাল হয়ে যায়, তাহলে আমেদাবাদে ওর সঙ্গে আবার দেখা হবে। পূর্ণিমা ও শঙ্করী তাকে নিয়ে অহীনের সঙ্গে আবু-রোড থেকে আমেদাবাদ চলে আসবে। আর ভগবান বিরূপ হলে, অর্থাৎ শ্রী সুস্থ না হয়ে উঠলে ওরা আবু-রোড থেকেই কলকাতায় ফিরে যাবে। পথে কোন গোলমাল না হলে আমরা পবশুদিন বিকেলেই আমেদাবাদ পৌঁছব। কৃষ্ণ কৃপা করলে সেখানে গিয়ে দেখা হবে শ্রীর সঙ্গে।

লঞ্চ দু'খানা এসে গিয়েছে। আনন্দের কথা আমাদের লঞ্চটাই আগে জেটিতে ভিড়েছে। স্বভাবতই আমার সহযাত্রীরা সবিশেষ উল্লসিত।

কিন্তু সে উল্লাস দীর্ঘস্থায়ী হল না। কারণ শেষ সময়ে সহসা আবিষ্কৃত হল অমিয়বাবু এখনও ফেবেন নি। তাঁকে এই অচেনা জায়গায় একা ফেলে রেখে আমাদের চলে যাওয়া সমীচীন হবে না। সুতরাং লঞ্চে ওঠা হল না। আমাদেব লঞ্চ অন্য যাত্রী নিয়ে ফিরে গেল ওখা। যাবার সময় সারেঙ আশ্বাস দিয়ে গেল—এখুনি ফিরে আসছি।

নিখোঁজ অমিয়বাবুব খোঁজ করার জন্য ম্যানেজার বাণেশ্বরকে মন্দিরে পাঠালো। আমরা গভীর আগ্রহে তাঁর পথ চেয়ে রইলাম। অমিয়বাবুর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

কয়েকটি ছোট-বড় ছেলে-মেয়ে জেটির পাশে একবুক সাগরজলে দাঁড়িয়ে কি যেন করছে। মাঝে মাঝে ডুব দিচ্ছে। আবার একটু বাদেই উঠে দাঁড়াচ্ছে। ওরা কি খুঁজছে?

কথাটা জিজ্ঞেস করি ম্যানেজারকে। সে উত্তর দেয়, "ওরা পয়সা কুড়োচ্ছে।"

"পয়সা!" বিস্মিত হই।

ম্যানেজার বলে, "হ্যাঁ। বেট-দ্বারকা পুণ্যতীর্থ। পুণ্যময় এখান-

কার মন্দির মাটি ও জল। তাই পুণ্যার্থীরা যাতায়াতের পথে সাগরে পয়সা ছুঁড়ে দেন। ওরা সেই পয়সা খুঁজছে।”

কথাটা মনে পড়ে আমার। আরেক তীর্থের বালুকাবেলায় দাঁড়িয়ে এক শীতের সকালে একদল মানুষকে এমনি পয়সা খুঁজতে দেখেছি। এবং সেটি তাদের প্রায় প্রাত্যহিক প্রভাত-কর্ম। যেদিন কিছু কুড়িয়ে পায়, সেদিন চারটি ভাত জোটে। যেদিন পায় না, সেদিন হাসিমুখে উপবাসের দুঃসহ জ্বালা সহ্য করে। সে তীর্থের নাম গঙ্গাসাগর—ভারতের বৃহত্তম মহানগরী কলকাতা থেকে দূরত্ব মাত্র ১২৮ কিলোমিটার।*

গঙ্গাসাগর ও বেট-দ্বারকা দুটিই দ্বীপতীর্থ। দুয়ের মাঝে দূরত্ব অনেক—একটি পূর্ব-ভারতের দক্ষিণপ্রান্ত, আরেকটি পশ্চিম-ভারতের উত্তরপ্রান্ত। কিন্তু উভয়ের মাঝে কি আশ্চর্য ঐক্য! একেই বোধহয় ইংরেজিতে বলে—‘Unity in diversity.’ কবির ভাষায়—

‘বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।’

মিলনটিকে উপভোগ করবার জন্য ঠাকুরমাদের বলি, “আপনারা সাগরে পয়সা দিয়েছেন?”

“না তো!” বড়-ঠাকুরমা সবিশেষ বিস্মিতা।

“এখানে কি পয়সা ফ্যালতে হয় নাকি?” ছোট-ঠাকুরমা প্রশ্ন করেন।

আমি কিছু বলতে পারার আগেই ম্যানেজার উত্তর দেয়, “ওমা! তাও জানেন না! সাগর-দেবতা বরুণকে দান না দিলে যে কখনও সাগরতীর্থ দর্শনের পুণ্য হয় না। দিন দিন, যার কাছে যা খুচরো পয়সা আছে—সব জলে ফেলে দিন।”

আর যায় কোথায়? রীতিমত পয়সা-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আর জলে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলে-মেয়েগুলোর মাঝে শুরু হল হুল্লোড়।

* লেখকের ‘গঙ্গাসাগর’ দ্রষ্টব্য।

প্রথম বর্ষার জল পেয়ে চাতকও এমন আনন্দিত হয় না। এই আনন্দযজ্ঞের অনেকখানি কৃতিত্ব ম্যানেজারের। অযাচিত সহ-যোগিতার জন্য মনে মনে তাকে ধন্যবাদ জানাই।

লঞ্চ ফিরে এলো, কিন্তু ফিরে এলো না বাণেশ্বর।

না, আসছে। ঐ তো বাণেশ্বর আসছে। কিন্তু সে একা কেন? অমিয়বাবু? অমিয়বাবু কোথায়? আর বাণেশ্বরই বা অমন তাড়াতাড়ি আসছ কেন? অমিয়বাবুর কোন বিপদ! কোন দুর্ঘটনা!

"পাওয়া গেল না ম্যানেজারবাবু!" বাণেশ্বর হাঁপাতে হাঁপাতে বলে।

"বাজারটা দেখেছিস?"

"হ্যাঁ। মন্দির ঘাট বাজার সবই দেখেছি।"

ভদ্রলোক গেলেন কোথায়? কাউকে কিছু বলেই বা গেলেন না কেন? অচেনা জায়গা!

"শঙ্খচূড় তালাও পর্যন্ত তো যাস নি?" ম্যানেজার জিজ্ঞেস করে।

"না।" বাণেশ্বর উত্তর দেয়।

"কিন্তু অমিয়বাবু সেখানে যান নি।" আমি মাঝখান থেকে বলে উঠি।

"হ্যাঁ। আপনি তো গিয়েছিলেন সেখানে। আপনার সঙ্গে যখন দেখা হয় নি, তখন তিনি যান নি সেখানে। যাবার পথ ঐ একটাই।

ম্যানেজার খুবই মুশকিলে পড়ে গিয়েছে। পড়বারই কথা। একটা জল-জ্যান্ত মানুষ স্রেফ্ উবে গেল! এর সবখানি অপযশ তার। কলকাতায় ফিরে সে কোম্পানীকে কি কৈফিয়ত দেবে আর অমিয়বাবুর আত্মীয়-স্বজনদেরই বা কি বলবে?

তাই সে আমাদের বলে, "আপনারা বাণেশ্বরের সঙ্গে চলে যান এই লঞ্চে করে। আমি একটু খোঁজ-খবর করে . আসি ভদ্রলোকের।"

এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন না করে উপায় নেই। অতএব আমরা লঞ্চে উঠি, পাঁচুবাবু ফিরে চলে দ্বারকাধীশের মন্দিরে। মনে মনে বলি, "ঠাকুর! তুমি অমিয়বাবুকে ফিরিয়ে দাও।"

পুণ্যতীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়ে পুণ্যার্থীর আর বেশিক্ষণ সহযাত্রীর কথা মনে থাকে? ঘুরে-ফিরে তীর্থের দেবতার কথাই মনে পড়ে তাঁদের। আর মায়া-মমতার উর্ধ্বে না উঠতে পারলে যে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

তিনি যে দুঃখে অক্ষুব্ধ, সুখে স্পৃহাশূন্য, রাগ অনুরাগ ও ভয়মুক্ত। তিনি স্নেহশূন্য ও দ্বেষশূন্য।

সুতরাং লঞ্চ ছাড়ার পরে সহযাত্রীরা সরকারদার কাছে তাঁর কথাই শুনতে চান। বলেন, "গতকাল আমরা রুক্মিণী-মন্দিরে বসে শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী-হরণের কাহিনী শুনেছি, আজ আপনি একটু জাম্ববতী ও সত্যভামার কথা বলুন।"

সরকারদা আপত্তি করেন না। বলেন, "ভাগবত থেকে বলব?"

"বলুন।" সহযাত্রীরা অনুমতি দেন।

সরকারদা শুরু করেন, "আপনারা জানেন, ভাগবতের মতে শ্রীকৃষ্ণের ষোলহাজার একশ' আট পত্নী। তাঁদের প্রত্যেকের দশটি করে সন্তান। সন্তানদের মধ্যে আঠারজন মহারথী। রুক্মিণীর প্রথম পুত্র প্রদ্যুম্ন পিতৃতুল্য গুণশালী। তাঁর ছেলে অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধের ছেলে বজ্রনাভ। মুষল-পর্বের পরে একমাত্র তিনিই জীবিত ছিলেন।

"পত্নীদের মধ্যে রুক্মিণীর পরেই জাম্ববতী ও সত্যভামার স্থান। তাঁদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ উপাখ্যানই বোধহয় আপনারা আজ শুনতে চাইছেন?"

"হ। ঠিকই কইছেন দাদা।" ছোট-ঠাকুরমা সোচ্চার স্বরে বলে ওঠেন, "আমরা তাই শোনতে চাই।"

"বেশ, বলছি।"

"কয়েন।"

সরকারদা বলতে শুরু করেন, "এখন যে কাহিনীটি আমি আপনাদের বলব, সেটি ভাগবতকার দশম স্কন্ধের ছাপান্ন অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন—সে যুগে সত্রাজিৎ নামে একজন সূর্যভক্ত রাজা ছিলেন। সূর্যদেব সন্তুষ্ট হয়ে একদিন তাঁকে একটি স্যমন্তক মণি দান করলেন।

"মণিটি প্রতিদিন অষ্টাভার সুবর্ণ প্রসব করত। যেখানে ঐ মণি পূজিত হত, সেখানে দুর্ভিক্ষ অকালমৃত্যু এবং কোন দৈহিক বা মানসিক অমঙ্গল থাকতে পারত না।

"সত্রাজিৎ একদিন সেই উজ্জ্বল মণি গলায় বেঁধে দ্বারকায় এলেন। দ্বারকাবাসীরা ভাবলেন—স্বয়ং সূর্যদেব মাটিতে নেমে এসেছেন। সত্রাজিৎ ব্রাহ্মদের পৌরোহিত্যে মণিটিকে নিজের বাড়িতে স্থাপন করলেন।

"কৃষ্ণ সেই মণি দেখতে এসে সত্রাজিৎকে বললেন—এটি আপনি আমাকে দিন, আমি দাদু উগ্রসেনকে উপহার দেব। সত্রাজিৎ সহাস্যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করলেন।

"কিছুদিন পরে সত্রাজিতের ভাই প্রসেন স্যমন্তক গলায় বেঁধে মৃগয়ায় গেলেন। একটি সিংহ তাঁকে হত্যা করে মণিটি নিয়ে নিল। ভালুকরাজ জাম্ববান সেই সিংহটিকে মেরে স্যমন্তক দখল করলেন। তিনি তাঁর শিশুপুত্রকে মণিটি দিয়ে দিলেন। সে স্যমন্তককে খেলনা বানালো।

"প্রসেন না ফিরে আসায় সত্রাজিৎ রটিয়ে দিলেন—মণির লোভে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভাইকে হত্যা করেছেন। মিথ্যে কলঙ্ক দূর করার জন্য কৃষ্ণ বনে গেলেন। তিনি প্রসেন ও সিংহের মৃতদেহ দেখতে পেলেন। পায়ের ছাপ অনুসরণ করে কৃষ্ণ জাম্ববানের গুহায় প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গীরা গুহার বাইরে অপেক্ষা করতে থাকলেন।

"জাম্ববানের শিশুপুত্রের হাতে মণিটি দেখতে পেলেন কৃষ্ণ। তিনি তার হাত থেকে স্যমন্তক নিতে গেলেন। কিন্তু পেরে উঠলেন

না। কারণ তখুনি জাম্ববান ছুটে এসে তাঁর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লেন। দুজনে প্রবল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

"জাম্ববান ছিলেন পরম কৃষ্ণভক্ত। কিন্তু তিনি তাঁর ইষ্টদেবতাকে চিনতে পারেন নি। ফলে ভক্ত ও ভগবানের অবিরাম যুদ্ধ চলল। দিন-রাত যুদ্ধ চলতে থাকল।

"ওদিকে কৃষ্ণ ফিরে না আসায় সঙ্গীরা ভাবলেন—কৃষ্ণ আর নেই। তাঁরা বারোদিন অপেক্ষা করে হতাশ হয়ে দ্বারকায় ফিরে এলেন। দ্বারকায় কান্নার রোল পড়ে গেল। উগ্রসেন বসুদেব দেবকী বলরাম ও রুক্মিণী প্রভৃতি আপনজনেরা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন।

"এদিকে আঠাশ দিন অহোরাত্র অবিরাম যুদ্ধের পরে জাম্ববান শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। আর সেদিনই তিনি তাঁর প্রাণপুরুষকে চিনতে পারলেন। সহসা যুদ্ধ থামিয়ে তিনি বলে উঠলেন—আপনি নিশ্চয়ই সেই পুরাণপুরুষ। আপনি আমার ঔদ্ধত্য ক্ষমা করুন।

"ভক্ত ও ভগবানের পরিচয় হল। ভগবান পরমকৃপায় ভক্তকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন—সত্রাজিতের মিথ্যা কলঙ্ক দূর করার জন্য স্যমন্তকমণি নিতে আমি আপনার গুহায় এসেছি।

"জাম্ববান তাঁর যুবতী কন্যা জাম্ববতীকে আহ্বান করলেন। স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী জাম্ববতী সেখানে এসে তাঁর মনের মানুষকে দেখতে পেয়ে পুলকিতা হলেন। কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারলেন না। তিনি লাজনম্র বদনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"জাম্ববান বললেন—তোমার ভাইয়ের হাত থেকে ঐ মণিটি নিয়ে এসে প্রভুকে দাও।

"জাম্ববতী মণিটি এনে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের সামনে রেখে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলেন। কৃষ্ণ তাঁকে হাত ধরে টেনে তুললেন। কৃষ্ণের করস্পর্শে কুমারী জাম্ববতীর দেহ ও মনে একটা অনাস্বাদিত আনন্দ মূর্ত হয়ে উঠল।

"জাম্ববান বললেন—প্রভু, মণির সঙ্গে করুণা করে আমার এই কন্যাটিকেও গ্রহণ করুন। কৃষ্ণ আবার জাম্ববতীর একখানি হাত হাতে তুলে নিলেন। জাম্ব-ভবনে মঙ্গল-শাঁখ বেজে উঠল।

"মণিভূষিত কণ্ঠে জাম্ববতীর হাত ধরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রবেশ করলেন। দ্বারকাবাসীরা চোখের জল মুছে পরমানন্দে তাঁদের বরণ করলেন। দেবকী বসুদেব বলরাম ও রুক্মিণী ছুটে এলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও জাম্ববতী বাবা মা দাদু ও দাদাকে প্রণাম করলেন। জাম্ববতী রুক্মিণীকে প্রণাম করতেই রুক্মিণী তাঁকে পরমস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

"পরদিন কৃষ্ণ মণি নিয়ে এলেন সত্রাজিতের কাছে। সত্রাজিৎকে স্যমন্তক ফিরিয়ে দিয়ে তিনি তাঁকে প্রসেনের পরিণতির কথা জানালেন।

"অনুতপ্ত সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরে বললেন—হে ক্ষমাসুন্দর! তুমি আমাকে ক্ষমা করো। একদিন তুমি আমার কাছে স্যমন্তক চেয়েছিলে। সেদিন তোমাকে আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, আমি এই অমূল্য মণির উপযুক্ত নই। সেদিন তোমাকে মণিটি দিয়ে দিলে আমি ভাইকে হারাতাম না। আর আমি বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে চাইব না। দয়া করে মণিটি তুমি ফিরিয়ে নাও আর সেই সঙ্গে কৃপা করে আমার কন্যা সত্যভামাকে গ্রহণ কর।

"সত্রাজিতের নির্দেশে কৃষ্ণপ্রাণা রূপবতী সত্যভামা ধীরপদক্ষেপে মদনমোহনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। কৃষ্ণ তাঁর পাণিপীড়ন করে প্রসন্নচিত্তে সত্রাজিৎকে বললেন—আমি আপনার কুমারীকন্যাকে গ্রহণ করলাম, কিন্তু স্যমন্তক আপনার কাছেই থাক্। আপনি নির্ভয়ে থাকুন, এ মণি থেকে আপনার আর কোন অমঙ্গল হবে না। বরং আপনার কাছে থাকলেই আমাদের সকলের অশেষ মঙ্গল সাধিত হবে।

"আর সত্যভামা? যৌবনের স্বপ্ন সফল হবার সুখে তিনি তখন

পুলকিতা। বলা বাহুল্য, কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বারকার নরনারী তাঁর আনন্দের অংশীদার হলেন।”

সরকারদা শেষ করার পরেই সবিস্ময়ে দেখি, আমরা প্রায় এপারে এসে গিয়েছি। সামনে ওখার জেটি। সারেঙ লঞ্চের গতি কমিয়ে দিলেন। খালাসীরা দড়ি হাতে উঠে দাঁড়ালো। লঞ্চ তীরে ভেড়াবার আয়োজন শুরু হয়ে গেল।

প্রথমে দেখতে পায় বিউটি। সে আমার পাশে এসে বলে, “মামু, দেখুন তো জেটির ওপরে কে দাঁড়িয়ে রয়েছেন?”

আরে! তাই তো। অমিয়বাবুর মতই যে মনে হচ্ছে। অনেকেরই লক্ষ্য পড়েছে তাঁর দিকে। না, ভুল হয় নি আমাদের। অমিয়বাবুই দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি হাত নাড়ছেন। সহাস্যে ওখার মাটিতে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছেন। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ি।

সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই তাঁর ওপরে রীতিমত ক্ষুব্ধ। হবারই কথা। তাঁর জন্য আমরা আগের লঞ্চে আসতে পারি নি। ম্যানেজার এখনও হন্যে হয়ে বেট-দ্বারকার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তিনি কিনা কাউকে কিছু না বলে এখানে এসে আমাদের স্বাগত জানাবার জন্য জেটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন! বিচিত্র মানুষ বটে!

জনৈক সহযাত্রী জেটিতে উঠে সেই কথাটাই জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে। বললেন, “আপনি আমাদের ফেলে চলে এলেন যে বড়?”

গম্ভীর স্বরে অমিয়বাবু উত্তর দিলেন, “আমি তো চলে আসি নি।”

“তাহলে আপনি এখানে এলেন কেমন করে?” সহযাত্রীরা এবারে রেগে গিয়েছেন।

শান্তকণ্ঠে অমিয়বাবু উত্তর দিলেন, “আপনাদের দেরি দেখে আমি একটা লঞ্চে উঠে বসলাম। লঞ্চটা আমাকে নিয়ে চলে এলো এখানে।”

॥ চোদ্দ ॥

রেল-স্টেশনে এসে বুঝতে পারি যাঁরা বেট-দ্বারকায় পুণ্যস্নান করেছেন, তাঁরা সত্যই পুণ্যবান। কারণ স্টেশনের কোন কলে জল পড়ছে না। এখানে কলের-জল নেই কিন্তু জলের-কল আছে। আছে কয়েকটি বাঁধানো জলাধার। তার চারদিকে কল লাগানো। কিন্তু এখন কল টিপলে জল পড়ছে না। অর্থাৎ জলাধার জলশূন্য।

কর্তৃপক্ষ জানালেন—কয়লার অভাবে গতকাল থেকে জলের গাড়ি অচল হয়ে আছে। মিঠাপুর থেকে জল আনানো যায় নি। অতএব আজ আর স্নান করা যাবে না।

ভারী মুশকিলে পড়া গেল। বালিময় সাগরতীরে রেল-স্টেশন। প্রখর রোদ উঠেছে। খুবই গরম লাগছে। ম্যানেজার থাকলে যা-হোক্ একটা উপায় বাতলে দিত। কিন্তু সেও অমিয়বাবুর অবিমৃশ্যকারিতার শিকার হয়েছে। আমরা অবশ্য লঞ্চের সারেঙকে বলে দিয়েছি, ওপারে গিয়ে খবরটা দিয়ে দিতে। কিন্তু ম্যানেজার জেটিতে না এলে কাকে খবর দেবে? এখন সে কোথায় অমিয়-বাবুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কে জানে?

তাহলেও সাহাবাবু ও সরকারদার সঙ্গে বালতি মগ ও গামছা নিয়ে নেমে আসি গাড়ি থেকে। খানিকটা দূরে অনেকটা উঁচুতে একটা ট্যাঙ্ক দেখা যাচ্ছে। রেল-লাইন ধরে সারি বেঁধে সেইদিকে এগিয়ে চলি। তুষারাবৃত হিমালয়ে জলের জন্য বহুবার হাহাকার করেছি। আর আজ অন্তহীন মহাসাগরের তীরেও জলের জন্য ছুটোছুটি করতে হচ্ছে।

পদচারণা বিফল হল না। জলের দর্শন পেলাম। দূর থেকে যে ট্যাঙ্কটি দেখা যাচ্ছিল, সেটি সত্যি সত্যি জলের ট্যাঙ্ক—রেলগাড়ির

জল। কয়েকজন লোক একটা দাঁড়িয়ে-থাকা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ছাদে উঠে ট্যাঙ্কগুলোতে জল বোঝাই করছে। এই ট্রেনটির সঙ্গেই সম্ভবত আমাদের গাড়ি জুড়ে দেওয়া হবে।

রেলের পোশাক পরিহিত জনৈক সর্দার ছড়ি হাতে জল-ভরার তদারকি করছে। সরকারদা সবিনয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, "এর কোন একটা কামরায় উঠে আমরা একটু স্নান করে নেবো ?"

"নহী সাব্ !" সর্দার সঙ্গে সঙ্গে সরকারদার আবেদন না-মঞ্জুর করে দেয়। বলে, "ওপরওয়ালার কড়া হুকুম কেউ যেন গাড়ির জল নষ্ট না করতে পারে।"

"আজ্ঞে আমরা নষ্ট করব না, স্নান করব।"

"ঐ একই কথা।"

"না।" সাহাবাবু বলেন, "আমরাও ট্রেনের প্যাসেঞ্জার, বিকেলে ভেরাভল রওনা হচ্ছি। তাছাড়া···" একবার থামেন সাহাবাবু। পকেট থেকে একখানি দু-টাকার নোট বের করে লোকটির হাতে গুঁজে দিয়ে আবার বলেন, "আমাদের একটু স্নান করতে দিন, আমরা বেশি জল নষ্ট করব না।"

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর মতই নেফা থেকে ওখা পর্যন্ত সর্বদা সর্বত্র ঘুষের সমান কদর। সুতরাং লোকটি সযত্নে নোটখানি পকেটে পুরে একটুকাল কি যেন চিন্তা করে। তারপরে বলে, "আপনারা ঐ ঘরটার ওপাশে গিয়ে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকুন। এখুনি আমাদের সুপারভাইজার আসবেন। তিনি চলে যাবার পরে, আমি আপনাদের ডাকব। তখন যত ইচ্ছে স্নান করে নেবেন।"

আমরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে সর্দারের নির্দেশ পালন করি।

সর্দারের দয়ায় আশ মিটিয়ে স্নান করে অক্ষত দেহে গাড়িতে ফিরে আসি। আর এসে দেখি, ম্যানেজারও ফিরে এসেছে। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ম্যানেজার যে আমাদের গার্জেন। এবং

গার্জেনের মতই সে আমাদের নির্দেশ দেয়, "সবার খাওয়া হয়ে গেল প্রায়। যান যান, তাড়াতাড়ি বসে পড়ুন।"

খাবার পরে যাঁদের দিবানিদ্রার অভ্যেস, তাঁরা যথারীতি শুয়ে পড়লেন। আর আমরা যথারীতি সরকারদার খোপে এসে ভিড় জমালাম। আগেই ঠিক হয়েছিল, আজ দুপুরে খাবার পরে আবার কৃষ্ণকথার আসর বসবে।

সরকারদা শুরু করেন, "গতকাল দুপুরে দ্বারকা রেল-স্টেশনে বসে আমি আপনাদের কাছে কৃষ্ণের কৌরবসভা ত্যাগের কথা বলেছি।"

আমরা মাথা নাড়ি।

সরকারদা বলতে থাকেন, "হস্তিনাপুব থেকে কৃষ্ণ ফিরে এলেন উপপ্লব্য নগরে। তিনি যুধিষ্ঠিরকে তাঁর নিষ্ফল দৌত্যের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বললেন—মহারাজ, আমি কৌরবসভায় সাম দান ও ভেদ নীতি অনুযায়ী আপনাদের স্বার্থরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু সবই বৃথা হয়েছে। এখন চতুর্থ নীতি দণ্ড ছাড়া আর কিছু করার নেই। দুর্যোধন বিনাযুদ্ধে আপনাদের পাঁচখানি গ্রামও দেবে না। যুদ্ধ অনিবার্য। কৌরবরা আত্মবিনাশে বদ্ধপরিকর।

"পাণ্ডবরা যুদ্ধসজ্জা শুরু করে দিলেন। কৃষ্ণের পরামর্শ মতো যে দিব্য পুরুষ তপস্যার প্রভাবে ও ঋষিগণের অনুগ্রহে উৎপন্ন, যিনি ধনু খড়্গ ও কবচ ধারণ করে অগ্নিকুণ্ড থেকে উঠে এসেছিলেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে সর্ব-সেনাপতি নিযুক্ত করা হল। অর্জুন হলেন সেনাপতি-পতি আর শ্রীকৃষ্ণ হলেন পার্থসারথি।

"দ্রৌপদী সপত্নী দাস-দাসী ও শিশু-সন্তানদের নিয়ে উপপ্লব্য নগরে রইলেন। পাণ্ডববাহিনী কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। পবিত্র হিরণ্বতী নদীর তীরে পরিখা খনন করিয়ে কৃষ্ণ সেখানে শিবির স্থাপন করলেন। শত শত শিল্পী এবং চিকিৎসক তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। প্রতি শিবিরে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মধু ঘি ধুনা জল ঘাস তুষ ও অঙ্গার মজুত করা হল।"

"কৃষ্ণ চলে যাবার পরে কৌরবরাও যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেললেন। শুক্রাচার্য-তুল্য যুদ্ধনিপুণ ধার্মিক ভীষ্মদেবকে দুর্যোধন সেনাপতি নির্বাচিত করলেন। ভীষ্ম বললেন—আমার কাছে তোমরা যেমন, পাণ্ডবরাও তেমনি। তাহলেও আমি তোমার পক্ষেই যুদ্ধ করব। আমি পাণ্ডুপুত্রদের হত্যা করতে পারব না, বরং তাদের হাতেই মৃত্যুবরণ করব। তবে তার আগে প্রতিদিন পাণ্ডবদের দশ হাজার করে সৈন্য ধ্বংস করব।

"কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন—ভীষ্মদেবকে সেনাপতি করে ভালই করেছো। কিন্তু তিনি জীবিত থাকতে আমি অস্ত্রধারণ করব না। তাঁর দেহরক্ষার পরে আমি তোমার হয়ে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

"তারপরে ভীষ্মের সঙ্গে কৌরবরাও কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে যুদ্ধের নিয়মবন্ধন স্থির হল। সাব্যস্ত হল—যুদ্ধশেষে উভয়পক্ষে পুনরায় প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। রথীর সঙ্গে রথী, গজারোহীর সঙ্গে গজারোহী, অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্বারোহী এবং পদাতিকের সঙ্গে পদাতিক যুদ্ধ করবেন। স্তুতিপাঠক সূত ভারবাহক অস্ত্রবাহক ও ভেরীবাদক প্রভৃতিকে প্রহার করা হবে না। যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে কাউকে হত্যা করা চলবে না।

"উভয়পক্ষের ব্যূহরচনার পরে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—দুই সেনাদলের মাঝখানে রথ নিয়ে চলো, আমি একবার দেখব, কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে?

"পার্থসারথি পার্থের অনুরোধ রাখলেন। অর্জুন দেখলেন দু-পক্ষেই গুরুজন আত্মীয় এবং সুহৃদবর্গ রয়েছেন। অর্জুনের মুখ শুকিয়ে গেল, শরীর কাঁপতে থাকল। তাঁর হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়ল। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন—না, না! আমি যুদ্ধজয় চাই না। যাদের জন্য মানুষ রাজ্য চায় সুখ চায় শান্তি চায়, সেই স্বজনদের বধ করে রাজ্য পেয়ে কি লাভ হবে আমার? তার চেয়ে

দুর্যোধনদের হাতে মারা যাওয়াও ভাল। তিনি ধনুর্বাণ ফেলে দিয়ে রথের ওপরে বসে পড়লেন।...”

“দাদা কি গীতার গপ্প কইতে আছেন?”

ছোট-ঠাকুরমার আকস্মিক প্রশ্নে থামতে হয় সরকারদাকে। ইতিমধ্যে কখন যেন তিনি নিজের জায়গা থেকে উঠে এসেছেন এখানে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকথা শুনছিলেন।

সরকারদা বলেন, “হ্যাঁ ঠাকুরমা, আমি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কথাই বলছি এখন।” থামলেন সরকাবদা। একবার সবার দিকে তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, “আপনাবা সবাই জানেন কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণে অপারগ অর্জুনকে কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত করা এবং বিষাদগ্রস্ত অর্জুনের মনে আনন্দ সঞ্চারের জন্য কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দান কবেছিলেন, তাই আমাদের কাছে ‘গীতা’ নামে পরিচিত।

“গীতা জগতের যাবতীয় ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিশ্বসংসাবে সবাই আমরা অর্জুনের মতো কতব্যাকর্তব্য নিরূপণ কবতে পারছি না, প্রতিনিয়ত বিষাদগ্রস্ত হচ্ছি। গীতার উপদেশ আমাদেরও অর্জুনেব মতই আনন্দময় করে তুলতে পারে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ বিশেষভাবে সংসারীদেব জন্যই তাঁব এ উপদেশ দান করেছেন।”

“এখানে একবার বঙ্কিমচন্দ্রের মতামতটি সংক্ষেপে বলে নেবেন নাকি?” সরকারদা থামতেই আমি জিজ্ঞেস করি।

সরকারদা বলেন, “বেশ তো, আপনিই বলুন না সাহিত্যসম্রাট কি বলেছেন!”

আপত্তি না করে বলতে থাকি, “বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রবন্ধে বলেছেন, ‘দুর্যোধনাদি অন্যায়পূর্বক পাণ্ডবদিগের রাজ্যাপহরণ করিয়াছে। যুদ্ধ বিনা তাহার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। এখানে যুদ্ধ কি কর্তব্য?...

'আধুনিক নীতির অনুগামী হইয়া বিচার করিলেও আমরা পাণ্ডব-দিগের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য স্বীকার করিব। এই জগতে যত প্রকার কর্ম আছে, তন্মধ্যে সচরাচর যুদ্ধই সর্বপ্রকার নিকৃষ্ট। কিন্তু ধর্মযুদ্ধও আছে। আমেরিকায় ওয়াশিংটন, ইউরোপে উইলিয়াম দি সাইলেণ্ট্ এবং ভারতবর্ষে প্রতাপ সিংহ প্রভৃতি যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পরম ধর্ম—দানাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম। পাণ্ডবদিগেরও এই যুদ্ধ-প্রবৃত্তি সেই শ্রেণীর ধর্ম।...

'মহাভারতে দেখি যে, অর্জুন ইতিপূর্বে সকল সময়েই যুদ্ধপক্ষ ছিলেন। যখন যুদ্ধে স্বজনবধের সময় উপস্থিত হইল, বধ্য স্বজনবর্গের মুখ দেখিয়া তিনি যে কাতরচিত্ত ও যুদ্ধবুদ্ধি হইতে বিচলিত হইবেন, ইহাও সজ্জনস্বভাবসুলভ ভ্রান্তি।

'মহাভারতে ইহাও দেখিতে পাই যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। পরে যখন যুদ্ধ অলঙ্ঘ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি যুদ্ধে কোন পক্ষে ব্রতী হইতে অস্বীকৃত হইয়া, কেবল অর্জুনের সারথ্য মাত্র স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলেও তিনি পরম ধর্মজ্ঞ, সুতরাং এ স্থলে ধর্মের পথ কোন্‌টা, তাহা অর্জুনকে বুঝাইতে বাধ্য। অতএব অর্জুনকে বুঝাইতেছেন যে, যুদ্ধ করাই এখানে ধর্ম, যুদ্ধ না করাই অধর্ম।

'বাস্তবিক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভ সময়ে কৃষ্ণার্জুনে এই কথোপ-কথন হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু গীতাকার এইরূপ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্মের সারমর্ম সঙ্কলিত করিয়া মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে।...

'কৌশলে গ্রন্থকার এই ধর্মব্যাখ্যার প্রসঙ্গ মহাভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছেন, তাহার অপ্রকৃততা পাঠক অনুভূত করিতে না পারেন, এই জন্য যুদ্ধের কথাটা মধ্যে মধ্যে পাঠককে স্মরণ কারইয়া দেওয়া হইয়াছে। নতুবা যুদ্ধপক্ষ সমর্থন এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য

নহে। যুদ্ধপক্ষ সমর্থনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত মনুষ্যধর্মের প্রকৃত পরিচয় প্রচারিত করাই উদ্দেশ্য।

'এই কথাটা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে, বোধ হয়, পাঠক মনে মনে বুঝিবেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মুখে রথ স্থাপিত করিয়া, কৃষ্ণার্জুনে যথার্থ এইরূপ কথোপকথন যে হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ। দুই পক্ষের সেনা ব্যূহিত হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত, সেই সময়ে যে একপক্ষেব সেনাপতি উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় যোগধর্ম শ্রবণ করিবেন, এ কথাটা বড় সম্ভবপর বলিয়াও বোধ হয় না।...”

“তাহলে গীতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত কি?” মাঝখান থেকে অমিয়বাবু প্রশ্ন করলেন।

“তিনি তিনটি মত ব্যক্ত করেছেন।” আমি উত্তর দিই।

“বেশ, বলুন!” অমিয়বাবু অনুমতি দান করেন।

“বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন”, আমি বলতে থাকি, ‘গীতায় ভগবৎ প্রচারিত ধর্ম সঙ্কলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু গীতাগ্রন্থখানি ভগবৎপ্রণীত নহে, অন্য ব্যক্তি ইহার প্রণেতা।

‘যে ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রণেতা, তিনি যে কৃষ্ণার্জুনের কথোপ-কথনকালে সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সকলই স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, এবং শুনিয়া সেইখানে বসিয়া সব লিখিয়াছিলেন বা স্মৃতিধরের মত স্মরণ রাখিয়াছিলেন, এমন কথাও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। ..

‘যাঁহারা বলিবেন যে, এই গ্রন্থ মহাভারতান্তর্গত, মহাভারত মহর্ষি ব্যাস প্রণীত, তিনি যোগবলে সর্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত, অতএব এরূপ সংশয় এখানে অকর্তব্য, তাহাদিগের সঙ্গে আমাদের কোন বিচার হইতে পারে না।...

‘সংস্কৃত সকল গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্যের ভাষ্য প্রণীত হইবার পর কোন শ্লোক গীতায় প্রক্ষিপ্ত

হইতে পারে নাই, তাঁহার ভাষ্যের সঙ্গে এখন প্রচলিত মূলের ঐক্য আছে। কিন্তু শঙ্করাচার্যের অন্যূন সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্বেও গীতা প্রচলিত ছিল। এই কাল মধ্যে যে কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহা কি প্রকারে বলিব ?·· ···

'এই সকল কথা স্মরণ না রাখিলে আমরা গীতার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারিব না।"···

একবার থেমে সরকারদার দিকে তাকিয়ে বলি, "এবারে আপনি গীতার কথা বলুন।"

সবাই সরকারদার দিকে তাকাল। তিনি বলতে শুরু করেন, "আপনারা জানেন, ঋষি অরবিন্দ বলেছেন—'গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মপুস্তক।' পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান ভাষায় গীতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

"সম্রাট শাহজাহানের ছেলে দারা শিকো সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফারসী ভাষায় গীতার অনুবাদ করিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন—'গীতা স্বর্গীয় আনন্দের অফুরন্ত উৎস। গীতায় সর্বোচ্চ সত্যলাভের সুগম পথ প্রদর্শিত হয়েছে। ব্যাখ্যা করা হয়েছে, পরম-পুরুষ ও ব্রহ্মবিদ্যার কথা। গীতা ইহলোক ও পরলোকের রহস্য উদঘাটন করেছে।'

"১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে প্রথম ইংরেজীতে গীতার অনুবাদ মুদ্রিত হয়। কয়েক বছর পরেই রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। জার্মান মনীষী উইলিয়াম ভন্ হাম্‌বোল্‌ট বলেছেন—'গীতার মতো সুললিত সুসত্য দার্শনিক পদ্যগ্রন্থ হয়তো পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় নেই। অ্যাল্‌ডাশ হাক্সলি বলেছেন—'ভগবদ্‌গীতা ধর্মশাস্ত্র ও ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করেছে।' জে. ডাব্‌লু. হাওয়ার নামে জনৈক জার্মান ধর্মজ্ঞ পণ্ডিতের মতে—'গীতা অক্ষয় মূল্যের ধর্মগ্রন্থ।' বালগঙ্গাধর তিলক লিখেছেন—'গীতার মতো অপূর্ব গ্রন্থ শুধু সংস্কৃত সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ।' জনৈক ফরাসী ধর্মসাধক বারো

বছর ধরে কেবল গীতাপাঠ করেছিলেন। তিনি বলতেন—'গীতাকে ধর্মজীবনের চিরসঙ্গী করলে, আর কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার দরকার হয় না।' বাংলার ভূতপূর্ব গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে লিখেছেন-- 'গীতাতত্ত্বই ভারতীয় ভাবধারার সম্পূর্ণ পরিণতি ও সূক্ষ্ম নির্যাস।"

সরকারদা থামতেই উমাদি প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা, কবে এই অমূল্য গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে ?"

"এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ প্রথমতঃ, আমাদের পূর্বপুরুষরা ইতিহাসের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, সেকালের কবি বা শাস্ত্রকারগণ তাঁদের রচনায় নিজেদের নাম প্রকাশ করতেন না। কাজেই গীতাকারের নামও অজ্ঞাত এবং অনিশ্চিত। আমরা ভগবদ্গীতাকে মহাভারতের অংশরূপেই পেয়েছি। এবং জেনেছি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারতের রচয়িতা। চতুর্বেদের বিভাগকর্তাও ব্যাসদেব। মহাভারতের অপর নাম ভারত-সংহিতা বা পঞ্চমবেদ।

"এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যে, 'ব্যাস' সেকালের একটি উপাধি, কোন বংশ নয়। কাজেই মহর্ষি পরাশরের পুত্র এবং শুকদেব গোস্বামীর পিতা ব্যাসদেব একাই যে বেদ বিভাগ করেছেন এবং মহাভারত ও পুরাণ প্রণয়ন করেছেন, সেকথা বলা যায় না। তাছাড়া একজন মানুষের পক্ষে এই সুবিশাল সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভবও নয়। আমার ধারণা ব্যাস উপাধির অধিকারী বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন যুগে এই সব গ্রন্থ প্রণয়ন করে তাঁদের আদিগুরু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাসের নামে উৎসর্গ করে গিয়েছেন। সে যুগে তো বটেই, পরবর্তী যুগেও এমন ঘটনার নজির আছে। যেমন কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিনী'। কহ্লন রচনা শুরু করেছিলেন মাত্র, কিন্তু রাজতরঙ্গিনী শেষ করেছেন তাঁর শিষ্য ও প্রশিষ্য। অথচ কবি কহ্লনই রাজতরঙ্গিনীর রচয়িতা বলে পরিচিত।'

সরকারদা থামতেই উমাদি মনে করিয়ে দেন, "আমার কিন্তু প্রশ্ন ছিল, গীতা কবে রচিত হয়েছে ?"

"আমি আগেই বলেছি, এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। গীতাকে মহাভারতের অংশ বলে ধরে নিলে আমরা মহাভারতের রচনাকালকেই গীতার রচনাকাল বলে ধরে নিতে পারি। রমেশচন্দ্র দত্ত এবং প্রাটসাহেবের মতে মহাভারত খ্রীস্টপূর্ব দ্বাদশ শতকে রচিত। ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব বলেছেন—মহাভারতের আদিম আকৃতি অন্ততঃ খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রন্থিত। বুহ্‌লার ও কিরস্টে সাহেবও এই মত সমর্থন করেছেন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন—খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে মহাভারত বর্তমান আকার পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু মূল-মহাভারত খ্রীস্টপূর্ব একাদশ শতকে প্রণীত।

"ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেছেন—গীতা বুদ্ধদেবের আগে রচিত। তিলক সেনার্ট রাধাকৃষ্ণণ এবং বুহ্‌লার প্রমুখ পণ্ডিতগণ ডাঃ দাশ-গুপ্তের এই মত সমর্থন করেছেন। বুহ্‌লার সাহেব বলেছেন—খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে জৈনধর্মের আবির্ভাবের বহুপূর্বে ভাগবত-ধর্মের উৎপত্তি। স্যার আর. জি. ভাণ্ডারকর বলেছেন—খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের আগে গীতা রচিত হয়েছে। জার্মান পণ্ডিত গার্বের মতে গীতা মূলতঃ একখানি সাংখ্য-যোগগ্রন্থ। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে যখন কৃষ্ণ ও বিষ্ণু অভিন্ন হন, তখুনি গীতার সৃষ্টি। কিন্তু তারপরে বৈদান্তিক পণ্ডিতরা গীতাকে বর্জন করেন।

"ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক হপ্‌কিন্স বলেছেন—গীতা সম্ভবত প্রথমে একখানা অসাম্প্রদায়িক উপনিষদ্ ছিল। পরে বৈষ্ণবগ্রন্থে পরিণত হয়। অবশেষে সেটি কৃষ্ণভাবাত্মক হয়ে বর্তমান গীতায় রূপান্তরিত হয়েছে। ফারকুহার বলেছেন—গীতা একটি প্রাচীন পদ্য উপনিষদ্ এবং শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের পরে প্রণীত। খ্রীস্টীয় যুগে কোন কবি কৃষ্ণবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে বর্তমান রূপ দান করেছেন।..."

"আরে! আপনারা মহাভারতের মইধ্যে ভূতের ক্যাচ্‌ক্যাচি লাগাইলেন ক্যান? কৃষ্ণকথা না কইয়া কি সব ছাই-ভস্ম কইতে আছেন!" ছোট-ঠাকুরমা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

স্বভাবতই সরকারদা সবিনয়ে বললেন, "সত্যি ঠাকুরমা, আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। আপনি বসুন, আমি গীতার কথা বলছি।"

"হ। কয়েন।" ঠাকুরমা উমাদির পাশে বসে পড়েন।

সরকারদা বলতে আরম্ভ করেন, "আমি আগেই বলেছি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শুধু ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ নয়, আমাদের জীবনে আজও অপরিহার্য। বিশ্ব-সংসারে আমরা প্রায় সবাই অর্জুনের মতো। কর্তব্য স্থির করতে পারছি না, সর্বদা বিষাদগ্রস্ত হচ্ছি। গীতার বাণী আমাদেরও কর্তব্য-সচেতন ও আনন্দ-ময় করে তুলতে পারে।"

একবার থামেন সরকারদা। আমরা তাঁর দিকে তাকাই। তিনি বলেন, "কিন্তু আজকের এই আসরে আমার পক্ষে গীতার সমস্ত বাণী নিবেদন করা সম্ভব নয়। আমি শুধু সংক্ষেপে সারমর্ম আলোচনা করছি।"

আমরা মাথা নাড়ি।

সরকারদা বলতে থাকেন,

"শ্রীকৃষ্ণ বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে বললেন—এই সঙ্কটের সময় তুমি এমন মোহগ্রস্ত হলে কেন? আশ্চর্য! যারা অশোচ্য তাদের জন্য তুমি শোক করছো আবার প্রজ্ঞাবাক্যও বলছো। পণ্ডিতরা কখনও মৃত বা জীবিতের জন্য শোক করেন না।

"—আমি তুমি ও এইসব রাজারা যেমন এর আগেও ছিলাম, তেমনি এখনও আছি, আবার এর পরেও থাকব। কাজেই মৃত্যুটা কিছুই নয়, কেবল রঙ্গালয়ের পট-পরিবর্তন মাত্র। দেহধারী আত্মার যেমন একই শরীর শৈশব যৌবন ও বার্ধক্যে রূপান্তরিত হয়, তেমনি আত্মার এক শরীর থেকে অপর শরীর গ্রহণও একটি রূপান্তর মাত্র।

ধৈর্যশীল ব্যক্তিরা তাই দেহের প্রতি মোহগ্রস্ত হন না। যাঁর দ্বারা এই বিশ্ব-সংসার ব্যাপ্ত, তিনি অবিনাশী। কেউ সেই অব্যয়কে বিনাশ করতে পারে না। তিনি একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করেন, কখনও মারা যান না। তিনি পুনর্জন্মহীন, তিনি নিত্য অক্ষয় ও অনাদি। কাজেই শরীর হত হলেই, আত্মা হত হন না। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনি দেহী বা আত্মা পুরানো শরীর ছেড়ে অন্য নতুন শরীরে যান।"

থামতে হয় সরকারদাকে। সহসা সুর করে দাদা শুরু করেন—

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ংপুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥'

দাদা থামলেন। সরকাবদা আবার আরম্ভ করলেন, "তারপরে শ্রীকৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে বললেন—আত্মা অস্ত্রে ছিন্ন হন না। অগ্নিতে দগ্ধ, জলে সিক্ত কিংবা বায়ুতে শুষ্ক হন না। ইনি চোখের অগোচর মনের অবিষয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। জন্ম হলে যেমন মৃত্যু, তেমনি মৃত্যুর পরেও জন্ম নিশ্চিত। জীবাত্মা সর্বদা সকলের শরীরে অবধ্যরূপে অবস্থান করেন। অতএব কোন প্রাণীর জন্য শোক করা ঠিক নয়।

"—তাছাড়া তুমি যদি ধর্মের কথা ভাবো, তাহলে তোমাকে যুদ্ধ করতেই হবে। কারণ এ যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ এবং ক্ষত্রিয়ের ধর্মযুদ্ধে যোগদানের চেয়ে বড় কর্তব্য আর কিছু নেই। তুমি যদি এই যুদ্ধ না কর, তাহলে ধর্ম ও কীর্তি ভ্রষ্ট হয়ে মহাপাপী হবে। যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করলে তুমি স্বর্গবাসী হবে। জয়লাভ করলে মর্ত্য লাভ করবে। কাজেই সুখ-দুঃখ লাভ-অলাভ ও জয়-পরাজয়কে সমান ভেবে নিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

"বিষাদনাশক সাংখ্যযোগের পরে পার্থসারথি পার্থের কাছে কর্মযোগের কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন—ধর্মের সামান্য কর্মও মানুষকে মহাভয় থেকে মুক্ত করে। তুমি তো জানো, বেদ ত্রিগুণাত্মক এবং পার্থিব বর্ণনায় পরিপূর্ণ। তুমি ত্রিগুণকে অতিক্রম কর। রাগ ও বিদ্বেষের অতীত, সঞ্চয় ও রক্ষণে নিস্পৃহ এবং আত্মনির্ভরশীল হও।

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥'

"—কেবল কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কখনও নয়। কর্মেব ফল যেমন কামনা করবে না, তেমনি নিষ্কর্মাও হ'য়ো না। ধনঞ্জয়, তুমি যোগস্থ হয়ে আসক্তি ত্যাগ কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে সমান ভেবে কাজ করে যাও। সমত্বকেই যোগ বলা হয়।

"—যিনি সব কামনা ত্যাগ করতে পারেন, যাঁর আত্মা আত্মাতেই তুষ্ট থাকে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। তিনি দুঃখে অক্ষুব্ধ, সুখে স্পৃহাশূন্য এবং রাগ অনুরাগ ও ভয় মুক্ত। তিনি স্নেহশূন্য দ্বেষশূন্য, সর্ব ইন্দ্রিয় তাঁর বশীভূত। ফলে তিনি চিরসুখী। তাঁর কোন বিষয় চিন্তা নেই। কারণ বিষয় চিন্তা থেকে আসে আসক্তি, আসক্তি থেকে অভিলাষ, অভিলাষ থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে মোহ, স্মৃতিভ্রংশ ও বুদ্ধিনাশ। বুদ্ধি না থাকলে মানুষ চিন্তা করতে পারে না। চিন্তা না করতে পারলে শান্তি আসে না। শান্তি না থাকলে কেউ সুখী হতে পারে না।

"—অতএব হে কৌন্তেয়, তুমি আসক্তি ত্যাগ করে বিষ্ণুর উদ্দেশে কর্মের অনুষ্ঠান কর। আসক্তি ত্যাগ করে কর্মানুষ্ঠান করলে মোক্ষলাভ হয়।

'ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥

"—পার্থ, ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্য কিছু নেই, সুতরাং আমার কোন কর্তব্যও নেই। অথচ আমি কর্মে নিযুক্ত রয়েছি।

'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥

"—সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মের চেয়ে দোষযুক্ত নিজধর্ম শ্রেষ্ঠতর। স্বধর্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ।

"—তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয় দমন কর, তারপরে কামকে বিনাশ কর। অবশেষে মনকে সংশয়রহিত-বুদ্ধি দিয়ে স্থির করে কাম-রূপ দুর্জয় শত্রুকে বিনাশ কর।"

একবার থামলেন সরকারদা। বাইরে রোদ পড়ে এসেছে। কিচেনে পেয়ালা-পিরিচের ঠুং-ঠাং শব্দ হচ্ছে। বৈকালী চায়ের সময় সমাগত। কিন্তু আজ আমরা চায়ের নেশায় আকুল হয়ে উঠি নি, বরং কৃষ্ণকথা শ্রবণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছি।

সরকারদা আবার বলতে থাকেন, "এবারে আমরা ভীষ্ম-পর্বের আঠাশ অধ্যায়, তার মানে গীতার চতুর্থ অধ্যায় আলোচনা করব। আপনারা জানেন যে, শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা আঠারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই অধ্যায়গুলি মহাভারতে ভীষ্ম-পর্বের পঁচিশ থেকে বিয়াল্লিশ অধ্যায়। অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু হল যথাক্রমে—অর্জুন—বিষাদযোগ, বিষাদ-নাশক সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সন্ন্যাসযোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ, অক্ষর-ব্রহ্মযোগ, রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ, বিভূতি-যোগ, বিশ্বরূপ-দর্শনযোগ, ভক্তিযোগ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞযোগ, গুণত্রয়-বিভাগযোগ, পুরুষোত্তমযোগ, দেবাসুরসম্পদ বিভাগযোগ, শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ ও মোক্ষযোগ।

"কাজেই বুঝতে পারছেন এই আসরে বিস্তৃতভাবে গীতার আলোচনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমি খুবই সংক্ষেপে

আপনাদের কাছে গীতা-মাহাত্ম্য বর্ণনা করছি। এবারে আমি আপনাদের কাছে জ্ঞানযোগের কথা বলছি। আগেই বলেছি এটি গীতার চতুর্থ অধ্যায়।"

আমরা মাথা নাড়ি। সরকাবদা বলতে থাকেন, "কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—আমি আদিত্যকে এই অব্যয়যোগের কথা বলেছিলাম। তারপরে আদিত্য মনুকে এবং মনু ইক্ষাকুকে বলেছিলেন। কালক্রমে মানুষ এই যোগ-বৃত্তান্ত বিস্মৃত হয়েছিলেন। তুমি আমার ভক্ত ও সখা। তাই আমি আজ তোমার কাছে আবার এই যোগরহস্য বর্ণনা করছি।

"বিস্মিত অর্জুন বললেন—কিন্তু আদিত্য যে তোমার অনেক আগে জন্মগ্রহণ কবেছেন!

"কৃষ্ণ তখন সহাস্যে বললেন—

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভু খানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধমসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'

"—আমি বহুবাব জন্মগ্রহণ করেছি, তুমিও অনেকবার জন্মেছো। কিন্তু তোমাব কিছুই মনে নেই, আমাব সবই মনে আছে। আমি জন্মবহিত, অবিনশ্বর। আমি সর্বভূতেব ঈশ্বর। তবু আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করে নিজের মায়াবলে জন্মগ্রহণ করি। হে ভারত! যখন ধর্মেব গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনি আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। আমি সাধুদেব পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতের বিনাশ এবং ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।

"কৃষ্ণ এর পরেও অর্জুনকে আরও বহু উপদেশ দান করলেন। অবশেষে অর্জুনের অনুরোধে তিনি তাঁকে নিজের মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করালেন।

"বিস্ময়ে অভিভূত ও রোমাঞ্চিত অর্জুন করজোড়ে বললেন—হে দেব, আমি তোমার দেহে বিভিন্ন প্রাণীদের ঋষিদের ও দেবতাদের

দেখতে পাচ্ছি! দেখছি তোমার অনন্তরূপ! কিন্তু তোমার অন্ত মধ্য ও আদি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। দেখছি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ও দুর্যোধনরা এবং আমাদের পক্ষের প্রধান যোদ্ধারাও তোমার ভয়ানক মুখবিবরে প্রবেশ করছে। জ্বলন্ত বদনে তুমি তাদের গ্রাস করছো! বল, তুমি কে? তোমাকে নমস্কার করি। হে দেবেশ! তুমি প্রসন্ন হও। আমি তোমার প্রবৃত্তি বুঝতে পারছি না। আমি তোমার আদিস্বরূপ জানতে চাই।

"ভগবান উত্তর দিলেন—আমি লোকক্ষয়কারী কাল। এই কুরুক্ষেত্রে যে যোদ্ধারা সমবেত হয়েছে, আমি তাদের মেরে রেখেছি। তুমি না মারলেও তারা মরবে। তাই তোমাকে বলছি, তুমি নিমিত্ত-মাত্র হও। ওঠ, যশোলাভ কর। শত্রু বধ করে সমৃদ্ধ রাজ্যলাভ কর।

"অর্জুন বললেন—হে সর্ব, তোমাকে সহস্র প্রণাম! তোমার মহিমা না জেনে, তোমাকে এতকাল যাদব-কৃষ্ণ ও সখা বলে ভেবে এসেছি। তোমার সঙ্গে খেলা করেছি খেয়েছি ও শুয়েছি। তোমার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি প্রসন্ন হও। পূর্বরূপ ধারণ কর।

"কৃষ্ণ তখন স্বাভাবিক রূপ ধারণ করলেন। তার পরেও তিনি অর্জুনকে আরও বহু উপদেশ দান করলেন। অবশেষে মোক্ষযোগ প্রসঙ্গে বললেন—

'সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥'

"—উত্তম-অধম যে কোন কাজেই নিযুক্ত থাক না কেন, পরা-ভক্তির সঙ্গে পরমভাবকে হৃদয়ে রেখে আমার আশ্রয়ে এলে, আমার কৃপায় অনাদি-পদ লাভ করবে।

"কৃষ্ণ বললেন—

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

"—আমাতে চিত্ত অর্পণ কর, আমার ভক্ত এবং উপাসক হও। আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার পরম প্রিয়। তোমার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করছি—তুমি আমাকেই পাবে। সর্ব ধর্ম ত্যাগ করে একমাত্র আমাকেই শরণ কর, আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব।

"অর্জুন বললেন—হে অচ্যুত! আমার মোহভঙ্গ হয়েছে। তোমার প্রসাদে আমি ধর্মজ্ঞান লাভ করেছি। আমার সব সন্দেহের নিরসন হয়েছে। আমি তোমার আদেশ পালন করব।"

শেষ হল সরকারদার কৃষ্ণকথা, শেষ হল আমার দ্বারকা-দর্শন। ভক্তিহীন অবৈষ্ণব হয়েও আমি দর্শন করতে পেরেছি রণছোড়জীকে —বিশ্ব-ইতিহাসের মহত্তম মহামানবের মনোহর মূর্তিকে।

কৃষ্ণ করুণাময়। আমি তাঁর কাছে শ্রী পূর্ণিমা ও শঙ্করীর জন্য করুণা প্রার্থনা করেছি। বলেছি ঠাকুর, তুমি তাড়াতাড়ি শ্রীকে ভাল করে দাও। 'পুণ্যতীর্থ-প্রভাস' পরিক্রমার পরে আমেদাবাদে পৌঁছে আমি যেন হারিয়ে-যাওয়া শঙ্করী ও তার সঙ্গিনীদের খুঁজে পাই।

কৃষ্ণ মঙ্গলময়। আমি তাঁর কাছে আমার মানসীর মঙ্গল কামনা করেছি। বলেছি—ঠাকুর, তুমি তাকে শান্তি দাও। সে যেন তোমার মহাজীবনের মাঝে তার বঞ্চিত-জীবনের আশ্রয় খুঁজে পায়।

আর আমার জন্য? না, নিজের জন্য তোমার কাছে আমার তো কিছুই চাইবার নেই ঠাকুর! হে অন্তর্যামী, তুমি যে না চাইতেই আমাকে সব দিয়েছো। তাই তো সেদিন 'মধু-বৃন্দাবনে'-র মহাবনে মানসীর পাশে দাঁড়িয়ে মনে মনে আমি যে কামনা করেছিলাম, আজ তা পূর্ণ হল। আমি দ্বারকা দর্শন করতে পারলাম। আজ আমি তৃপ্ত, আমি ধন্য। আমার হৃদয় ও মন তোমার কৃপাধন্য। তীর্থের দেবতা কৃপা না করলে কি কেউ কখনও তীর্থ দর্শন করতে পারে?

জানি না জীবনে আর কোনদিন দ্বারকা আসতে পারব কিনা ! না পারলেও ক্ষতি নেই। আমি যে সারাজীবন ধরে এই দ্বারকা-দর্শনের স্মৃতিচারণ করতে পারব। যখন যেখানেই থাকি, চোখ বুজলেই দেখতে পাব তোমাকে—আমার মনের মানুষ রণছোড়-জীকে।···দ্বারকা যে এখন আমার 'মন-দ্বারকায়'।

॥ জয়তু দ্বারকাধীশ ॥

প্রধান দর্শনীয় স্থান

দ্বারকা

গোমতী-সাগর সঙ্গম—এখানে স্নান ও তর্পণ সেরে মন্দির দর্শনে যেতে হয়

দ্বারকাধীশ রণছোড়জীর মন্দির—গোমতীর উত্তরতীরে ষাট স্তম্ভযুক্ত গ্র্যানিট ও বেলেপাথরের সুদৃশ্য মন্দির। প্রায় ১,৪০০ বছর আগে তৈরি মন্দিরের স্থানে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত বর্তমান মন্দির। ১৭০ ফুট উঁচু সাততলা মন্দির। মূল-মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৯০ ফুট ও প্রস্থে ২০ ফুট। এই মন্দিরকে জগৎ-মন্দিরও বলে।

সারদাপীঠ—দ্বারকাধীশ মন্দিরের পাশেই আদিগুরু শঙ্করাচার্য (ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দী) প্রতিষ্ঠিত ভারতের চারধামেব অন্যতম মঠ। প্রথম অধ্যক্ষ মদন মিশ্র। বর্তমান শঙ্কবাচার্য ৭৭তম অধ্যক্ষ।

রুক্মিণীদেবীর মন্দির—সমুদ্রতীরে অবস্থিত সুদৃশ্য মন্দির। দ্বারকার দ্বিতীয় দর্শন। এটিও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত মন্দির।

ভদ্রকালী-মায়ের মন্দির—রুক্মিণী-মন্দির থেকে মাইলখানেক দূরে পাথরের বেদীর ওপরে ত্রিনয়নী ভদ্রকালীর মুখমণ্ডল

সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির—ভদ্রকালীর মন্দির থেকে মাইলখানেক দূরে সুবিশাল বটের ছায়ায় সুন্দর মন্দির। গর্ভ-মন্দিরের মেঝেতে লুক্কা শিবলিঙ্গ, পাশে পেতলের নাগরাজ

গান্ধীঘাট—সিদ্ধেশ্বর মহাদেব মন্দিরের অনতিদূরে সাগরতীরে শ্বেত-পাথরের বেদীর ওপরে নীল-মর্মরেব গান্ধী-মূর্তি। পেছনেই বাঁধানো ঘাট. সেখানে গান্ধীজীর চিতাভস্ম বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল

দ্বারকা বন্দর—জগৎ-মন্দির থেকে এক মাইল। শক্তিশালী বাতিঘরটি দেখবার মতো।

পঞ্চতীর্থ—গোমতীর অপর তীরে।

তোতাদ্রিমঠ—রেলস্টেশনের কাছে মন্দির ও ধর্মশালা

গোবর্ধনজী, দামোদরজী, রণমুক্তেশ্বর মহাদেব, মহালক্ষ্মী, মীরাবাঈ এবং নরসিংহ মেহতার মন্দির।

বেট-দ্বারকা :

দ্বারকাধীশ মন্দির—দেওয়াল-ঘেরা সুরক্ষিত মন্দির। গর্ভ-মন্দিরে কষ্টি-পাথরের দণ্ডায়মান রণছোড়জীর মূর্তি। নাট-মন্দিরে রাধারাণী রুক্মিণী সত্যভামা জাম্ববতী ও দেবকীর ছোট-ছোট মন্দির।

শঙ্খনারায়ণ মন্দির ও তালাও—দ্বারকাধীশ মন্দির থেকে প্রায় মাইল-খানেক দূরে। শ্বেতপাথরের বেদীতে সুসজ্জিত কৃষ্ণমূর্তি। অনতিদূরে প্রাচীর পরিবেষ্টিত তালাও বা সরোবর।

ওয়াঘের জলদস্যুদের কামান—একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
অর্জুনের গাণ্ডীব লাভ	২৮
অর্জুনের বনবাস	১১
অর্জুনের সুভদ্রা-হরণ	১২
অভিমন্যুর বিবাহ	৮৩
ওখা	১৫৯
কর্ণ-কুন্তী সংবাদ	১২৪, ১৪৭
কাম্যবন	৭১
কুশস্থলী	৮৮
কৃষ্ণলীলার কাল	৫০
কৃষ্ণ-সুদামা	১৬৭
কৃষ্ণের কংসবধ	৪০
কৃষ্ণের ক্রোধ	৬৭
কৃষ্ণের দৌত্য	১৭৯
কৃষ্ণের দ্বারকাপুরী নির্মাণ	৭
কৃষ্ণের বয়স (জীবনকাল)	৮৯
কৃষ্ণের বিশ্বরূপ	১২৩
কৃষ্ণের মহাজীবন (ভাগবত)	৬
কৃষ্ণের রুক্মিণী-হরণ	১৩০
কৃষ্ণের সন্ধি প্রস্তাব	৮৪
কৃষ্ণের সুদর্শন লাভ	২৮
কৃষ্ণের স্বরূপ	৬৭
খাণ্ডব দাহন	২৬
গান্ধীঘাট	১৪২
গুজরাত	১৪৫
গোপ-গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের পুনর্মিলন	১৪৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
গোমতী সঙ্গম	৯৬
জরাসন্ধ-বধ	৪১
জরাসন্ধের মথুরা আক্রমণ	৭
জাম্ববতীর বিবাহ	১৮৭
ডাকোর	১১০
দুর্বাসার পরাজয়	৮১
দুর্বাসা-পূজন	১৩৮
দ্রৌপদীর পতিব্রতা	৭৯
দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ	৬৫
দ্রৌপদীর স্বয়ংবর	৮
দ্বারকাধীশ মন্দির (দ্বারকা)	৯৯
দ্বারকাধীশ মন্দির (বেট-দ্বারকা)	১৬৪
দ্বারকার উৎসব	৯৫
দ্বারকার পৌরাণিক কাহিনী	৮৭
দ্বারকার প্রাচীনত্ব	৯০
দ্বারকার ভৌগোলিক বিবরণ	৯৩
পার্থসারথি	৮৫
পাণ্ডবদের প্রভাস-দর্শন	৬৯
পুরাণ	৫
বেট-দ্বারকা	১১০, ১৫৯
ভদ্রকালী-মন্দির	১৪১
মহাভারত	৪২
ময়দানব	২৯
মিঠাপুর	১৫৯
রণছোড়জী	৭, ৯৭
রাজকোট	৭৫
রাজসূয় যজ্ঞ	৩৯, ৫৬
রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলন	১৪৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
রুক্মিণী-মন্দির	১২৬
রৈবতক (গির্ণার)	৮৮
শঙ্করাচার্য (আদিগুরু)	১০৫, ১১১
শঙ্খচূড়-বধ	১৭৩
শঙ্খচূড় তালাও	১৮০
শঙ্খনারায়ণের মন্দির	১৭৯
শাল্ববধ	৬৬
শিশুপাল বধ	৫৮
সঞ্জয়ের দৌত্য	১১৭
সত্যভামার বিবাহ	১৮৯
সারদাপীঠ	১০৫
সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির	১৪১
সৌরাষ্ট্রের পঞ্চরত্ন	৯৮

সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ

যে-সব বই থেকে সাহায্য নিয়েছি

মহাভারত—অনুবাদক, শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য

,, ,, ,, কালীপ্রসন্ন সিংহ

,, ,, ,, রাজশেখর বসু

কাশীদাসী মহাভারত—সম্পাদক, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

শ্রীমদ্‌ভগদ্গীতা ,, স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি

শ্রীমদ্‌ভাগবতম্ (দশম স্কন্ধ) শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণচরিত্র — ,, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বীরাঙ্গনা কাব্য — ,, মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কর্ণ-কুন্তী সংবাদ — ,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বকোষ — ,, নগেন্দ্রনাথ বসু

মীরাবাঈ — ,, অনাথনাথ বসু

শ্রীশ্রীদ্বারকা মাহাত্ম্য — ,, রামানুজদাশ (মুখার্জি)

পুণ্যতীর্থ-ভারত — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

ভারত কোষ — প্রকাশক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

দ্বারকা—অসইনা পুরাণা অবশেষো (গুজরাতী)—শ্রীকল্যাণরায় জোসী

The Geographical Dictionary
of Ancient & Mediaeval India—Shree N. L. Dey

Holy Places of India — ,, B. C. Law

Immortal India, Vols. II & IV — ,, J. H. Dave

The Great Epic of India — ,, E. W. Hopkins

Epic Mythology — ,, ,,

Advanced History of India — ,, R. C. Majumdar

Handbook of India — ,, D. Chatterjee.

Imperial Gazetteers ; District Gazetteers and Census

যাঁরা নানাভাবে সাহায্য করেছেন

ডঃ হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

,, অরুণকুমার বসু

,, কেশব চক্রবর্তী

,, করুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

শ্রী কে. ডি. জাসানি

,, যজ্ঞেশ্বর রায়

,, বিনয়কুমার মাহাতা

,, ফকিরচন্দ্র কুণ্ডু

,, শৈলেন সরকার

,, পরিতোষ চক্রবর্তী

,, বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য

,, মুকুল সরকার

,, রঞ্জেশ মুখোপাধ্যায়

,, মাধব ঘোষ

,, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য

,, সুশীলকুমার ভৌমিক

,, অসীম দে

শ্রীমতী প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়

,, আরতি সেন

,, রমা বক্সী

ও

গৌতম ঘোষ দস্তিদার

এবং

জাতীয় গ্রন্থাগারের ক্লান্তিহীন কর্মীবৃন্দ